অহল্যাভূমি পুরুলিয়া

দ্বিতীয় পর্ব

সম্পাদনা

দেবপ্রসাদ জানা



দীপ প্রকাশন

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদশিল্পী : ধ্রুব দাস
সহঃ সম্পাদনা : নিলয় মুখার্জ্জী

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

মুদ্রাকরঃ
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৩৭/১/২ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কোলকাতা-৪

বর্ণ সংস্থাপনঃ
আই. ই. আর. ই.
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অখণ্ড পুরুলিয়ার সেই সব মানুষের উদ্দেশে
যারা আচরণে বিনীত
আকাঙ্ক্ষায় নির্লোভ
যারা হৃদয়ের নিকটে আজও
চেয়েছে শুধু হৃদয়

যে ভূমি ধূসর হয়ে যায়নি
যে অরণ্য গগনপ্রয়াসী
যে নদী প্রবাহের লাগি
অস্থির চঞ্চল অতি

ভূমিকা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভারতে ইতিহাস চর্চায় আঞ্চলিক ইতিহাস খুবই গুরুত্বলাভ করেছে। তারফলে এই বিশাল দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছে। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা নিয়ে যেসব গ্রন্থ ইংরেজি অথবা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়। এইসব রচনায় সাধারণ মানুষের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস চর্চা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই ধরনের জেলার ইতিহাস চর্চায় শ্রী দেবপ্রসাদ জানা, আই. এ. এস. মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তিন পর্বে রচিত পুরুলিয়ার ইতিহাস এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা যায়। বহু বিশিষ্ট গবেষকের ও লেখকের অবদানে পুরুলিয়ার জীবনধারার একটি সামগ্রিক চিত্র এই বিশাল গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম পর্ব আগেই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির সার্থক নামকরণ করা হয়েছে 'অহল্যাভূমি পুরুলিয়া'। শ্রী দেবপ্রসাদ জানার অনুরোধে আমাকে দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকা লিখতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বটি যেভাবে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে তা লক্ষ করলেই সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সমাজ : জাতি : প্রজাতি : আঞ্চলিক ইতিহাস, শিল্প : পর্যটন : নদনদী, জলাধার: স্বাস্থ্য পরিষেবা, সমাজসেবা ঃ চিত্রকলা-ভাস্কর্য : সংগীত : ক্রীড়া। প্রথম অংশে পুরুলিয়ার কুড়মি-মাহাত, সাঁওতাল, খেড়িয়াশবর, বীরহড়, মাড়োয়ারি ও উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজ সম্বন্ধে তথ্য নির্ভর আলোচনা পাওয়া যায়। তাছাড়া মানভূমের প্রাচীন রাজবংশ, কোম্পানির আমলে মানভূমে ঘাটোয়ালি পুলিশ ব্যবস্থা, পুরুলিয়ার ভাষা আন্দোলন ও টুসু গান এবং পুরুলিয়ার সমবায় আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধসমূহও তথ্যসমৃদ্ধ। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্মৃতিকথায় পুরুলিয়ার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক এইসব প্রবন্ধের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় সব তথ্যই লেখকরা ব্যবহার করেছেন। তারপরে তাঁরা পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ইতিহাসের এক পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, রেশম ও তসর চাষ, তাঁত শিল্প, লাক্ষা শিল্প, শিল্প ও শিল্প সম্ভাবনা। আরও যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা হল নদনদী, রুক্ষ মাটির- জলের আধার সহ বাঁধ, অযোধ্যা পাহাড় ও পুরুলিয়া ভ্রমণ। বিভিন্ন শিল্পের ওপর আলোকপাত করে শিল্প সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুলিয়াতে বড়ো নদীর সংখ্যা বেশি না থাকলেও অনেক নদী, শাখানদী বা জোড় আছে। এই নদীগুলি নিয়ে বহু লোককথা, লোকগান রচিত হয়েছে। নদীগুলিকে তাই 'এই জেলার লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। 'রুক্ষ বুকে জলের বান, সাহেববাঁধ'-এর দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির 'পালা বদলের মুহূর্ত' উপলব্ধি করা যায়। এই প্রবন্ধের লেখকের রচনায় এই চিত্রটি আকর্ষণীয় করে পরিস্ফুট হয়েছে। পুরুলিয়া শহরের গৌরব যে এই সাহেববাঁধ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয় অংশে 'পুরুলিয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবার ইতিহাস', 'প্রসঙ্গ কুষ্ঠরোগ—প্রেক্ষাপট পুরুলিয়া', 'পুরুলিয়ার ভেষজ গাছগাছড়া' ও 'ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি পুরুলিয়া' আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির সময় থেকে পুরুলিয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে

ওঠে। এই বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। পুরুলিয়ায় কুষ্ঠরোগের হার অন্যান্য জেলা থেকে বেশি। প্রাচীন কাল থেকেই এখানে ভেষজ-চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। আদিবাসী ও প্রাচীন অধিবাসীরা নানা প্রকার ওষুধের ব্যবহার জানতেন। জার্মান খ্রিস্টধর্ম প্রচারক পাদ্রী রেভারেন্ড ওফ্‌মান-এর নিরলস প্রচেষ্টায় পুরুলিয়া শহরের পশ্চিম দিকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়ার বৃহত্তম কুষ্ঠাশ্রম 'দি লেপ্রোসি মিশন' তৈরি হয়। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সংস্থা পুরুলিয়াসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের কুষ্ঠরোগীদের সেবা করেছে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থাটি ৩৪০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত হয়। এখানে উল্লিখিত 'সারণি' থেকে জেলার কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। চারিশত আজীবন সদস্য নিয়ে পুরুলিয়ার 'ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি' যেভাবে দায়িত্ব পালন করছে তারও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের চতুর্থ অংশে পুরুলিয়ার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, শাস্ত্রীয় সংগীত, ক্রীড়াচর্চা ও খেলার ছড়া বিষয়ে বহু আকর্ষণীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলের শিল্পকর্মগুলি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত "অত্যন্ত নিষ্ঠায় তার নিজস্ব শৈলী ও পরিকাঠামোর মানকে আজও অক্ষুণ্ন রেখেছে।" এই বিষয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত একটি মিশ্র ধারার কথাও উল্লিখিত হয়। "চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকলার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতের সঙ্গে মানভূম সংস্কৃতির পারস্পরিক মেল বন্ধনের উদ্ভব হয়।" লেখকের মতে, "মাঝে মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতায় এর অগ্রগতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে।" লেখক এই মন্তব্যও করেন, শিল্পীরা "চিত্রজগতের আঙ্গিককে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলাকে যুক্ত করতে " সক্ষম হন। প্রধানত পূজা পার্বণ ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন। অবশ্য মূর্তি শিল্পের প্রভাব চিত্রশিল্পের চেয়ে অনেক বেশি। চার্লি নামে একজন চিত্র-শিল্পীর হাজতে থাকাকালীন তেল রঙে আঁকা প্রচুর ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীর প্রভাবে পুরুলিয়া জেলায় তেল রংকে মাধ্যম করে ছবি আঁকার সূত্রপাত হয়। শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে এই জেলা কতটা সমৃদ্ধ ছিল তার পরিচয় এই নিবন্ধ থেকে পাওয়া যায়।

মানভূম বা পুরুলিয়া জেলার লোকগীতি অর্থাৎ ঝুমুর, টুসু, ভাদু, করম, জাওয়া, বাঁদনার মতো বিভিন্ন ধরনের গানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার ধারাটি প্রভূত চর্চা হয়। আঠারো শতকে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার ধারাটি কেন প্রবহমান ছিল না সে সম্বন্ধে তথ্যের অভাব চোখে পড়ে। লেখক উনিশ শতকের ওপরই আলোকপাত করেন। এই শতকেই জেলার সংগীতজ্ঞরা ধ্রুপদী শিল্পকে সমৃদ্ধ করেন। এই নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বহু আকর্ষণীয় তথ্য রয়েছে।

জেলার ক্রীড়া চর্চার ইতিহাস একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। মানভূমে প্রচুর খেলার ছড়া পাওয়া যায়। লেখক যত্নের সঙ্গে তা সংগ্রহ করেছেন। খেলার ছড়া থেকে সমাজ জীবনের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়।

বাংলা নামে যে ভূখণ্ড রয়েছে তার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এখনও কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। তাই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থের সম্পাদক ও লেখকবৃন্দ যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে সমাদৃত হবে।

অমলেন্দু দে
সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটি,
কলকাতা

প্রাক্‌কথন

। ১।

আর্য-অনার্য, শক-হূণ, পাঠন-মোগল প্রভৃতি বিচিত্র জাতি-জনজাতির মিলিত প্রাণের তীর্থভূমি ভারত। তবু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের সামগ্রিক পরিচয়-প্রয়াসের পাশাপাশি, আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু কৌণিক ও বহুমাত্রিক রূপবিশ্লেষণে চলে নানা গবেষণা-সমীক্ষা। শিকড়ের সন্ধানে এই যাত্রা সর্বত্র অব্যাহত।

কর্মসূত্রে স্বল্পকাল পুরুলিয়ার প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকার সময়ই মধুকবি-কথিত 'পাষাণময় দেশ'-এর আপাত খরা-দারিদ্রের মর্মান্তিক অভিযোগপর্দা সরিয়ে সহজ-সুন্দরী পুরুলিয়াকে দুচোখ ভরে দেখা নয়, ভালোবাসায় অনুভব করি —এই প্রান্তিক বাংলার নয়নাভিরাম নীলাভ শৈলশ্রেণী, আরণ্যক স্নিগ্ধ শ্যামলিমা, রুক্ষ-উষর লালমাটি-বুকে বিচিত্র রুপোলি রেখায় প্রাণপ্রবাহিনী নদী-ঝর্ণা কিংবা স্তব্ধ গভীর জলের বাঁধ-পুষ্পরিণী আর মৌণমুখর পুরাকীর্তিমালা, ছন্দোময় নৃত্য-সংগীতের মাঝে লোকসংস্কৃতির প্রাণোচ্ছল প্রবাহ এবং দুষ্প্রাপ্য বনজ তথা খনিজ সম্পদের বর্ণময়ী মহিমায় অনন্যা পুরুলিয়া। সেইসঙ্গে আবহমানকালের বঙ্কিম ছন্দে, এ অঞ্চলের মানুষ কীভাবে অস্তিত্ব-অধিকার ও মর্যাদারক্ষায় আনুপূর্বিক প্রচেষ্টায় প্রোজ্জ্বল। ফলে, তথাকথিত 'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে' থেকেও প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যে, খনিজ সম্পদে, শিল্পসংস্কৃতিতে ঐশ্বর্যশালিনী পুরুলিয়ার সামগ্রিক রূপের আদলটি লেখার ভাষায় চিত্রিত করার সংকল্পে যুক্ত হওয়া—প্রতিদিনের বিচিত্রব্যাপ্ত কর্মধারাকে মান্য করেও, নিরন্তর শ্রম-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক অভিনিবেশে।

দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য কোষগ্রন্থের অনুরূপ, ক্রমপর্যায়-বিন্যস্ত স্বতন্ত্র পর্বত্রয়ী বিধৃত প্রকাশ-পরিকল্পনায়-বিশ্লিষ্ট ভেদরেখার পরিবর্তে আছে —ভাবনার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত তিনটি পর্বের পারস্পরিক ঐক্যসূত্রের অবিভাজ্যরূপ, যা সৃজনমণ্ডলীর বৃন্দগানের ঐকতানতুল্য একমুখীন ও সুরেলা। তিন শতাধিক পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ডে বিধৃত ঃ কালের ধারাবাহিতায়, এ অঞ্চলের সুপ্রাচীন ইতিহাসের সাহিত্য-সংস্কৃতির বহুব্যাপ্ত আলোচনা। উল্লেখ্য, সেইসব প্রবন্ধ লিখেছেন প্রধানত এ অঞ্চলের গবেষক-লেখকবৃন্দ—যা পরিপূর্ণ ক্ষেত্রসমীক্ষায় ঋদ্ধ।

আলোচ্য দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ভাগে বিন্যস্ত—পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক জেলার আদি-অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস। ইতিহাসমনস্ক সুধী পাঠকেরা জানেন, ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম রাঢ় অঞ্চল ছিল আদি-অস্ত্রালদের বাসভূমি। 'ঐতরেয় আরণ্যক' এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে, এ অঞ্চলের শক্তিমান প্রাকৃতজন 'অসুর', 'দস্যু' প্রভৃতি হীনার্থক অভিধায় চিহ্নিত। অথচ একালের মর্যাদাবান কুড়মী-মাহাত, সাঁওতাল সম্প্রদায়, এমনকি বীরহড়, খেড়িয়া-শবর প্রমুখ ভূমিপুত্রদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আজ উপেক্ষিত নয়, সমাদৃত—যা পরিদৃশ্যমান এইসব আদি-অধিবাসীর সামাজিক মর্যাদাযুক্ত জীবনচর্যায়। ফলত, আধুনিক নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের আলোয় গ্রন্থে আলোচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে এ অঞ্চলে বহিরাগত উৎকল, ব্রাহ্মণ ও মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এবং তথাকথিত স্থানীয় রাজবংশীয় ইতিহাস, কোম্পানির আমলে মানভূমের ঘাটোয়ালি প্রথা।

দুপার বাংলার বুদ্ধিজীবী বাঙালি, বাংলাভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি আর শিলচরের ভাষা-আন্দোলনের কথাই ভাবেন; অথচ ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও দেশভাগের অব্যবহিতকাল থেকেই স্বাধীন ভারতের মানভূম জেলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল—পুরুলিয়া, দীর্ঘকালব্যাপী ভাষা আন্দোলন ও টুসু-সত্যাগ্রহের পটভূমিতে বাংলাভাষার মর্যাদারক্ষার দাবিতে বিহারের তদানীন্তন সরকারের দমন-পীড়ন-অকথ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন, তার তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস অনেকের অজানা। ইতিহাসাশ্রয়ী হয়ে জানা যায় ঃ বাংলা লোকসংগীত টুসু এ অঞ্চলের সংগ্রামী নরনারীদের বড় হাতিয়ার হয় তৎকালীন বিহার সরকারের সুপরিকল্পিত দমন-পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে। ভাষা আন্দোলনকারী নরনারীরা উপর্যুপরি অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে যখন উত্তাল, তখন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় যুক্তবিবৃতিদানে পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির দাবি প্রসঙ্গে যে অবস্থান নেন তার প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রাসঙ্গিক ভাষণ দেন। সময়টা ছিল ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মেঘনাথ সাহা, কাজি আবদুল ওদুদ, গোপাল হালদার ও জ্যোতি বসু প্রমুখ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) ও অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতাদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিমলাচন্দ্র সিংহ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারাও সংযুক্ত পূর্বপ্রদেশ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তারপর ওই বছরের এপ্রিলে প্রখর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে পুরুলিয়ার পুঞ্চ থানার পাকবিড়র‍্যা গ্রাম থেকে কলকাতা অভিমুখে টুসু সত্যাগ্রহী জনতার পদযাত্রা। জনমতের প্রবল চাপে এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে নামে ত্রিধাবিভক্ত মানভূম জেলার টাঁড়-বাইদ সমন্বিত মাত্র ষোলোটি থানা নিয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। অথচ ঝরিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি খনিজ এলাকা এবং চান্ডিল, পটমদা ইত্যাদি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল কৌশলগত কারণে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়না। জন্মলগ্ন থেকেই তাই পুরুলিয়া অজন্মার দেশ খরা অঞ্চল। ভাষা আন্দোলনের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসের পাশাপাশি আলোচ্য পর্বে সংযুক্ত সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস।

নগাধিরাজ হিমালয় যখন টেথিস সাগরের তলায়, তখনও মাথা তুলে স্বমহিমায় সমুন্নতি ঘোষণা করেছে আর্কিয়ান যুগের শিলা দিয়ে গড়া শুধুমাত্র শুশুনিয়া নয়, অযোধ্যা-জয়চণ্ডী-পাঞ্চেত-দলমা শৈলমালাও। ভূতত্ত্ববিদ-পরীক্ষিত গণ্ডোয়ানা অঞ্চলের ভূগর্ভ সঞ্চিত লোহা, তামা, অভ্র, সোনা, কয়লা, কোয়ার্জ, ফেলসপার, ডলোমাইট, চুনাপাথর ইত্যাদি খনিজ সম্পদ তথা মূল্যবান পাথরের ভাণ্ডারভূমি পুরুলিয়াও। এ জেলার শিল্প সম্ভাবনা উপেক্ষনীয় নয়। অনুরূপভাবে কুসুম-পলাশ-কুল প্রভৃতি সুনির্বাচিত বৃক্ষাশ্রিত লাক্ষাপোকার সুপরিকল্পিত চাষ থেকে উৎপাদিত লাক্ষা এবং রেশম গুটি পোকা থেকে রেশম শিল্প এ জেলায় আর্থসামাজিক ভাবনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খরা জেলা পুরুলিয়া—আশাভরা শক্তির উৎস সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র শুধুমাত্র নয়, পাহাড়ি

বিষয় সূচি

ভূমিকা	অমলেন্দু দে	
প্রাক্কথন	দেবপ্রসাদ জানা	

সমাজ : জাতিপ্রজাতি : আঞ্চলিক ইতিহাস—১-১৩২

পুরুলিয়ার কুড়মি-মাহাত সমাজ	সুনীল মাহাত	৩
পুরুলিয়ার সাঁওতাল সমাজ	কলেন্দ্র মান্ডি	৩০
পুরুলিয়ার মাড়োয়ারি সমাজ	বংশীধর কাটারুকা ও ওমপ্রকাশ রাঠী	৩৯
পুরুলিয়ার উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজ	বিজয় পাণ্ডা	৪২
পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর সমাজ	ড. সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬০
পুরুলিয়ায় বিরহড় সমাজ	জলধর কর্মকার	৭১
মানভূমের প্রাচীন রাজবংশগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়	দিলীপ কুমার গোস্বামী	৭৭
কোম্পানির আমলে মানভূমে ঘাটোয়ালি পুলিশ ব্যবস্থা	শ্যামাপ্রসাদ বসু	৮৯
ভাষা আন্দোলন ও টুসু গান	ড. শান্তি সিংহ	১০৩
প্রসঙ্গ সমবায়—মানভূম তথা পুরুলিয়া	শ্যামাচাঁদ ব্যানার্জী	১১৬
আমার পুরুলিয়া	হারাধন ব্যানার্জী	১২৯

শিল্প : পর্যটন : নদনদী : জলাধার— ১৩৩-১৯০

একনজরে সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কল্যাণ ঘোষ	১৩৫
পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট	রমেন্দ্রনাথ কর	১৪১
শিল্পবিকাশে পুরুলিয়া	অতনু কুমার মণ্ডল	১৪৪
কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প—পুরুলিয়া	সঞ্জিত কর্মকার	১৫১
পুরুলিয়া জেলায় তসর ও রেশম চাষ	অজিত মাণ্ডি	১৫৪
পুরুলিয়ার তাঁত শিল্প	আবদুল আজিজ মণ্ডল	১৫৭
পুরুলিয়া জেলার লাক্ষা শিল্প—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	পিনাকীরঞ্জন রক্ষিত	১৬১
পুরুলিয়া ভ্রমণ	প্রজ্ঞাবর্মা	১৬৮
অযোধ্যা পাহাড়	সুবোধ বসু রায়	১৭৮
পুরুলিয়া জেলার নদনদী	মলয় চৌধুরী	১৮১
রুক্ষ বুকে জলের বান, সাহেববাঁধ	শ্যামল কিশোর তেওয়ারী	১৮৫

স্বাস্থ্য পরিষেবা : সমাজসেবা— ১৯১-২২২

পুরুলিয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিবর্তন	ডা. কিরীটীভূষণ সিনহা	১৯৩
প্রসঙ্গ কুষ্ঠরোগ : প্রেক্ষাপট পুরুলিয়া	সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৪
পুরুলিয়ার ভেষজ গাছ-গাছড়া	শ্যামল গোস্বামী	২১৪
ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটি পুরুলিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	কে পি সিংদেও	২২০

চিত্রকলা-ভাস্কর্য : সঙ্গীত : ক্রীড়া—২২৩-২৫০

রুক্ষ লাল কাঁকুরে মাটির দেশ পুরুলিয়া— চিত্রে ও ভাস্কর্যে	ধ্রুব দাস	২২৫
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও পুরুলিয়া	দিলীপ কুমার সিংহ	২৩০
পুরুলিয়া জেলার ক্রীড়াচর্চা	দয়াময় রায়	২৩৩
মানভূমের খেলার ছড়া	জগদীশ সরখেল	২৪৫

নদীর দুরন্ত জলধারায় উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও। খরার মোকাবিলায় বাঁধপ্রকল্প এবং জলাশয়গুলি উপযুক্ত সংরক্ষন ভাবনাও জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতূহল নিরসন করবে—সে-সব দিকগুলি যথাযথ তথ্য পরিসংখ্যানসহ আলোচিত।

সমীক্ষাধর্মী পুঁথিগত চর্চার পাশাপাশি সহজসুন্দরী পুরুলিয়ার টানে ভ্রমণ প্রিয় পর্যটকেরা কী কী কারণে পুরুলিয়া ভ্রমণে উৎসুকচিত্ত হবেন, সে সব আনন্দসঞ্চারী উপাদান মালাও সুবিন্যস্তভাবে আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বিধৃত।

কুষ্ঠরোগ আর অভিশাপ নয়, সুচিকিৎসায় তার সম্যক নিরাময় হয়—এ সত্য মনে রেখেই পুরুলিয়ার কুষ্ঠরোগিদের সুচিকিৎসা আশাসঞ্চারী। এ জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ কীভাবে যাবতীয় বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে জনমনে জ্বালছে ভালোবাসার দীপ—তার তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার সঙ্গে আছে পুরুলিয়ার বনজ সম্পদ, নানা ধরনের ভেষজ গাছগাছড়ার নাম-গোত্র পরিচয় ও তার প্রায়োগিক ভাবনা।

পুরুলিয়ার উচ্চাবচ রুক্ষ লাল মাটি বর্ষার প্লাবনে খোয়াই বুকে অঙ্কন করে বিচিত্র রেখার শিল্প আলিম্পন ঊর্মিল শৈলশ্রেণীর নীলাভ ছন্দে, রক্তিম খোয়াই শেষে আরণ্যক শোভায় নিসর্গ প্রকৃতির শিল্পরূপ স্বতঃস্ফূর্ত। এই প্রান্তভূমির চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, সাংগীতিক সুরমূর্চ্ছনায় এখানের শিল্পীরা প্রকৃতির রূপ-রস -ছন্দকেই লীলায়িত করে তুলেছেন তাদের সৃষ্টিসম্ভারে। দ্বিতীয় পর্বের চতুর্থ ভাগের সূচি বিষয়-বৈচিত্র্যে অভিনব। মানভূম-পুরুলিয়ার মানুষ আবহমানকালের ধারাবাহিকতায় চিত্রশিল্প-ভাস্কর্য-সংগীতচর্চায় যেমন মগ্ন থেকেছে রসবোধের প্রাখর্যে, তেমনই সবল সরল মানুষগুলি শৈশবে যৌবনে কী ধরনের ক্রীড়াচর্চায় অনুরাগী, অন্তত আধুনিকযুগের খেলাধুলার প্রেক্ষিতে, তার ঐতিহাসিক পর্যালোচনার সঙ্গে এ জেলায় প্রচলিত ছড়াধাঁধায় খেলাধুলার কোন্ কোন্ বিষয় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লোকায়ত জীবনরসের নান্দনিক চেতনায়, তার রূপপ্রকরণ সম্পর্কে অবগত হওয়ায় আছে অনাবিল আনন্দ।

"অহল্যাভূমি পুরুলিয়া" দ্বিতীয় পর্বটি পৌর্বাপর্য ভাবনায় প্রথম খণ্ডের সঙ্গে পরবর্তী তৃতীয় পর্বের মেলবন্ধনহীন, অনুক্রম-বহির্ভূত নয়। এই পর্বটির প্রবন্ধগুলির সঙ্গে অন্য দুটি পর্বের প্রবন্ধগুলি মনস্কচিত্তে পাঠ করলে, অনুক্রম-অনুসারী অন্তর্নিহিত সত্য ব্যাপ্তগভীর প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

এই পর্বটির নির্মাণ পরিকল্পনাকে অঙ্কনে ও সুধী দরবারে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছেন যে সৃজকমণ্ডলী তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক তথা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমলেন্দু দে তাঁর নিরন্তর ব্যস্ততার মধ্যেও এই পর্বের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শিক্ষকসুলভ উদার দাক্ষিণ্যে—তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার।

যাঁদের অকুণ্ঠ ও অপরিমেয় সহায়তা ছাড়া "অহল্যাভূমি পুরুলিয়া" পরিকল্পনা থেকে বাস্তবে রূপায়িত হত না সেই দুই পরম সুহৃদ অনুজপ্রতিম সম্পাদনা সহযোগী পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক মৃদুভাষী, সংস্কৃতি অনুরাগী শ্রী নিলয় মুখার্জী ও দীপ প্রকাশনের কর্ণধার সদাহাস্যময়, উপচিকীর্ষু, সবার প্রিয় শ্রী শংকর মণ্ডল। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের উর্ধ্বে, ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে।

সম্পাদনার যা কিছু ত্রুটি তার দায়ভার আমার।

পুরুলিয়া
২৫শে বৈশাখ, ১৪১০
৯ মে, ২০০৩

বিনীত
দেবপ্রসাদ জানা

সমাজ : জাতিপ্রজাতি : আঞ্চলিক ইতিহাস

পুরুলিয়া জেলার কুড়মি-মাহাত সমাজ

সুনীল মাহাত

প্রস্তাবনা: পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কুড়মি-মাহাত সম্প্রদায়। পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ড. সুধীর করণ বলেছেন "এই জেলার লোকসংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদি কোনোকিছুই মাহাতদের বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।"

কুড়মি-মাহাতদের অধিকাংশ মাহাত, মাহতো, মাহাতো পদবি ব্যবহার করে। কিছু কিছু কুড়মি মাহাত রায়, রায়-মাহাত, সিং, সিংহ, সিংহদেও, সিংহরায়, মুখিয়া, মোড়ল, দেশমোড়ল, প্রধান, দেশপ্রধান, পরগনাইত, মাঝি, দিগার, লায়া, রাউত, মানকি, সরকার, পট্টনায়েক, পরামানিক, বর্মা, ভার্মা, প্রসাদ, কুমার, সিনহা, মেহতা, রেড্ডি, প্যাটেল, চৌধুরী, কাটিআর, বঁশরিআর, মুতরুআর, কাড়ুআর, শাঁখোয়ার, গাঁসুয়ার, মহারাই ইত্যাদি পদবিও ব্যবহার করেন। উড়িষ্যায় এরা মহন্ত, মহান্ত, মোহান্ত পদবি ব্যবহার করেন।

অন্যদিকে কুহরি, কুমহার, মোমিন ইত্যাদি বেশকিছু সম্প্রদায় মাহাত পদবি ব্যবহার করেন। ওঁরাওদের গ্রামপ্রধানদেরও কোথাও কোথাও 'মাহাত' বলা হয়। অর্থাৎ মাহত, মাহাতো, মাহাত কোনো জাতি বা সম্প্রদায় নয়, এটি একটি পদবি মাত্র। 'মাহাত' পদবিটি এই অঞ্চলের, মাঝি, মুড়া, মানকি, মুখিয়া, মোড়ল, ইত্যাদির মতো গ্রামপ্রধান-এর সমর্থক। প্রতিটি 'মাহাত' প্রধান গ্রামে অনেক 'মাহাত' পরিবারের বসবাস থাকলেও ওই গ্রামে একটি পরিবারই মাহাত-ঘর হিসেবে চিহ্নিত আছে এখনও। যে পরিবারটি সাম্প্রতিক অতীতেও বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আলাদাভাবে সম্মানিত হত। যদিও বর্তমানে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণে গাঁয়ের মাহাতরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্মান হারিয়েছেন তবু গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে মাহতরা এখনও মর্যাদার আসনেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

মাহাত পদবিধারী এই জাতি মূল বৃহত্তর কুড়মি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য 'মাহাত' সমাজ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা 'কুড়মি-মাহাত' সমাজ বলেই উল্লেখ করে থাকি। এখন অধিকাংশ কুড়মিই মাহাত পদবি ব্যবহার করে কিন্তু তারা সকলেই গ্রামের মোড়ল বা মাহাত নয়। কুড়মি এবং কুরমি দুভাবেই এই সম্প্রদায় উল্লিখিত হয় কিন্তু বর্তমানে নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিকগণ এই এলাকার কুড়মি মাহাতদের 'কুরমি' না বলে 'কুড়মি' হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতি।

কুড়মি-মাহাতদের বাসভূমি: পুরুলিয়া জেলায় কুড়মি-মাহাতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তাছাড়া সাবেক মানভূম, সিংভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিডি, ধানবাদ, পালামৌ, বোকারো, সাঁওতাল

পরগনা, এককথায় ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগনা বা সাম্প্রতিককালের ঝাড়খণ্ড রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, সুন্দরবন, বাদাবন, দার্জিলিং, শিলিগুড়ির চা বাগান এলাকা, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, কটক, বাংলাদেশ, মরিসাস ইত্যাদি এলাকাতেও কুড়মিরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে।

মূলত জীবিকার সন্ধানে ও অন্যান্য নানা কারণে কুড়মিরা বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেও এরা বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানভূম, সিংভূম, শিখরভূম, সেনভূম, গোপভূম, সুরভূম, মল্লভূম, পাতকুম, বরাভূম, ধলভূম, ভঞ্জভূম, খিচিংভূম, খাসপোল, বালিয়াভূম, কালহান, সেরাইকেলা, খরসোঁয়া ইত্যাদি এলাকায় বসবাস করছে।

ড. কুমার সুরেশ সিং ও ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতর মতে—"The Mahatos' homeland consists of West Bengal and Orrisa. Its heart lies in the erstwhile Manbhum district, well defined territory bounded by the four rivers. Damodar, Kangsabati, Subarnarekha and Vaitarani, it has been a part of lower Jharkhand where the Mahatos have co-existed with the tribal communities."

কুড়মি-মাহাতদের আদি বাসভূমি : কুড়মিদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে নানামুনি নানা মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলতে গেলে এ সম্পর্কে তেমন কোনো গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা যায়নি এবং এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে। Dr. G. S. Ghurye-র মতামত অনুযায়ী মিঃ বি. কে. মেহতা বলেছেন, "The Kurmis had to migrate from central India to the forests of Jharkhand because of the pressure from the Gonds and Kamars in a remote past when the Kurmis were still doing daha (shifting) cultivation. Kamars are found settled in all Kurmi villages in Jharkhand. 'It appears that the Munda imnigrants had compelled the Kurmis to move eastwards leaving their original settlements at Kurmagarh on the borders or Ranchi and Surguja.

মেহতা আরও বলেছেন, "সম্ভবতঃ (First Century B. C.) সাদান, সাতবাহন, কুষান ইত্যাদির চাপে কুড়মিরা পূর্বদিকে সরে এসে রাঁচি, হাজারিবাগ, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর, কটক ইত্যাদি এলাকায় বসবাস করে এবং এই এলাকার কুড়মিরা এক উন্নত সভ্যতা সম্পন্ন রাজ্য স্থাপন করে। ইতিহাসখ্যাত রাজা শশাঙ্ক (Seventh Century A.D.) সম্রাট হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন। শশাঙ্ক একজন নাগজাতির রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ঝাড়খণ্ডের কুড়মিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

W. W. Hunter তাঁর 'Statistical Account of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন "The Mundas expelled the Kurmis out form the Joshpur and western part of Ranchi."

এন. কে. বোস বলেছেন, "For the control of the better and productive land the Mundas and the Kurmis pushed each other and finally the Kurmis pushed them to the parganas Bundu, Silli and Rahe of Ranchi district."

বি. কে. মেহতার বক্তব্য অনুযায়ী, "ঝাড়খণ্ডের কুড়মিদের 'টঁড়-কুড়মি' বলা হয়—যারা প্রাচীন নাগদের বংশধর যারা অসুরদের সমাজভুক্ত ছিল। সমস্ত ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ বলেছেন, মুন্ডাদের আগমনের আগে ছোটনাগপুর নাগদের অর্থাৎ অসুরদের অধিকারে ছিল।

ক্ষুদিরাম মাহাত বলেছেন, "কুড়মিরা প্রাক-আর্য জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যারা নাকি হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো তথা সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ছিলেন। নাইগ্রেট এবং অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর দ্রাবিড় এবং কুটুম্বিনরা (কুরমি) নিশ্চিতভাবেই উন্নত কৃষি সভ্যতার বাসিন্দা ছিল। কাষ্ঠনির্মিত গরুরগাড়ীর

চাকার ব্যবহার যা আজও কুড়মিরা করে আসছে তা হরপ্পার খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ কুড়মালি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মিঃ পদ্মলোচন মাহাত তাঁর কুড়মালি ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন, "আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আছে পৃথিবীর আদিমতম কৃষিভূমি Fertile Cresent-এ কৃষি আবিষ্কারের পর নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে পৃথিবীর পূর্বদিকের নদীতীরবর্তী উর্বর কৃষিভূমিতে তারা দীর্ঘদিন অবস্থান করে। এই উপত্যকার নাম কুরম নদী উপত্যকা। সিন্ধু নদীর ডানতীরের এই উপনদী উপত্যকায় বসবাস করার জন্যই এই কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী করমি নামে পরিচিত হয়। দ্রাবিড় উচ্চারণে 'কুরমি', 'কুড়মি' হয়েছে। কুড়মি/কুরমি কোনো জাতিবাচক নাম নয় ইহা গোষ্ঠীসূচক। বর্তমান যুগের কুরমি, কামার, কুমার, কুইরী, গোয়ালা, তেলি, নাপিত, ধোপা, রাজোয়াড়, মুদি, মুচি, ডোম ইত্যাদি জাতিসূচক জনগোষ্ঠী মূল কুরমি গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। এদের সকলের গোত্র, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা ও সংস্কৃতি এক।"

আচার্য কীর্তানন্দ অবধূত তাঁর 'রক্তমৃত্তিকা রাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেছেন, "ভারতবর্ষে আর্য আগমনের বহুপূর্বেই রাঢ়ের মানুষেরা জেবু বর্গীয় গোরুর সাহায্যে চাষের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। আর্যরা এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে রাঢ়ের মানুষদের 'মহাত্মন' বলে সম্বোধন করেছিল। এই 'মহাত্মন' শব্দ থেকেই বর্তমানে 'মাহাতো' কথার উদ্ভব হয়েছে।"

তিনি আরও বলেছেন, "ভূতাত্ত্বিগণ রাঢ়ের মৃত্তিকা ও প্রস্তর পরীক্ষা করে বলেছেন—এটিই বিশ্বের প্রাচীনতম মাটি। আর রাঢ়ের সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, দামোদর নদীর অববাহিকা যেখানে খুব নিকটবর্তী সেখানেই প্রগৈতিহাসিক জীবের ফসিল সমধিক পাওয়া যাচ্ছে। শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার এই অঞ্চলেই ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার করেছেন। তাই এর থেকে অথবা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, বিশ্বের বুকে প্রথম জীবের অবিষ্কার করেছেন। তাই এর থেকে আমরা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, বিশ্বের বুকে প্রথম জীবের আবির্ভাব রাঢ়েই হয়েছিল। আর একই সিদ্ধান্তের ধারাপথ বেয়েই আমরা অনুমান করতে পারি যে মানুষের আবির্ভাবও প্রথম এখানেই হয়েছিল। এই অঞ্চল থেকেই শ্রী সরকার একলক্ষ বছরের প্রাচীন মানুষের ফসিল আবিষ্কার করেছেন। ফসিলটি লেক গার্ডেন্সের মিউজিয়ামে রাখা আছে। রাঢ়ের মানুষেরা ছিল অষ্ট্রিক গোষ্ঠভুক্ত যার উত্তরপুরুষ হচ্ছে রাঢ়ের কুর্মি-মাহাতরা। কৃষি সভ্যতারও পত্তন করেছিল রাঢ়ের মানুষেরাই আর এর পেছনে অবদান রয়ে গেছে কুর্মী-মাহাতদের। মাহাতদের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটি তা হল রাঢ়ের অন্যান্য যেসব জাতি রয়েছে সকলেরই উদ্ভব হয়েছে এই কুর্মি-মাহাত থেকে। এই কথাটি অনেকের মনঃপূত না হলেও চরম সত্যকে কোনোদিন অস্বীকার করা যায় না।"

ডাল্টনের মতে, "ছোটনাগপুরে অতি প্রাচীনকালেই এঁরা স্থিত হয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন উপজাতির মধ্যে। সেজন্য কোল ভাষাভাষি উপজাতি বিশেষতঃ ভূমিজ ও মুন্ডাদের সঙ্গে এদের লিপ্ত হতে হয়েছিল সংগ্রামে। এখনও কুর্মিগ্রামের উপান্তে মুন্ডাদের কবরস্থান সূচক পাথরের স্তম্ভ পোঁতা দেখা যায়।"

"মানভূমে কুর্মীদের বসবাস অতিপ্রাচীন বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। বিশেষতঃ মানভূমের পশ্চিমাঞ্চলে। উনিশ শতকের শেষদিকে তাদের আবাস বাহান্ন পুরুষ ধরে চলে আসছিল বলে জানান হয়েছিল।"

কুড়মিদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সময় ছত্রপতি শিবাজিকে নিজেদের পূর্বপুরুষ মেনে নিয়ে একটি কাহিনি প্রচারিত হয়েছিল। সেটি হল "আলাউদ্দিন খলজির আমলে মুসলমানদের অত্যাচারে

কুড়মিরা পালিয়ে এসে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। কুড়মিদের পশ্চাদধাবনরত মুসলমান সেনারা সাঁওতালদের সঙ্গে মিলিত কুড়মিদেরকে দেখে যেখানে নাকি শূকর বলি করা হয়েছিল। আলাউদ্দিন খলজির সেনারা শূকরবলি দেখে তোবা তোবা বলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং সাঁওতালদের সঙ্গে কুড়মিদের সখ্যতা স্থাপিত হয়।"

অনেকেই এই কাহিনিকে কষ্টকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, "এই এলাকার মুসলমান, জোলা বা মোমিনদের সঙ্গে কুড়মিদের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাদের অধিকাংশ কুড়মালি ভাষায় কথা বলে। মহরমের সময় মুসলমানরা তাজিয়া নিয়ে কুড়মি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। কুড়মিরা তাদের জলঘটি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। কুড়মিরা এই জলঘটি কুটুম বা আত্মীয়দেরই দিয়ে থাকে। এর অর্থ কুড়মিদে সঙ্গে এদের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। হতে পারে এই এলাকার মুসলমানদের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কুড়মি সমাজ থেকেই ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।" এদের মতে, স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে দূরত্ব স্থাপনের জন্যই এই কাহিনি রচিত হয়েছিল।

এইভাবে মহেনজোদড়ো হরপ্পা থেকে শুরু করে কুরমনদী, কুর্মাল, কুরমগড়, বিন্ধ্যাচল, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যভারত ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকা থেকে কুড়মিরা এসে ছোটনাগপুর তথা ঝাড়খণ্ডের মালভূমিতে বহুকাল আগে বসতি স্থাপন করেছে বলে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন আবার কেউ কেউ রাঢ়ভূমি ঝাড়খণ্ডকেই কুড়মিদের আদি বাসস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন।

যাইহোক, গ্রামসমীক্ষা, ক্ষেত্রগবেষণা, গ্রামনাম, ভূ-সম্পত্তির মালিকানা, গ্রামশাসন পদ্ধতি, গ্রাম পরিকল্পনা ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কুড়মিরা এই এলাকায় ঝোপঝাড় জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছে। চাষযোগ্য জমি তৈরি করেছে, কৃষিতে জলসেচ, স্নানাদি ও পানীয় জল সরবরাহের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে পুকুর খুঁড়েছে। পরিকল্পিতভাবে 'কুলহি' বা গ্রাম করেছে। গরাম থান, জাহিরা থান, ভানসিং, শিবমণ্ডপ, কুদরা, বাঘুত, দুয়ারসিনি, বড়াসিনি, রঙপাহাড়, রাঙ্গাহাঁড়ি, বিসাইচঁড়ি, চঁড়ি, রংকিনি, ঝংকিনি, পাঁচবহনি সাতবহিনি ইত্যাদি লৌকিক দেবদেবীর 'থান' বসিয়েছে। এদের পূজার জন্য 'লাইয়া' নিয়োগ করেছে। হাঁকডাক করার জন্য 'গড়াইত' গ্রামপাহারা দেওয়ার জন্য 'চৌকিদার', মাঠ পাহারা দেবার জন্য মাঠচৌকি, চুলদাড়ি কাটার জন্য নাপিত, কাপড় কাচার জন্য 'ধোপা', লোহার কাজ করার জন্য 'কামার', মাটির জিনিসপত্র তৈরির জন্য 'কুমহার', তেল সরবরাহের জন্য 'তেলি', প্রসূতি পরিচর্যার জন্য সহিস, যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য 'ডোম', কাপড় বোনার জন্য তাঁতি, চামড়ার কাজের জন্য মুচি ইত্যাদি বৃত্তিজীবী শ্রেণিকে গ্রামে বসিয়েছে। তাদের জন্য 'লায়ালি', 'গড়াতি', 'ধোবালি' ইত্যাদি জমি বন্দোবস্ত করেছে এবং বৎসরের শেষে মাঘমাসে 'গাঁ-ঘর' পদ্ধতি অনুযায়ী ধান-চাল, ডাল-সবজি ও মাইনে দেবার পরিকাঠামো তৈরি করেছে এবং সম্মিলিত জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে গ্রাম্য প্রশাসন ষোল-আনা স্থাপন করেছে। এই সমস্ত থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায় কুড়মিরা এই এলাকার আদিম অধিবাসী, আদিবাসী, আদিবাসিন্দা তথা মূলবাসী জনতা।

কুড়মি, কুর্মী, কটুম্বিন, কুনবি, কুটুম, কুরুমানিক :

G. S. Ghurye তাঁর 'Caste and Tribe in India' গ্রন্থে বলেছেন, "Kurmi, Kambi and Kunbi perhaps signify the occupation of the group, viz, that of cultivation, though it is not improvable that the name may be of tribal origin."

ক্ষত্রিয় আন্দোলনকারীরা বলেছেন 'কূর্ম' ষ্নিক প্রত্যয়যোগে কুর্মি' হয়েছে এবং কুর্মিরা কূর্ম ঋষির বংশধর। কেউ কেউ বলেছেন, 'কু' অর্থে' পৃথিবী 'রমি' অর্থে' 'রমন করা' বা চাষ করা অর্থাৎ

পৃথিবীর বুকে কৃষিকর্মের দ্বারা ফসল ফলানোর জন্য এই জাতির নামকরণ হয়েছে 'কুরমি'। কেউ বলেছেন কুরমি শব্দের অর্থ লাঙল এবং এই থেকে কৃষিজীবী এই জাতির কুরমি নামকরণ হয়েছে। পদ্মলোচন মাহাত বলেছেন, "কুরম নদী উপত্যকায় এদের আদি বাসস্থান ছিল এজন্যই এদের কুড়মি বা কুরমি বলা হয়েছে।" এমনিভাবে কুরমগড়, কুর্মাচল থেকে কুড়মি বা কুরমি শব্দের উৎপত্তির স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ।

টোটেমবাদীরা বলেন, কুড়মি-মাহাতরা কুড়ম, কুর্ম বা কচ্ছপকে দেবতা হিসেবে মানে। 'কচ্ছপ' বা কছুয়া যাদের গোত্র তারা কচ্ছপ খায় না এবং কুড়মি মাত্রেই নিজের ক্ষেত বা জমিতে কচ্ছপ পেলে খায় না। তেল ও সিঁদুর দিয়ে পুকুরে ছেড়ে দেয়। এই কুর্ম, কচ্ছপ, কুড়ুম থেকে 'কুড়মি' বা 'কুরমি' নামকরণ হয়েছে। মিঃ ক্ষুদিরাম মাহাত বলেছেন দ্রাবিড়ীয় প্রাচীন শব্দ 'কুটুম্বিন' বা 'কুটুম' শব্দ থেকেই 'কুরমি' শব্দ এসেছে। এই জাতি স্থানভেদে কুড়মি, কুরমি, কুটুম্বিন, কুনবি, কুরুম্বি, কুরুম, কুরুমানিক ইত্যাদি নামে পরিচিত।

অখিল ভারতীয় কুর্মী ক্ষত্রিয় মহাসভা এবং পুরুলিয়া তথা এতদঞ্চলের কুড়মিদের ক্ষত্রিয় আন্দোলন

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম প্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই বর্ণাশ্রমের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তালিকার উপরের দিকে স্থান করে নেওয়ার একটা উগ্র বাসনা আদিবাসী, হরিজন তথা বিভিন্ন ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হরিজন ও আদিবাসিরা যেহেতু ব্রাহ্মণ্য সমাজকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল না সেজন্য এদেরকে শূদ্র হিসেবে গণ্য করা হত এবং প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর উপরে তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা প্রচণ্ড রকম মানসিক অত্যাচার বা র‍্যাগিং চালানো হত। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর উপরে পরিকল্পিতভাবে মানসিক চাপসৃষ্টির জন্য বিভিন্ন দোষযুক্ত শব্দবাণ নিক্ষেপ করা হত। কোনো জাতির ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয়, কোনো জাতির মুখ দর্শন করলে যাত্রানাশ হয়, কোনো জাতির ছোঁয়া জল খেলে জাত যায়। এই সমস্ত শব্দবাণ বা অপবাদ উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও অত্যন্ত কুরুচিকরভাবে প্রযুক্ত হোত। এখনও তার প্রভাব বেশ ভালমতই রয়ে গেছে। কুড়মিদের প্রতি 'টঁড়কুড়মি' অপবাদ তেমনই একটি পরিকল্পিত সামাজিক র‍্যাগিং বা অপকৌশল যা একবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত।

ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির উপর এই ধরনের সামাজিক র‍্যাগিং জঘন্যভাবে প্রযুক্ত হওয়ার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের অনেক জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এটা দেখে তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়রা প্রমাণ গুনেছেন এবং উক্ত জনগোষ্ঠীগুলিকে মাঝে মাঝে দলে টানারও চেষ্টা করেছেন। ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত না হয়ে বর্ণাশ্রমের মধ্যে উঁচুর দিকে ওঠার প্রবণতা ইতর জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কখনও কখনও তীব্রতর হয়েছে। তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের করুণাতেই তা সম্ভবপর হত এবং আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'জলচল' অর্থে উচ্চবর্ণীয়রা যে জাতির বাড়িতে জলগ্রহণ করেন এবং 'জলঅচল' অর্থে উচ্চবর্ণীয়রা যাদের ছোঁয়া জল পান করে না তাদেরকেই বোঝায়। আদিম জনগোষ্ঠীগুলিন মধ্যে 'জলচল' ও 'জলঅচল' ট্রেডমার্ক কোনো একটি জাতির উত্থান ও পতনের সোপান হিসেবে পরিগণিত হত।

তাই লক্ষ করা যায় সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওরা কখনও কখনও উপবীত ধারণপূর্বক ক্ষত্রিয় আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে ব্রতী হয়েছে। বীরসামুণ্ডার "উলগুলান" এবং "ওঁরাওদের টানা ভগত আন্দোলন" এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একসময় ছোটনাগপুর এলাকার কুড়মি-মাহাতরাও 'টঁড়-কুড়মি' অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার

জন্য 'জলচল' তথা ক্ষত্রিয় হবার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করে। অন্যদিকে মুসলিম লিগের চাপে হিন্দুমহাসভা আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলিকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিতকরণের জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়ে এবং হিন্দুমহাসভার প্রত্যক্ষ মদতে উড়িষ্যার নিরঞ্জন মহান্তর নেতৃত্বে পুরুলিয়ার কুড়মিরাও ক্ষত্রিয় আন্দোলনে সামিল হয়ে অল ইন্ডিয়া কুর্মি ক্ষত্রিয় মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হয়। ঘাঘরজুড়ি, চরকাটা, ঝালদা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় কুড়মিদের বিশালাকারে জমায়েত হয়। শুরু হয় সংস্কারমূলক নানান বিধিনিষেধ। মাতব্বর কুড়মিরা পৈতা ধারণ করে গায়ত্রী জপ শুরু করে। বিধবা বিবাহ বা দ্বিতীয় বিবাহ 'সাঁঘা' প্রথা বন্ধ করা হয়। নারীপুরুষের যৌথ নৃত্যগীত, করমনাচ-জাওয়া নাচ, মেয়েদের যত্রতত্র হাটে মুরগি বাজারে যাওয়া, পোষা মুরগি খাওয়া, শূকর বলি, শূকর মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়। পৈতাধারণ-গায়ত্রী জপের সঙ্গে চলতে থাকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধাদি, বিবাহ, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি। কিন্তু কুড়মি মাহাতদের অধিকাংশ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। বিশেষত কুড়মি মহিলারা এই ব্যবস্থা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বিধবা-বিবাহ বা 'সাঁঘা' প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে কুড়মি-মহিলাদের সামাজিক স্বাধীনতা খর্ব হয়। পর্দাপ্রথার ফলে অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুড়মিদের কিছু মাতব্বর শ্রেণি ক্ষত্রিয় আন্দোলনে যুক্ত হয় কিন্তু সাধারণ খেটে-খাওয়া কুড়মিরা এবং অধিকাংশ কুড়মিরা এর বিরোধীতা করে। মহিলারা যে এটা মেনে নিতে পারেনি করমগীতের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেশে দেশে চিঠি গেলেইক
গলমারাঞ মিটিং হেলেইক
ওগো শশী মাহাতঞ
শশী মাহতঞ ডাকলঅ মিটিং
খুখড়ি-মুরগি ছাড়াছাড়ি
রামহন লেইকে বিহা করি
রাঁড় বেটি ঘুরহ মাঝাঞ—

অর্থাৎ মুরগি পালন নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিধবা বিবাহ বা দ্বিতীয় বিবাহ। 'সাঁঘা' প্রথা চালু থাকার ফলে সমাজে যেখানে বিধবা সমস্যা ছিল না সেখানে কুড়মি পরিবারেও বিধবা মহিলাদের সমাজের গলগ্রহ হয়ে দিন কাটাতে দেখা যায়। অন্যদিকে 'ছাড়-বেড়' প্রথা চালু থাকার ফলে, শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নিতে অপারগ হলে বা স্বামী পছন্দ না হলে বা বরের কনে পছন্দ না হলে ছেলে-মেয়ে উভয়েই 'ছাড়-বেড়' করে দ্বিতীয় বিবাহ বা 'সাঁঘা' করতে পারত কিন্তু এই প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে বিশেষ করে মেয়েদের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। কারণ ছেলেরা এক স্ত্রী থাকতেও দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়।

মুন্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাওরা যেমন পৈতা ধারণ করেও আদিবাসীই রয়ে গেছে তেমনি কুড়মি মাহাতরাও ক্ষত্রিয় আন্দোলন করে 'জলচল' বা ক্ষত্রিয় হতে পারেনি। 'টঁড়-কুড়মিরা' সমাজের যে স্তরে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। কিন্তু এই আন্দোলনে কুড়মিরা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল বা ক্ষত্রিয়ত্বর প্রতি কতখানি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তার কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

গত ৯ জুলাই ১৯৯৬ কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত গোকুলানন্দ লাহার একটি পত্রের উত্তরে শালগেড়িয়া মেদিনীপুর থেকে তপনকান্তি মাহাত লিখেছিলেন—"অনাহারে আত্মঘাতি" শীর্ষক সংবাদে পুরুলিয়ার সরুকালি মাহাতকে আদিবাসী মহিলা হিসেবে উল্লেখ করা

হয়েছিল। এবিষয়ে গোকুলানন্দ লাহা প্রশ্ন তুলেছেন, কুড়মিরা হিন্দুজাতিভুক্ত না আদিবাসী?

তপন কান্তি মাহাতর বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গের মাহাত পদবিধারীরা কুর্মি সম্প্রদায়ভুক্ত। কুড়মিরা হিন্দুধর্মেরই ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত। কুড়মিদের কোনোমতেই আদিবাসী পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কুড়মিদের নিজস্ব জাতিগত সংগঠন আছে, যার নাম অখিল ভারতীয় কুর্মি ক্ষত্রিয় মহাসভা। এটি স্থাপিত হয়—১৮৯৪ সালে লখনউতে। সভাপতিত্ব করেন রায়সাহেব গেন্দনলাল। ভারতের বিভিন্ন শহরে এপর্যন্ত মহাসভার ৩৬টি মহাসম্মেলন হয়েছে। এইসব সম্মেলনে প্রখ্যাত কুর্মি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাক্তিরা সভাপতিত্ব করেছেন। যেমন (১) ব্যারিস্টার বি. নাগাপ্পা (২) ব্যারিস্টার সি. ভি. নাইডু। (৩) বিঠল ভাই প্যাটেল (Speaker of Central Lagislative Assembly) ইনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বড়ভাই (৪) সম্পত রাও গায়কোয়াড়—বরোদার মহারাজার ভাই (৫) বালশৌরি রেড্ডি, সম্পাদক চাঁদমামা (হিন্দি) মাদ্রাজ।

সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত সর্বভারতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কুর্মি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ হলেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি, লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রবি রায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে আছেন মাধবরাও সিন্ধিয়া, শারদ পাওয়ার, চন্দুলাল চন্দ্রাকর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া কর্ণাটকের যে ভাক্কালিগা গোষ্ঠীভুক্ত তা কুরমি ক্ষত্রিয়দেরই একটি গোষ্ঠি (সূত্র কুর্মি চেতনার ১০০ বর্ষ, লেখক ব্রিগেডিয়ার দিলবার সিং, জয়শোয়ার, প্রকাশক গীতাঞ্জলি প্রকাশন, দিল্লি) উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ কখনই আদিবাসী হিসেবে গণ্য হননি।

ঋগ্বেদের অষ্টম খণ্ডের ৬৬তম শ্লোকের 'কুর্মা' শব্দ থেকে কুর্মি শব্দের উদ্ভব হয়েছে। কুর্মি শব্দের অর্থ প্রভু শক্তিমান। স্কন্দপুরানে উল্লেখ আছে মনুপুত্র বিবস্বান শয্যাতির বংশজরা (সূর্যবংশীয়) পরবর্তীকালে কুর্মি নামে পরিচিত হয়। ১৯২০ সালে হায়দরাবাদের তৎকালীন নিজাম নিজ রাজ্যের জনগণনার জন্য হায়দরাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ উলহাসানকে কমিশনার নিযুক্ত করেন। হাসান সাহেব তাঁর 'The Castes and Tribes of his excelancy the Nizam Dominion' বইটিতে Chapter 2 vi page 370) বেদপুরাণ উল্লেখপূর্বক দেখিয়েছেন, কুর্মি জগত প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশজাত। হাসান সাহেব কুর্মিদের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন—The religion of the Kurmis does not differ materially from that of the highest Hindu Castes in nothern India. .....They will eat kachhi foods cooked only by Kanojia Brahman, who is their family priest. All Castes including Brahman will eat Pakki food from their hands (Kurmis),

ভারত সরকারের ১৯১১ সালের Census Report এ Castes and Subcastes of the Hindus যেসব Castes and subcastes নথিভুক্ত করা হয়েছে তাতে ক্রমিক নং 373-Kunbi, 374-Kurmis, 375-Kurmis Kshatriya, 376-Kurum, Kunbi। Subcaste-গুলির Caste হিসাবে Kurmis ধরা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে এটা পরিষ্কার যে, কুর্মি জাতি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। কুর্মিরা পিছিয়ে পড়া জাতি (backward class) হিসেবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু আদিবাসী হিসাবে নয়।

তরুণদের ভট্টাচার্য তার 'পুরুলিয়া' গ্রন্থে বলেছেন, "উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার কৃষিজীবী হিসেবে কুর্মিদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। কুর্মিদের উদ্ভব সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। অনেকের মতে তারা প্রাচীনতম অর্থ-উপনিবেশকারীদের বংশধর। এই অভিমত যারা পোষণ করেন তাদের মধ্যে E. T. Dalton (Descriptive Ethriogy of Bengal), Buchanan (Eastern India vol-1), Sir Henry Elliot (Races of North Western

Province), Sherring (Hindu Castes and Tribes) Nesfield (Brief view of the Caste system), Sir George Campbell (Ethnology of India).

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কুর্মিদের চেহারায় আর্যপ্রভাব লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণদের তুলনায় কমমার্জিত, রাজপুতদের তুলনায় কম সৌষ্ঠব সম্পন্ন তবু অসুন্দর নন। উচ্চতা মাঝারি, অবয়ব মানানসই, গায়ের রং বাদামি থেকে তামাটে, হাল্কা শরীর। উপজাতিদের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটলেও চেহারায় আর্যপ্রভাব অবলুপ্ত হয়নি।

ছোটনাগপুর তথা মানভূম বা পুরুলিয়ার—কুড়মি মাহাতরা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে, ছত্রপতি শিবাজীকে আদর্শ পুরুষ হিসেবে সামনে রেখে, সারা ভারত কুর্মি ক্ষত্রিয় মহাসভার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। যদিও উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কুর্মিদের সঙ্গে এদের বৈবাহিক বা সামাজিক যোগাযোগ এখনও নেই।

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থে বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য ঘটনা বারবার চোখে পড়ে। যে কোনো কারণেই হোক এদেশে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা বৈদিক ঐতিহ্যের গরিমা চেয়েছিলেন। এমনকি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালেও শুদ্র শিবাজি রাষ্ট্রশক্তি লাভ করার পর কাশী থেকে গার্গভট্ট বলে জনৈক পণ্ডিতকে আনিয়ে তার সাহায্যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করলেন।"

সুতরাং সম্পন্ন চাষি, জমিজমা, বাঁধ-বাগানের মালিক, ভূস্বামী, সামন্ত তথা গ্রামের মাতব্বর মাহাতরা ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক।

ডালটনের অনুমান আংশিকভাবে মেনে নিলেও ছোটনাগপুর এবং প্রধানত মানভূমের কুর্মিদের সম্বন্ধে রিসলে সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পারেননি। মানভূম ও উড়িষ্যার উত্তরাংশে বসবাসকারী কুর্মিদের চেহারায় আর্যপ্রভাব যেমন অনুপস্থিত, ভূমিজ ও সাঁওতালদের সঙ্গে তেমনি সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

উচ্চতায় খর্বাকৃতি, শক্ত সামর্থ শরীর, গায়ের রং কালো, চেহারায় দ্রাবিড়ীয় সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। রিসলে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কুর্মি থেকে তাহলে কি মানভূম ও উড়িষ্যার কুর্মিরা পৃথক জনগোষ্ঠী? উত্তর দিতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ে অনুমান করেছিলেন। "এক, কুর্মিরা দুটি সুস্পষ্টভাগে বিভক্ত। আর্যগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত এক শাখা, দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত অপর শাখা। দুই, সমগ্র সম্প্রদায়টিই আর্যগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। রক্তের সংমিশ্রণ ও জীবিকার নিরিখে পরবর্তীকালে পৃথক হয়েছেন। তিন, সমগ্র সম্প্রদায়টিই আদিতে দ্রাবিড়ীয়। সংমিশ্রণের ফলে একগোষ্ঠী উন্নত হয়ে উঠেছিলেন, অপর গোষ্ঠী প্রত্যন্ত প্রদেশে বসবাস করার ফলে প্রায় আদিম অবস্থায় রয়ে গিয়েছিলেন।"

শেষোক্ত অনুমানের বিমিশ্র সমর্থন পাওয়া যায় ডালটনের সমীক্ষায়। দক্ষিণ ভারতে এই উপজাতি বা সম্প্রদায়টি কুমনি বা কুনবি নামে পরিচিত। সিন্ধিয়ারা সাঁতারার কুর্মি প্যাটেল হিসেবে স্বীকৃত। ভোঁসলা পরিবার দেওরির প্যাটেল এবং সম্ভবত কুর্মি। পঞ্চকোটের রাজাদেরও ডাল্টন কুর্মি সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুর্মি সম্প্রদায় দুটি মোটা দাগে বিভক্ত। ঝারি কুনবি বা জঙ্গলের কুনবি ও মারাঠা কুনবি। ঝারি কুনবিরা জঙ্গল কেটে প্রথমে বসতি ও আবাদ পত্তন করেছিলেন। মারাঠা কুনবিরা এসেছিলেন বর্গী অভিযানের সময়।" (পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য)

রিসলের তৃতীয় অনুমান, সমগ্র সম্প্রদায়টি আদিতে দ্রাবিড়ীয়। সংমিশ্রণের ফলে একগোষ্ঠী

উন্নত হয়েছিলেন অপর গোষ্ঠী প্রত্যন্ত প্রদেশে বসবাস করার ফলে প্রায় আদিম অবস্থায় রয়ে গিয়েছিলেন।" বর্তমান কুড়মি-মাহাত বা কুড়মালি গবেষকরা রিসলের এই শেষোক্ত অনুমানের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

যদিও কুড়মিদের প্রাচীন সমাজ কাঠামো বর্তমানে বিভিন্ন কারণে ভেঙে পড়েছে তবুও সেই ভগ্নাবশেষ থেকে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে রিসলের এই অনুমান প্রায় অভ্রান্ত। তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি 'রক্তশুদ্ধতা' এবং আর্য গোষ্ঠীগুলি 'রক্তের সংমিশ্রণে' বিশ্বাসী। আর্য গোষ্ঠীগুলি মনে করে রক্তের সংমিশ্রণের ফলে উন্নততর মানবগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। যেহেতু আর্যরা বহিরাগত এবং ভারতীয় আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। পরবর্তীকালে খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ ইত্যাদি ধর্মামতাবলম্বীরাও এই মতবাদ অবলম্বন করেছেন এবং অন্য যেকোনো সমাজের নারী পুরুষকে ধর্মান্তরিত করে স্বধর্মে স্থান দিয়েছেন।

অন্যদিকে আদিম জনগোষ্ঠীগুলি রক্ত শুদ্ধতা বজায় রাখতে, সমাজের কেউ বৈবাহিক কারণে নিজের জাতিগোষ্ঠীর বাইরের কারুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তাকে সমাজচ্যুত করে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছে। এটা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, কোল খাড়িয়া সমস্ত উপজাতিদের সঙ্গে কুড়মি সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। কুড়মি মাহাত সমাজ অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করে না। সেজন্য অসবর্ণ বিবাহকারী কুড়মিদের কয়েকটি উপশাখা (Subcaste) কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। কুড়মি বাবা এবং অন্য জাতির মা এরকম দম্পতির ছেলেমেয়েদের নিয়ে তৈরি হয়েছে 'আধ-কুড়মি' সমাজ। বৈবাহিক ক্ষেত্রে আধকুড়মিরা নিজেদের মধ্যেই বিবাহাদি সম্পন্ন করে। মূল কুড়মি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের বৈবাহিক লেনদেন হয় না।

কুড়মি-মাহাতরা কি আদিবাসী?

কোন আদিম জনগোষ্ঠীর বিবর্তনবাদ অনুযায়ী আমরা জানি নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষ একটি পথ পরিক্রমার পর সেই জাতি একটি সুসভ্য জাতিতে রূপান্তরিত হয়। আদিমতার প্রথম পর্যায় শিকার এবং খাদ্য আহরণকারী (Hunting and food gathering), দ্বিতীয় পর্যায় স্থান পরিবর্তনকারী চাষি (Shifting Cultivation), তৃতীয় পর্যায় কৃষিজীবী (Cultivation) এবং সর্বশেষ বা চতুর্থ পর্যায় সুসভ্য জাতি (Civilization)। এই পথ পরিক্রমা রক্তের সংমিশ্রণ এবং জীবনচর্চার কালক্ষেপণের উপর নির্ভরশীল। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নাগরিক শিক্ষায় তার স্বভাবগত বা প্রবৃত্তিগত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 'জারুয়া' বা 'ওঙ্গি'দের সুসভ্য করার জন্য কম প্রচেষ্টা হয়নি। কিন্তু জারুয়াদেরকে লোকালয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ওঙ্গিরা লোকালয়ে আসে কিন্তু সামাজিকতা বা আধুনিক সভ্যতার মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। একজন সাঁওতাল গৃহবধু সুশীলা বাস্কে স্বামীর চাকুরিসূত্রে আন্দামানে ছিলেন। তার প্রত্যক্ষ দর্শনের বর্ণনা অনুযায়ী, "ওঙ্গিরা লোকালয়ে আসত। একদিন আমি বারান্দায় বসে চুল বাঁধছি, একটি ওঙ্গি মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় এসে হাজির। আমি ওকে একটা কাপড় দিলাম। আমার কাপড় পরা দেখে সে সেটা কোনোক্রমে গায়ে জড়িয়ে নিল। আমি সিঁদুর পরছিলাম, সে আমার কাছে হাত পেতে সিঁদুর নিল এবং কপালে থেবড়ে নিল। নিজের গায়ে কাপড় জড়ানোটা নিজেই ঘুরে ফিরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপর এক ঝটকায় কাপড়টা টেনে খুলে, ফেলে দিয়ে যেমনভাবে এসেছিল তেমনি ভাবেই চলে গেল।"

এই ঘটনা থেকে এটাই পরিষ্কার যে ওঙ্গি মেয়েটি আদিমতার যে পর্যায়ে রয়েছে সেখানে কাপড় চোপড় পরা বা সিঁদুর পরা ইত্যাদির কোনো মূল্যই নেই। আমরা পুরুলিয়া জেলাতেই সভ্যতার আলোকে অনেকখানি আলোকিত শবরদের উন্নয়নের জন্য অনেক চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু যতটা উন্নয়ন এদের হওয়া উচিত ছিল ততটা উন্নয়ন হয়েছে কি? কখনও কখনও দেখা যায় এদের জন্য সরকার পাকা বাড়ি তৈরি করে দিলেও এরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ এদের আদিম বন্য স্বভাব অনুযায়ী এদের কাছে বাড়ি ঘরের কোনো মূল্য নেই। আধুনিক সুসভ্য সমাজব্যবস্থায় উন্নীত হতে হলে এদেরকেও সেই বিবর্তন পথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে হবে।

কুড়মি-মাহাতদেরকে আমরা Shifting Cultivation থেকে Cultivation এবং Civilization এ দ্রুত অংশগ্রহণ করতে দেখছি। কিছুকাল আগেও এরা Shifting Cultivation পর্যায়ে ছিল। যার জন্য পুরুলিয়া, মানভূম বা ছোটনাগপুর এলাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, আসামের চা-বাগানগুলিতে সুন্দরবনে, বাংলাদেশে এরা অতি দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়েছে। খরা, খাদ্যাভাব, গোষ্ঠী সংঘাত ইত্যাদি অনেক কারণ তো আছেই। অনেক সময় দেখা গেছে, কুড়মিরা কোনো এলাকায় জঙ্গল কেটে চাষযোগ্য জমি তৈরি করেছে পুকুর তৈরি করেছে, গ্রামে জনবসতি স্থাপন করেছে তারপরেও কোনো অঘটন, কোনো অকাল মৃত্যু বা অন্য কোনো দুর্ঘটনাকে সংস্কারবশত 'খাটাবাঢ়া' হিসেবে সাব্যস্ত করে সেই স্থান অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করেছে।

Shifting Cultivation থেকে Cultivation বা কৃষিজীবী পর্যায়ে আসার পর কুড়মি-মাহাতদের জমি কেন্দ্রিক মানসিকতা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে। তৈরি হয়েছে জমির প্রতি সীমাহীন মোহ। "The land to a Kudmi Mahato is not only land but also something much more emotionally and spiritually. It is the begining of his dream to be a subsistent peasant."

যেকোনোভাবে জমি করায়ত্ত করার মনোবৃত্তির ফলেই পুরুলিয়া তথা এতদঞ্চলের চাষযোগ্য জমির বৃহদংশ আজও কুড়মি মাহাতদের দখলে রয়েছে। প্রবাদ আছে, "কুড়মিঞ অরজত্ চিনি খাত্ পানি।" অর্থাৎ কুড়মিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কিন্তু পানি অর্থাৎ মাড় বা ফ্যানভাত খেয়ে দিন কাটায়। না খেয়েও এরা পয়সা জমানোর চেষ্টা করে এবং হাতে পয়সা জমলে একটুকরো জমি কেনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

উন্নততর কৃষিজীবী পর্যায়ে কুড়মিরা পরিকল্পিতভাবে গ্রাম তৈরি করেছে, চাষযোগ্য জমি তৈরি করেছে, জলসেচের জন্য পুকুর খুঁড়েছে, জাহির, গরাম, বড়াম, গঁসাই রাই, ভানসিং, কুদরা, বাকুত ইত্যাদি লৌকিক দেবদেবী স্থাপন করেছে, লায়ানি সম্পত্তি দিয়ে 'লায়া' বা পূজারী ঠিক করেছে। মিটিং জমায়েতে হাঁকডাক করার জন্য 'গড়াইত', নিয়োগ করেছে। গ্রাম পাহারার জন্য চৌকিদার ব. থানদার, মাঠ পাহারার জন্য মাঠচৌকি, লোহার তৈরি লাঙলের ফলা, পাসি, গাঁইতি, কোদাল, তাবলা, তলোয়ার, বল্লম, কুঠার ইত্যাদি বানানোর কারিগর হিসেবে কামার, মাটির হাঁড়িকুড়ির জন্য কুমোর, প্রসূতি পরিচর্যার জন্য সহিস, যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য ডোম, চুলদাড়ি কাটার জন্য নাপিত, কাপড় কাচার জন্য ধোপা, চামড়ার কাজের জন্য মুচি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য কারিগর বা বৃত্তিজীবী শ্রেণিকে গ্রামে এনে কখনও জমি দিয়ে আবার কখনও 'গাঁ-ঘর' পদ্ধতিতে বাৎসরিক ধান-চাল জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কুড়মি গ্রামগুলিতে এখনও এই পদ্ধতি চালু আছে এবং 'লায়া-কানালি', ধোবিয়া-কানালি, গড়াইত-হিড়, কামার-গাড়া ইত্যাদি জমি নাম থেকে বৃত্তিজীবীদের জমি দানের হদিস পাওয়া যায়।

এই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কৃষিজাত ফসল। এই সময়েই লোকভাষা, লোকসঙ্গীত, লোকসাহিত্য তথা লোক-সংস্কৃতি প্রতিটি বিভাগের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। টুসু, ভাদু, করম, জাঁত, অহিরা, ঝুমুর, বিয়ের গান ইত্যাদি লোকসঙ্গীত, ছো-নাচনী, নাটুয়া, মাছানি ইত্যাদি লোকনৃত্য-নাট্য, লোক-সাহিত্য কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অবদান। বর্তমানে কুড়মিদের একাংশ নাগরিক সভ্যতার প্রতি দ্রুত ধাবমান। এই অবস্থায় এদের সঠিক পরিচয় উদ্ঘাটন সহজসাধ্য নয়।

'লোকায়ত দর্শন'-এর লেখক অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আদিবাসী বা ট্রাইবাল ইন্ডিয়ার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "অবশ্যই নির্ভরযোগ্য সেন্সাস রিপোর্ট বলতে পুরনোকালের বিশেষ কোনো দলিল পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষিই সর্বপ্রথম দেশের মানুষগুলিকে ভালো করে গুনে দেখবার ও তাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা হয়েছিল। এই রিপোর্ট থেকে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত (এবং আধুনিক রিপোর্ট অনুসারে আজও অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত) আমাদের দেশ থেকে ট্রাইবাল সমাজ বিলুপ্ত হয়নি। ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্ট অনুসারে ১৮৬০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১৮০ লক্ষ মানুষ তখনও ট্রাইবাল সমাজেই জীবনযাপন করছে।" ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস থেকে, এদের নাম দেওয়া হয়েছে জংলী লোক বা 'এবরিজন'।

অর্থাৎ "আর্য আক্রমণের দরুন, সমতল দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা পর্বতে গিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে। বিলুপ্ত জীবজন্তু বিষয়ক বৈজ্ঞানিকেরা পাহাড়ের গুহায় যেরকম বিলুপ্ত জানোয়ারের অস্থি আবিষ্কার করেন এদের অবস্থাও খানিকটা তার মতন। তাই ভারতবর্ষের অবস্থাটা যেন জাতিতত্ত্বের এক বিরাট যাদুঘরের মতো। যেখানে আমরা মানুষকে তার সংস্কৃতির নীচুস্তর থেকে শুরু করে সবচাইতে উঁচুস্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারি।"

লেখক অন্যত্র এই ট্রাইবাল সমাজের মানুষগুলি সম্বন্ধে বলেছেন— The fragements of Prehistoric World– প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর টুকরোর মতো। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষের চেহারাটাই যদি এই হয় তাহলে হিন্দু আমলের ভারতবর্ষের ছবিটা নিশ্চয়ই অনুমান করা কঠিন নয়।

কিন্তু ১৮৭১-৭২ সালের ওই রিপোর্টটির আরও বিস্ময়কর তথ্য হল বাকি ১৮৬০ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ১৫২০ লক্ষ মানুষ যে কোথা থেকে এলো তার সঠিক হিসেব দিতে পারা যাচ্ছে না। কেননা এই রিপোর্টে দেশের মাত্র ১৮০ লক্ষ মানুষকে উঁচু জাতের বলে অর্থাৎ বর্ণনা দাতাদের ভাষায় বিশুদ্ধ আর্যসন্তান হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে এই ১৫২০ লক্ষ মানুষের ব্যাখ্যা হিসেবে শুধু এইটুকুই বলা হচ্ছে যে আদিতে এরা ছিল স্থানীয় অসভ্য ও অনার্য মানুষ। আমরা এদেশে এসে সভ্যতা বিস্তার করবার পর এরা ক্রমে ক্রমে আর্যসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে এবং সভ্য হয়ে উঠেছে। (১৮৭১-৭২-এর সেন্সাস অনুসারে অবশ্য পরে এই ১৫২০ লক্ষের মধ্যে ৪১০ লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সমাজে আর্য-অনার্য বা আদিবাসী অ-আদিবাসী চিহ্নিতকরণ বর্তমানে অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কিন্তু গ্রামজীবন থেকে ট্রাইবাল সমাজের সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত হতে পারেনি। কেননা উৎপাদন কৌশলে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়নি। ট্রাইবাল সমাজ ভেঙে যে সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে পুরনো উৎপাদন কৌশলের ভিত্তিতেই যদি ছোটো ছোটো আর নতুন গ্রাম নিবেশ হয়ে থাকে তাহলে এই গ্রামগুলির মধ্যে থেকে ট্রাইবাল সমাজের সমস্ত

চিহ্ন নিঃশেষে মুছে যাবার কথা নয়। সুতরাং আদিবাসীত্বের অনুসন্ধানে আমরা পুরুলিয়ার কুড়মি মাহাতদের সামাজিক চিহ্নগুলি পর্যালোচনা করতে পারি।

আদিবাসী বলতে কী বোঝায়?

আদিবাসী কথাটার শাব্দিক অর্থ 'আদিবাসিন্দা' অর্থাৎ যারা কোনো এলাকা বা অঞ্চলে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছে তারাই সেই এলাকার আদিবাসী। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আদিবাসী বলতে আর্যদের আগমনের আগে যে সমস্ত অনার্য, অসুর, রাক্ষস, দৈত্য, দানব, নাগ, পিতর ইত্যাদি অষ্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর জনজাতি বাস করত তাদেরকেই বোঝায়।

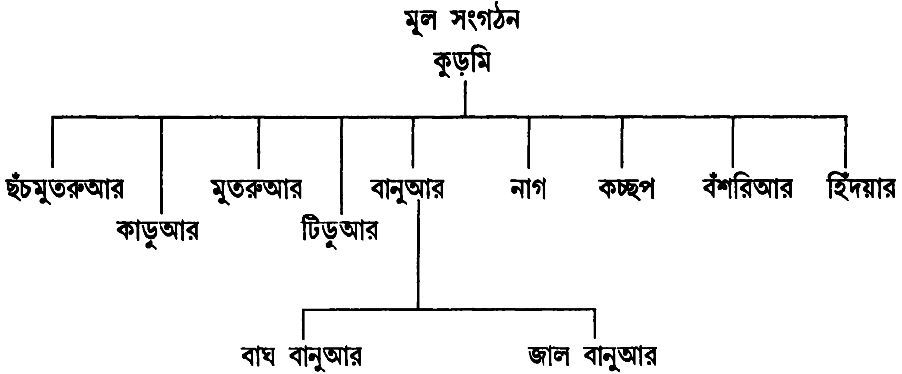
কিন্তু বর্তমানে আমরা আদিবাসী বলতে সাধারণত বুঝি কোনো একটি অনগ্রসর মানবগোষ্ঠী যারা সভ্য সমাজ থেকে দূরে কোনো অঞ্চলে বসবাস করে, কায়িক পরিশ্রম, শিকার ইত্যাদিতে জীবিকা নির্বাহ করে, আধুনিক সভ্যতার আলোক দ্বারা যারা আলোকিত নয়। যারা কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত, প্রতি গোষ্ঠী আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত, যাদের গোষ্ঠীগুলির মিলিত সংগঠনকে একটি মানবগোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা যায় (Confederacy of the Tribes)। বিভিন্ন গোষ্ঠী কোনো না কোনো টোটেমে বিশ্বাসী। এদের এই টোটেম বিশ্বাস, কোনো জীব জন্তু, পশু, পাখি, গাছ, পাথর, ফল, ফুল, লতা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। যাদের নিজেদের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশের জন্য নিজস্ব ভাষা আছে, বিনোদনের জন্য নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, পালা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, নেগ-যোগ, সামাজিক-সংগঠন, জন্ম সংস্কার, মৃত্যু সংস্কার, বিবাহ প্রথা ইত্যাদি আছে। যাতে একই গোষ্ঠী বা গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ আবার মূল সংগঠনের বাইরেও বিবাহ নিষিদ্ধ। নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ এককথায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মানবগোষ্ঠী যাকে আধুনিক উন্নত সমাজ থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়।

কুড়মিদের সামাজিক সংগঠন ও গোত্রমালা—মূল সংগঠন বা প্রজাতি কুড়মি বা কুরমি। কুর্ম, কুডুম, কুরম অর্থে কচ্ছপকে এরা কুলদেবতা হিসেবে মানে। কুড়মিদের মধ্যে যাদের টোটেম বা গোত্র কাছিম বা কছুয়া তারা কচ্ছপ খায় না। আবার কুড়মিদের অন্যান্য গোত্রীয়রাও নিজের ক্ষেত বা জমিতে কচ্ছপ পেলে সেটি না খেয়ে তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুকুরে ছেড়ে দেয়। তেল সিঁদুর কুড়মিদের পূজার মূল উপকরণ। আর্যগোষ্ঠীগুলির পূজা অর্চনায় তেল ও সিঁদুর অশুদ্ধ বলে বিবেচিত। কচ্ছপকে তেল সিঁদুর দিয়ে দেবতাজ্ঞানে মান্য করা এদের টোটেম বিশ্বাসের পরিচায়ক।

ভারতীয় আর্য-অনার্য সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলিরই বিভিন্ন গোষ্ঠী বা গোত্র আছে। আদিবাসী জাতিগুলিও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই গোষ্ঠী বা গোত্রগুলির মিলিত সংগঠনকে (Confederacy of the Tribes) কোনো জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অ-আদিবাসী বা আর্য জাতিগুলির গোষ্ঠী সাধারণত কোনো মুনি ঋষি বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নামাঙ্কিত। যেমন—ভরদ্বাজ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি আদি মানবের টোটেম বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত কোনো গাছ, পাতা, ফুল, ফল, লতা, কোনো বস্তু, জীবজন্তু, পশুপাখি ইত্যাদির নামে পরিচিত হয়। কোনো টোটেমের নামে পরিচিত হওয়া গোষ্ঠী উক্ত টোটেমকে দেবতাজ্ঞানে মানতে থাকে বংশপরম্পরাগতভাবে। কুড়মি মাহাতরাও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং এদের গোষ্ঠীগুলিও টোটেনিক।

কুড়মিদের অনেকগুলি গোষ্ঠী বা গোত্র আছে। কুড়মালি প্রবাদ "টঁড় কুড়মি একাশি" উল্লেখ করে অনেকেই কুড়মিদের মোট একাশিটি গোত্র আছে বলে মনে করেন। সেই গোষ্ঠীগুলির

আবার কয়েকটি করে উপগোষ্ঠী বা গোত্র রয়েছে। কুড়মিদের গোত্রগুলি যেমন—মুতরুআর, কেশরিআর, টিডুআর, ডুমরিআর, চিডুয়ার, কাড়বার, বানুআর, হিঁদয়ার, হঁসদোআর, বঁসরিআর, হেমরামিয়া, হিমুয়ার, শাঁখুয়ার, কজুআ, নাগ, নাংটোয়ার, চিলবিংধা, পুনুরিআর, কানুয়ার, কাঠিআর জেঁগটিআর, পাঁড়কিআর, ধানুআর ইত্যাদি। এই গোত্র বা গোষ্ঠীগুলির উপগোত্র ও থাকতে পারে। কয়েকটির ক্ষেত্রে উপগোত্র বা বিভাজন দেখা যায়। যেমন—মুতরুআর, ছঁচমুতরুআর, নাঁগটোয়ার, নাগ-নাংটোয়ার, বানুআর, বাঘবানুয়ার, জাল বানুয়ার ইত্যাদি।



কুড়মি মাহাতদের গোত্র বা গোষ্ঠীগুলির সবই টোটেমিক। যেমন কুতরুআর অর্থে মাকড়সা, ছঁচমুতরুআর অর্থে, চালের মাকড়সা, কেশরিআর অর্থে কেশরঘাস, টিডুআর অর্থে তীর, ডুমরিআর-ডুমুর ফল, কাড়বার অর্থে কাড়া বা মহিষ, বাঘবানুআর-বাঘ, সাঁখোয়ার অর্থে শাঁখা, কচ্ছুআ, কচ্ছপ, চিলবিঁধা-চিল, নাগ-সর্প, জেংটিআর-কেঁচো, ধানুআর-ধান, পাঁড়কিআর-ঘুঘু ইত্যাদি।

এই গোষ্ঠীগুলির আবার আলাদা আলাদা দাগ রয়েছে। বৈবাহিক ক্ষেত্রে দেখা যায় কখনও কখনও বর এবং কনে পক্ষের একই গোষ্ঠী বা গোত্র সুতরাং বিয়ে বন্ধ হয়ে যায় এক্ষেত্রে দুপক্ষের দাগগুলি মেলানো হয়। যদি দেখা যায় উভয়পক্ষের গোত্র একই অথচ দাগ আলাদা তাহলে বিয়ে হতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলি প্রত্যেকেই নিজ নিজ টোটেমকে কুলদেবতা হিসেবে মেনে আসছে। যেমন মুতরুআররা মাকড়সা মারে না, ছঁচমুতরুআররা চালের মাকড়সা মারে না। জালবানোয়াররা জাল ছোঁয় না, বাঘ বানুয়াররা বাঘকে দেবতা বলে মানে। কছুআরা কচ্ছপ, নাগরা সাপকে দেবতা মানে। শাঁখোয়ার গোত্রের মহিলারা শাঁখা পরে না। ডুমরিআররা ডুমুরফল, কেশরিআররা কেশর ঘাস, কচ্ছআররা কচ্ছপ খায় না। কাড়ুআররা কাড়া বা মহিষ দিয়ে লাঙ্গল টানিয়ে চাষ করে না ইত্যাদি গোত্রগত বিধিনিষেধগুলি এরা দায়িত্বশীলভাবে পালন করে। অবশ্য ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সময় এই গোষ্ঠী বা গোত্রগুলিকে আর্য গোষ্ঠীর গোত্রনামগুলির সঙ্গে মেলানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

অন্যান্য আদিবাসীদের গোষ্ঠী বা গোত্রগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য : ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনা পুরুলিয়া তথা মানভূম এলাকার আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত বা তালিকাভুক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, খাড়িয়া, বীরহোড় ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলিই প্রধান। এদের মধ্যে যে সমস্ত গোষ্ঠী বা গোত্র নাম আছে সেগুলি হল—সাঁওতালদের-হাঁসদা, টুডু, সোরেন, মুর্মু, কিসকু, বেসরা, মাণ্ডি, কয়ডা, বাস্কে, হেমব্রম ইত্যাদি বারোটি গোষ্ঠী, ওঁরাও

হোরো, টেটে, কেরকেটা, লাকড়া ইত্যাদি। মুণ্ডা ও ভূমিজদের, বড্ডা, কুরকুটিয়া, বারদা, ভুএগ্রা (মাছ), চণ্ডিল, গুলগু, (মাছ) হাঁসদা (হাঁস), হেমব্রম (পানপাতা), জারু (পাখি) পিলা, সাগমা, সণ্ডিল (পাখি), কচ্ছপ, লেঙ (ব্যাঙের ছাতা), নাগ (সাপ), আবাসসারি (পাখি) শাওলা টেসা (পাখি), তুমারত (লাউ), তুতি (সব্জী), উবুর সাণ্ডিল, যুগি, সামা, পরসা, সাঁইথিয়া, দেও, কয়রা, সিরকা ও কাউরি।

অনুরূপভাবে খাড়িয়া, হো, বীরহোড়দের গোত্রগুলিও স্পষ্টত টোটেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। টোটেমের ইঙ্গিতবহ দ্রব্য, প্রাণী বা বৃক্ষ সেই গোষ্ঠীর মানুষের কাছে ব্যবহার করা বা হত্যা করা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র আদিবাসী নয় এই এলাকার হরিজন ও বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও টোটেম বিশ্বাস বিদ্যমান এবং নাম ও অর্থগতভাবে গোষ্ঠীগুলির মিল রয়েছে। আমরা যদি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুড়মি, ওঁরাও গোত্রগুলি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে কিছু কিছু গোত্র সাধারণ গোত্র হিসেবে সবার মধ্যেই রয়েছে। কচ্ছপ গোত্র সব আদিবাসীদের মধ্যেই রয়েছে। কুড়মিদের কছুয়া, ওঁরাওদের (হোরো), ভূমিজদের "কচ্ছপ" এতদঞ্চলের সমস্ত মানুষের মধ্যেই প্রযোজ্য। সাঁওতালদের হাঁসদা, কুড়মিদের হঁসদোয়ার, মুণ্ডাদের হাঁসদা, সাঁওতালদের টুডু, কুড়মিদের টিডুআর, খাড়িয়াদের টেটে, সাঁওতালদের হেমব্রম, ভূমিজদের হেমব্রম, কুড়মিদের হেমরামিয়া, সাঁওতালদের কয়ড়া ও কুড়মিদের কয়ডোয়ার ইত্যাদি গোত্রগুলি প্রায় সমার্থব্যঞ্জক।

সামাজিক আচরণবিধি : প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীরই নিজস্ব সামাজিক আচরণবিধি রয়েছে। যেগুলি অলিখিতভাবে থাকলেও বংশপরম্পরাগতভাবে সঠিকভাবেই তারা এগুলিকে মেনে চলে। কুড়মি গোষ্ঠীর মধ্যেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত আচরণবিধি বা সংস্কার প্রচলিত আছে সেগুলি আদিম গোষ্ঠীরই পরিচয়জ্ঞাপক।

সামাজিক আচরণবিধির মধ্যে জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহের সংস্কারকে সাধারণত প্রাধান্য দেওয়া হয়। জন্ম সংস্কারে বিবাহিত মহিলারা সন্তান কামনায় করম, জিতিয়া, ভাদু ইত্যাদির ব্রতপালন ও পূজা করে। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য নবম মাসে বাপের বাড়ি থেকে নমাসি পাঠানো হয়। সন্তান জন্মগ্রহণের পর ছদিনে ছটি, নদিনে নারতা, একুশ দিনে একুশা অনুষ্ঠান হয়। সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই ঘরের চাল ঠেঙানো হয়। তিরের ফলা, বাঁশের ছিলা, ঝিনুক ইত্যাদি নাড়িছেদনের জন্য আগে ব্যবহৃত হত এখন ধনুষ্টঙ্কার আদি রোগের কারণে এগুলি বন্ধ করা হয়েছে। সন্তান জন্মের পর থেকে 'নারতা' পর্যন্ত 'জাতাছুইত' বা অশৌচ পালন করা হয়। চুলদাড়ি কামানো, কাপড়চোপড় কাচা ইত্যাদি বন্ধ রাখা হয়। নারতাতে পাড়াপড়শিদের তেল হলুদ বিতরণ, ক্ষৌরকর্ম, ধরম পূজার মানত, সন্তানের নামকরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়।

কুড়মি-মাহাতদের অনেক রকম বিবাহপ্রথা আছে। সেগুলির মধ্যে দেখাশুনা বিহা বা সামাজিক বিয়ে, ভালবাসার বিয়ে বা ঘরঢুকা বিহা, টানাটানি বিহা বা জোর করে বিয়ে, সিঁদুর ঘুঁসা বিহা দ্বিতীয় বিবাহ বা 'সাঁঘা' ইত্যাদি। সামাজিকভাবে বর ও কনেপক্ষ সম্মত হয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানকে দেখাশুনা বিয়ে বলা হয়। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার ফলে মেয়েটি যদি ছেলের বাড়িতে চলে যায় তাকে 'ঘর-ঢুকা' বিহা বলে। কোনো ছেলে যদি জোরকরে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসে তাকে টানাটানি বিহা বলে এবং কোনো ছেলে যদি কোন মেয়ের মাথায় জোর করে সিঁদুর পরিয়ে দেয় তাহলে তাকে 'সিঁদুর ধুসা' বিহা বলে। তাছাড়া কোনো বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তাকে 'সাঁঘা' বলা হয়। কোনো বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে কোন অবিবাহিত পুরুষ বিয়ে করতে চাইলে প্রথমে

তাকে 'কইরা-বিহা' বা কলাগাছকে বিয়ে করতে হয়। এছাড়া দেওর অর্থাৎ স্বামীর ভাই, দাদার মৃত্যুর পর বা অবর্তমানে বৌদি বা দাদার বৌকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই কুড়মিদের বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পর থেকে কেউ কেউ বিয়েতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত (নিম্নশ্রেণীর) নিয়োগ করছে কিন্তু সাধারণভাবে কুড়মিদের বিয়েতে ব্রাহ্মণের অনুপ্রবেশ নেই। বরটানা, কেনিআইটানা, বরদাগা, রেবাইর, আমবিহা, মৌহাবিহা, ছামড়াপূজা, শালাধুতি লুটা, বেহাই বজড়, ঘুরফেইর, থুভড়াভাত, সারুয়া খাজাড়ি, অন্নখাওয়া, লগনবাঁধা, সিঁদরাদান, ঘটিলুকা, জলসহা, শিকার, বাঁদানি, চুমান ইত্যাদি নানারকম অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সামাজিক বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বরের সঙ্গী জামাইকে বরের ঘড়া এবং কনের সঙ্গিনীকে 'লগদিন' বলা হয়। বরের হাতে জাঁতি এবং কনের হাতে কাজললতা থাকে। বিয়ের উপচার হিসেবে হেহল মাটি, ভুসকুঁড়া, আবুয়াচার, দুবঘাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। 'বলহরি হরিবোল' ধ্বনির মধ্যেই বরকনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা বিয়ের গান আছে যা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা গাইতে থাকে। বিয়ের পরে ছামড়াতে মহিলাদের নাচ হয়। বরের মাথায় কোথায় টৌপর কোথাও পাগড়ি ব্যবহৃত হয়।

কুড়মিদের একই গোষ্ঠী বা গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিধবা বিবাহ বা দ্বিতীয় বিবাহ হিসেবে 'সাঁঘা' প্রথা সমাজে স্বীকৃত। সহরই বা বাঁদনা গীতে আছে—

মাএঅ কাঁদত ভালা
জনম জনম রে বাবুহো
বহিনি কাঁদতও ছওঅমাস
তিরিয়া কাঁদতভালা ডেড় পহর রাতি
চলি জাতি দসর দুআর।

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার মা জীবনভর কাঁদবে, বোনেরা ছমাস পর্যন্ত ভাইএর জন্য চোখের জল ফেলবে এবং স্ত্রী (তিরিয়া) মাত্র দেড় প্রহর পর্যন্ত কান্নার পর দ্বিতীয় বিবাহ করে অন্যের ঘরে গিয়ে উঠবে। অর্থাৎ কুড়মি সমাজে স্ত্রীর সহমরণে যাওয়া বা সতী হওয়ার কথা দূরে থাক মাত্র দেড়প্রহর পরেই সে যদি স্বামীর কথা ভুলে গিযে অন্য স্বামী গ্রহণ করে তবু তা দোষের নয়।

এছাড়া, টানাটানি বিহা, ঘরঢুকা বিহা, বা সিঁদুর ঘুঁষা বিয়েতে পরবর্তীকালে বর এবং কনেপক্ষ মেনে নিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান ও কুটুম্ব ভোজনাদির পর সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কুড়মি সমাজে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত নয়। কোনো কুড়মি-মাহাত যুবক অন্য জাতির মেয়েকে বিয়ে করলে তার বিয়ে করা স্ত্রীকে এবং তার ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে স্বীকার করা হয়। তারা আধকুড়মি নামে সমাজে পরিচিত হয়। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও নিষিদ্ধ হয়। কোনো মেয়ে যদি অন্য জাতির ছেলেকে বিয়ে করে তাহলে সমাজ থেকে তার মৃত্যু ঘোষণা করা হয় এবং তার মৃত্যু অনুযায়ী শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম সেরে সামাজিকভাবে তাকে বহিষ্কার বা অস্বীকার করা হয়। কুড়মি সমাজে ভাসুর এবং বুয়াসিন বা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলে স্নান করে দোষ স্খালন করতে হয়।

মৃত্যু সংস্কারে, মুহে আগুন, হাড়ে হরইদ, তেলখইর, পিঁড়দান, কামান খাওয়া, ঘাট-কামা, ঘাটে উঠা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। এইসব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়না। কেবলমাত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে

নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সাম্প্রতিককালে।

পালা-পার্বণ ও ধর্মবিশ্বাসঃ—*পালাপার্বণ ও ধর্মীয় বিশ্বাস* অনুযায়ী কুড়মি মাহাতদের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মতোই প্রকৃতিপূজক (Animist) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এরা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নয়। প্রচলিত দেবদেবীর মধ্যে এরা শিবকে 'বুঢ়া বাবা' হিসেবে পূজো করে। কোথাও শিবমূর্তির পূজা করেনা শিব লিঙ্গের পূজাই প্রচলিত। শিবও অবৈদিক ও অনার্য দেবতা।

ধরম বা সূর্যদেবতা বিশ্বপিতা এবং বসুমতী বা পৃথিবী জগন্মাতা হিসেবে কুড়মিদের দ্বারা পূজিতা হন। সূর্যের দিকে হাত তুলে শপথ নেওয়াকে এরা কঠিনতম শপথ হিসেবে মনে করে। সন্তান সন্ততি জন্মের পরে নারতা বা একশায় পায়ে ধর্মের বেড়ি পরানো হয় এবং বিয়ের আগে ধর্মপূজা অবশ্য কতর্ব্য হিসেবে পালিত হয়। এই ধর্মপূজায় গোষ্ঠীর সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। কৃষিজীবী কুড়মিরা ধরিত্রী মাতাকে মাতৃরূপে কল্পনা করে অম্বুবাচি বা রজঃস্বলায় হলকর্ষণ করে না। পরিবারের মহিলারা সূর্য ওঠার আগে গোবর ছড়া দিয়ে প্রতিটি দুয়ারে গোবরের 'মাড়লি' দেয়, এই 'মাড়লি' সূর্যের প্রতিক বা প্রতিকৃতি। অর্থাৎ প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে মহিলারা ঘরের দুয়ারে সূর্যের প্রতিকৃতি এঁকে সূর্যকে আহ্বান জানায় এবং সূর্যাস্তের সন্ধ্যাপ্রদীপ হতে সূর্যকে বিদায় জানায়।

অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে গ্রামের প্রধান দেবতা গরাম থান, জাহিরা বুঢ়ি, ভানসিং, গসাঁইরায়, বড় পাহাড়, পাঁচবহনী, সাতবহনী, দুয়ারসিনি, ঘাটসিনি, বড়াসিনি, রংকিনী, ঝংকিনি, কালাহাড়ি, রাঙাহাড়ি, চঁড়ি, বিসাইচঁড়ি, কুদর, বাঘুত, বিষহরি, ডিনি, করমরাজা, ইঁদ, ছাতা, জিতিআ, জিলসুর, ভাদু, টুসু, মাহামাঞ ইত্যাদি দেবদেবীকে কুড়মি মাহাতরা পূজা করে। 'লায়া' বা 'সাহান' পুরোহিতের কাজ করে। এই লায়া কোথাও কুড়মি কোথাও রাজেয়াড়, ঘাটোয়াল, সিংসর্দার ইত্যাদি আদিবাসী বা হরিজনদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে। ডোমরাই ধর্মঠাকুরের পুরোহিত।

দুধ, ঘি, গুড়, তেল, সিঁদুর, আতবচাল, দূর্বাঘাস, বেলপাতা, টগরফুল এগুলিই পূজার উপকরণ। পাঁঠা, পাঁঠি, ভেড়া, অঢ়াইর, শূকর, মোরগ, কাটুল, হাঁস, পায়রা ইত্যাদি বলি দিয়ে পূজা সম্পন্ন হয়। ধানরোয়া বা ধানকাটার আগে প্রতিটি গ্রামে গরামপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কুড়মিদের বিশ্বাস ধানরোয়া ও ধানকাটার আগে জাহির গরাম, গঁসাই, ভানসিং থানে পাঁঠা, ভেড়া ইত্যাদি বলিদানের ফলে সেই জীবাত্মা দেবতার কাছে পৌঁছে যায় এবং দেবতা বুঝতে পারেন কীজন্য বলি দেওয়া হয়েছে। এরফলে ধান রোয়ার পরে যাতে সুবৃষ্টি হয় এবং ধানকাটার পরে অকাল বৃষ্টিতে যাতে ফসলের ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে দেবতা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

কৃষিজীবী জাতি হিসেবে সূর্যের উত্তরায়ণকে কেন্দ্র করে 'আর্যাহন-জাতরা' এবং ১লা মাঘকে কৃষি বৎসরের প্রথমদিন হিসেবে মেনে 'হারপুনহা' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম লাঙল দেওয়া সম্পন্ন করে। রহিনে বীজবপনের সূচনা এবং অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ডিনি অর্থে লক্ষ্মী বা লক্ষ্যের দেবীকে ঘরে এনে টুসু উৎসবের মধ্য দিয়ে বছর শেষ হয়।

১লা মাঘ আনুষ্ঠানিক হলকর্ষণের পর জাহির, গরাম, গঁসাইরাই, ভানসিং থানে, বলিদান, ভাওমেলা, খুখড়া উড়া, ভেড়া উড়া এবং বেঝাধিকার অনুষ্ঠান। বন-জঙ্গলে বসবাসকারীদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার ছিল তির-ধুনক। এই তিরন্দাজী বিদ্যা উৎসাহদানের জন্য গ্রামে একটি জমি চিহ্নিত থাকত। যে ব্যক্তি তির ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তুকে সঠিকভাবে বিদ্ধ করতে পারত তাকে উক্ত জমি সেই বছরের জন্য পুরস্কার দেওয়া হত। এই তিরন্দাজ অনুষ্ঠানকে বেঝাবিঁধা বলা হয়। এরপর সিঝান পরব, কুঁঢ়াপরব, চৈত সাঁকরাইত থেকে শিবগাজন উপলক্ষে মেলা।

ভগতাঘুরা, ভগতা নাচ, কাপঝাঁপ, ছোনাচ, নাচনী নাচ, মাছানি গ্রামে গ্রামে চলতে থাকে আষাঢ়ের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের বারোদিনে বারনি তেরো দিনে রহনি চাষ শুরুর আগে গরাম পূজা। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা, জাঁত গান। চাষের কাজ শেষ হতেই শুরু হয় মেয়েদের করম নাচ গান, জাওয়া পাতানো। করম রাজার ব্রত উদযাপন, ছেল্যা পরব। ভাদ্রমাসের পার্শ্ব একাদশীতে করম ব্রতের পর থেকে শুরু হয় করম নাচ বা পাঁতানাচের আসর। ইঁদমেলা, ছাতামেলা, ভাদুপরব, জিতা পরব, জিলপুর, সহরই বাঁদনা উপলক্ষে অহিরা। কাঁড়া খুঁটা, গরু খুঁটা, দাদুড় খেদা। তারপর পৌষের ১ম দিন থেকে টুসু পাতানো, টুসু গান। আঁওড়ি, বাঁউড়ি, চাঁউড়িতে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম শেষে পৌষ সংক্রান্তিতে চৌড়ল বিসর্জন ও টুসু মেলা।

এগুলিকে কুড়মি-মাহাতরা নিজস্ব পালাপার্বণ মনে করে। প্রত্যক্ষভাবে ও ব্যাপক অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে হিন্দু ঘেঁষা বা মানসিক দিক থেকে হিন্দু আচার-আচরণ পূজা-পার্বণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, কালিপূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, রাস উৎসবে মানতকারী, ব্রতচারী ও দর্শক হিসেবে অংশগ্রহণ করে। দেবদেবীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আশীবাদ প্রার্থনা করে। বৃষ্টি না হলে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করে।

মূর্তিপূজার মধ্যে মনসা ও ভাদু পূজার চল হয়েছে এবং বর্তমানে স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা সরস্বতী মূর্তির পূজায় ব্যাপকভাবেই অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে— "মথুরা যাবার কালে আসি ঝাড়িখণ্ড
ভিল্লা প্রায় লোকতাহে পরম পাষণ্ড।"

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব যখন নদীয়া থেকে মথুরায় যান, ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে যান এবং এখানকার আদিবাসীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু মথুরা থেকে ফেরার সময় চিত্রটি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।

"ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর জঙ্গল আছে যত
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।"

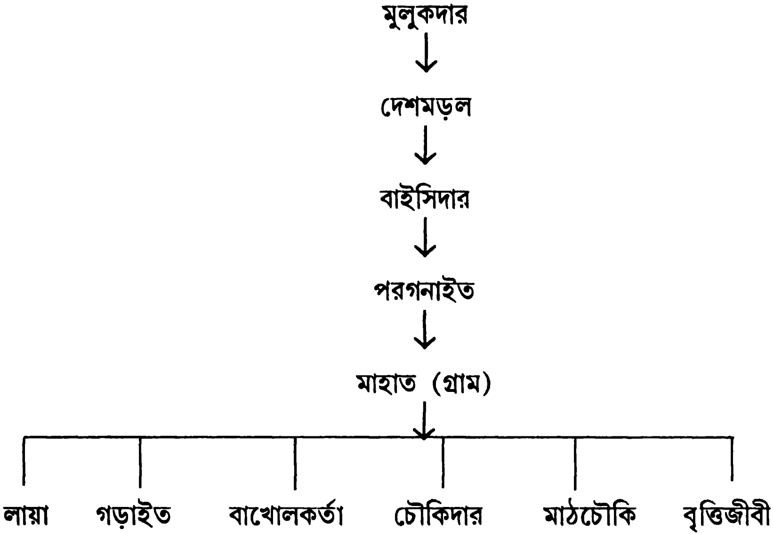
অর্থাৎ এখানকার আদিবাসীরা শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কুড়মি-মাহাতরা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গ্রামে গ্রামে নামকীর্তনের দল গড়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন এই সময় থেকেই কুড়মি পরিবারগুলিতে তুলসী মঞ্চ স্থাপিত হয়। এখনও প্রতিটি কুড়মি গ্রামেই একাধিক নামকীর্তনের দল রয়েছে এবং কুড়মিদের কান ফুঁকা গুরু গোঁসা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। এই বৈষ্ণব ধর্মের মধ্য দিয়েই মহাভারতের মনোরম কাহিনির মাধ্যমে, রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার অন্বেষণে লিপ্ত হয়। নবাব আমলে আদিবাসী হরিজনদের ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণ ঠেকাতেই শ্রীচৈতন্যদেবের আচণ্ডালে প্রেমদানের কথা বলেছিলেন। কারণ ওই সময়ে হিন্দু ধর্মের মধ্যে উৎকট পুরোহিত তন্ত্র, গোঁড়ামি, কুসংস্কার চরম জাতিবিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল। হিন্দুধর্মকে সর্বজনপ্রিয় করার জন্য তিনি 'আচণ্ডালে প্রেমদান' করার কথা বলেছিলেন।

ইংরেজ আমলে খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ভারতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীগুলিকে রক্ষা করার জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের নীতি অনুসরণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি, "হে ভারত ভুলিওনা, মুর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই.......।"

সুতরাং আদিবাসী হরিজন সম্প্রদায়গুলি ছিল হিন্দু ধর্মগুরুদেরও লক্ষ্যবস্তু এবং কুড়মি মাহাতদেরকে হিন্দুত্বের স্বপক্ষে টানার জন্য বালক ব্রহ্মচারী, অনুকূল ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, বাল যোগেশ্বর, রামকৃষ্ণ মিশন, চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদি ধর্মীয়

সংগঠনগুলিও যথেষ্ট সক্রিয়। এতৎসত্ত্বেও কুড়মি মাহাতরা এদের পরনো আচার আচরণগুলিকে বিসর্জন দিতে পারেনি এবং এদের আদিমতার চিহ্নগুলি এখনও মুছে যায়নি।

শাসনব্যবস্থা :— প্রতিটি আদিম জনজাতির মতোই কুড়মি মাহাতদেরও একটি প্রজাতান্ত্রিক শাসন কাঠামো ছিল। এই সামাজিক কাঠামোর ভূমি ছিল পরিবার। পরিবারের পরিচালক কর্তা। কয়েকটি পরিবার নিয়ে 'বাখোল' এবং কয়েকটি বাখোল নিয়ে ভাই-ভয়াদ বা গোষ্ঠী। কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গ্রাম সমাজ। গ্রাম সমাজের সবার উপরে 'মাহাত' বা মোড়ল। 'মাহাত'দের পরগনা ব্যাপী সংগঠনের কর্তা 'পরগনইত'। কয়েকটি পরগনা নিয়ে 'বাইসি'। কয়েকটি বাইসি নিয়ে 'দেশ'। কয়েকটি দেশ নিয়ে মুলুক। বাইসির কর্তাকে বাইসিরদার এবং 'দেশ' বর্তাকে 'দেশমণ্ডল' বা 'দেশ মড়ল' এবং মুলুকের অধিকর্তাকে 'মুলুকদার' বলা হত।



দেশমণ্ডলদের দেশব্যাপী সংগঠনকে মুলকি-সংগঠন বলা হত। সেখান থেকেই তৈরি হত বিভিন্ন সামাজিক আইন এবং অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মতোই গোষ্ঠীপ্রধানরাই সামাজিক বিধান অনুযায়ী সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির বিচার করতেন। গোহত্যা বা অন্য কোনো অপরাধের বিচারের পর দোষী ব্যক্তি সামাজিক বিধান অনুযায়ী কুটুম্ব ভোজনের ব্যবস্থা করলে 'পটলই' প্রথম অন্ন ভক্ষণ করে তাকে পাপমুক্ত করতেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মোতাবেক আদিম গণ-সংগঠনগুলিকে যেনতেন প্রকারেণ, শাম, দাস, দণ্ড, ভেদ প্রয়োগ করে ভেঙে ফেলার একটি সুন্দর পরিকল্পনা ছিল এবং অনেক আদিম গণসংগঠনই এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ফলে একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যার পরিণাম স্বরূপ আদিবাসী সমাজের একাংশ ভেঙে তৈরি হয়েছে হরিজন সমাজ। যারা তাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু বিস্মৃত হয়ে দলিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। কুড়মি-মাহাতদের সামাজিক প্রশাসন যথেষ্ট যুগোপযোগী প্রগতিশীলতা অর্জন করতে না পারায় এবং কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি অনেকাংশে বিনষ্ট হওয়ার ফলে কুড়মিদের সামাজিক কাঠামো গ্রামপ্রধান থেকে শুরু করে মুলকি সংগঠন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। সকলেরই 'মাহাত' পদবি গ্রহণের ফলে সামাজিক কর্তাব্যক্তিদের খুঁজে পেতে এখন অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন। তবে বিশাল জনসংখ্যার দরুণ,

ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়, ব্যবস্থার পরিকাঠামো কোথাও কোথাও অবিকৃত রয়েছে। জন্ম মৃত্যু, বিবাহের রীতিনীতি অলিখিতভাবে থাকলেও কিছুটা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই কার্যকরী রয়েছে।

কুড়মালি প্রবাদ আছে, "জাইতকে জাইত বাদি কাড়াক বাদি কওথা।" অর্থাৎ কুড়মিদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে জাতিবিদ্বেষও প্রবল। কোনো গ্রামে যারা বনজঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে বলা হয় "খুঁটা গাড়ল বসকইতা" বা 'বন্যাদি'। সমাজে তাদের আলাদা সম্মান ছিল। ঘর-ঘরনা আত্মীয়তার ক্ষেত্রে এটাই ছিল নির্বাচনের মাপকাঠি। যারা সুযোগ সন্ধানী, পরস্বাপহারী, দৌহিত্র সম্পত্তি বা অনুকম্পার দান ভোগ করার জন্য পৈতিক ভিটেমাটি ত্যাগ করে শ্বশুর বা অন্যের জমিতে বাস করে তাদের বলা হয় "কাঁধে মুধন্যা" বা "উড়্যা ধুড়্যা মধুপুর্যা।" সমাজে এরা অলগপুই বা শেকড়হীন গাছ হিসেবে নিন্দিত হত। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে এদের কোনো সম্মান ছিল না।

সামাজিক সংগঠন বিঘ্নিত হওয়া, নতুন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কুড়মি সমাজে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বজাতি প্রীতি, কৃতজ্ঞতাবোধ, শিষ্টাচার ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক গুণাবলী দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে এবং প্রাচীন সমাজব্যবস্থা অবলুপ্ত হতে চলেছে।

ভাষা ও সাহিত্য : ভারতীয় আর্য জাতিগুলির কারুরই নিজস্ব ভাষা নেই। বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি ভাষাগুলিতে কোনো জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব মালিকানা নেই। এগুলি আঞ্চলিক বা স্থানবাদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য নিজস্ব গোষ্ঠী ভাষা বিদ্যমান। যেমন সাঁওতালদের সাঁওতালী, মুণ্ডাদের মুণ্ডারী, ওঁরাওদের কুড়ুখ, খাড়িয়াদের খাড়িয়া ইত্যাদি।

কুড়মিদের 'কুড়মালি ভাষা' এদের আদিবাসী চিহ্নগুলির অন্যতম। তামড়িয়া, নাগপুরিয়া, খোরঠা, পাঁচ পরগণিয়া, মানভুঞা, গোলওয়ারী, সিলিয়ারী, ঝেলদুয়ারী, খাস পালিয়া ইত্যাদি ভাষাগুলি কুড়মালি ভাষারই স্থানবাচী নাম। কেউ কেউ বলেন "সাতকোশে পানি" এবং "তিনকোশে বাণীর" আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রতি সাত ক্রোশ অন্তর অন্তর আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং প্রতি তিনক্রোশ অন্তর ভাষার মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কুড়মালি ভাষারও এলাকাভিত্তিক কিছু আলাদ আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

কৃষিজীবী হিসেবে কুড়মিরা একসময় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ধারকে পরিণত হয়েছিল। ফলে বৃত্তিজীবী, ক্ষেতমজুর, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও কুড়মালি ভাষার প্রসার ঘটেছিল এবং কুড়মালি এতদঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যম বা লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখনও পুরুলিয়া শহর থেকে রাঁচি, ধানবাদ, হাজারিবাগ ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকায় সর্বসাধারণের কথ্যভাষা হিসেবে কুড়মালি ব্যবহৃত হয়। পুরুলিয়া জেলায় ঝালদা, জয়পুর, আড়ষা, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া, পাড়া, চেলিয়ামা ইত্যাদি এলাকায় অবস্থিত কুড়মালি কথিত হয়। হুড়া, পুঞ্চা, মানবাজার, কাশীপুর, বরাবাজার, বান্দোয়ান, বলরামপুর ইত্যাদি এলাকায় বাংলা প্রভাবিত কুড়মালি কথিত হয়। তবে কুড়মালি ভাষি এলাকা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) উড়িষ্যার বিভক্ত থাকার ফলে কুড়মালিভাষি বাংলা, উড়িয়া ও হিন্দী মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ফলে বাংলা, হিন্দি, উড়িয়াতে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং এখনকার ছেলেমেয়েরা কুড়মালি ভাষায় কথা বলতে আগ্রহী নয়। পুরুলিয়া জেলাতেও কুড়মালি ভাষার চল কমে আসছে।

কিন্তু আশার কথা ঝাড়খণ্ডের রাঁচি ও হাজারিবাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠন

শুরু হয়েছে। আই. এ., বি. এ., ও এম. এ. কোর্সে কুড়মালিতে পাঠ্যক্রম চালু হওয়ার ফলে কুড়মালি ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও কুড়মালি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্যে ডঃ মনোরমা মাহাত, ডঃ আদিকান্ত মোহান্ত, ডঃ পরমেশ্বরী প্রসাদ মাইতি ইত্যাদি বেশকিছু কৃতী ছাত্রছাত্রী পি. এইচ. ডি. লাভ করেছেন।

এ পর্যন্ত কুড়মালি সাহিত্য অলিখিত বা শ্রুতি হিসেবে প্রচলিত ছিল। কুড়মালি শ্রুতি সাহিত্যের মধ্যে মাহরাই, জাঁত, করমগীত, সহরই গীত, টুসুগীত, ভাদৃগীত, বিহাগীত, মন্ত্র সাহিত্য, ঝুমুর, ভাদরিয়া, চৈতালী, কবি, উধওয়া, মলহরিয়া, ঢপ, ঢুয়া, বাউল গীত, জানকেহনী, প্রবাদ, রাসধারী, কপিলামঙ্গল, মনসামঙ্গল, বুলবুলি, ছড়া ইত্যাদি কাব্য সাহিত্য এবং কেহনী, মাছানি ইত্যাদি গদ্য ও নাট্যসাহিত্যের বিশালভাণ্ডার বিদ্যমান।

রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি পাঠ্যক্রম চালু হওয়ার পরে এগুলি কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কিছু কিছু আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসও শুরু হয়েছে। যদিও বেশিরভাগ রচনার মান ততটা উন্নত নয়। কুড়মালি লেখক ও কবিদের মধ্যে কিছ প্রতিভাবান ব্যক্তি আছেন যাদের মৌলিক রচনা ভবিষ্যৎ কুড়মালি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। পুরুলিয়া জেলার জারগো হাই স্কুলের শিক্ষক আনন্দ খুঁটদার-এর গল্প ও উপন্যাসগুলি কুড়মালি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তুলিনের বাসিন্দা কবি অনন্ত কেশরিয়ার কুড়মালি কবিতাও উল্লেখযোগ্য। গড়জয়পুর স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীপদ্মলোচন মাহাত স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ কুড়মালি একাডেমি। কুড়মালি স্কুল বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর লিখিত কুড়মালি ব্যাকরণ মৌলিকতার দাবি রাখে। 'মানভূম এক্সপ্রেস' সম্পাদক ভগবানদাস মাহাত ঝালদা থেকে প্রকাশিত প্রথম কুড়মালি সংবাদ পাক্ষিক, এছাড়া 'আনার-বানার'—সম্পাদক সুনীল মুতরুআর পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কুড়মালি সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা একসময় 'সারনুল' পত্রিকায় (সম্পাদক, সুনীল মাহাত) প্রকাশিত কুড়মালি গল্প-কবিতা পুরুলিয়া জেলায় সাড়া জাগিয়েছিল। কুড়মালি, টওআ, বানার ইত্যাদি কুড়মালি মাসিক পত্রিকাগুলি টিকে থাকতে পারেনি। হীরালাল সাঁখোয়ারের 'বিনোদ ডহর' একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। পুরুলিয়ার কবি সুনীল মাহাতর কাব্যগ্রন্থ, 'করম-কথা' কুড়মালিতে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গল্প সংকলন 'সাতুল' (সুনীল মাহাত ও অনন্ত কেশরিয়ার সম্পাদিত) রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. কোর্সে পঠিত হচ্ছে। 'করম-কাথা'ও বি.এ. কোর্সে' পঠিত হচ্ছে। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় তথা কুড়মালি আধুনিক সাহিত্যসৃজনের ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলার কুড়মালি সাহিত্যিক ও কবি সুনীল মাহাত, আনন্দ খুঁটদার, অনন্ত কেশরিয়ার, কেশব মাহাত, পদ্মলোচন মাহাত, শশাংক মাহাত ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতর 'Sanskritaization vs Nirbakaization' কুড়মি-মাহাতদের বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ।

কুড়মালি লোকসংগীত : জাঁতগান, কবি, করম বা জাওয়াগীত, ভাদরিয়া পাঁতানাচের গান, ভাদুগীত, সহরই বা বাঁদনাগীত, মলহরিয়া, টুসুগীত, চৈতালি, উধওয়া, বিহাগীত ও প্রাচীন কুড়মালি ঝুমুরে প্রভৃত সুর ও তালবৈচিত্র্য এবং কাব্য-সাহিত্যের চূড়ান্ত প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। কবি বিনন্দিয়া সিংকে কুড়মালি মহাকবি বলা হয়। এছাড়া সৃষ্টিধর সিং কাটিআর, ভবপ্রিতানন্দ ওঝা, হাড়িরাম, অমৃতা সহিস, গিরীশ মহান্ত, রামকুমার মাহাত, সন্তোষ মাহাত এবং সুনীল মাহাত কুড়মালি সংগীতে উল্লেখযোগ্য সৃজনক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন।

প্রাচীন কুড়মালি ঝুমুরে বিরহ, ছোয়াড়ি, বুরুটাঁড়, মুদিয়ালি, গোলোয়ারি, তামড়িয়া, ফুলওয়াড়ি, পাটিয়ামেধা, আওখেমটা, খেমটা, নাগপুরিয়া, পতরতুলা, ডহরওয়া, চৈতালি, উধওআ, কবি, ডমকচ, ঝুমকা, ঝুমটা বিভিন্ন প্রকারের সুর ও তাল পরিলক্ষিত হয়। বিয়ের গান, টুসু, ভাদু, অহিরা গান, জাঁত গানেও সুর-তাল-ছন্দের বিচিত্র সমাহার।

পরবর্তীকালে দরবারি ঝুমুরে প্রচুর বাংলাভাষি কবি অংশগ্রহণ করেন। কীর্তন ও শাস্ত্রীয় সংগীতের মিশ্রণে কাব্য ও সুরের ক্ষেত্রে তথা বিষয়বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে দরবারি বা নাচনিশালিয়া ঝুমুরে বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ঝুমুরের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। ওই সময়েই সৃষ্টিধর সিং কাটিয়ার, বিনন্দিয়া সিং, ভবপ্রিতানন্দ ওঝা, অমৃতা সহিস, হাড়িরাম, দ্বিজধিনা, নরোত্তম দাস ইত্যাদি অনেক কবি কুড়মালি ভাষায় অনেক রসোত্তীর্ণ ঝুমুর রচনা করেন। এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং কুড়মালি ভাষায় প্রচুর ঝুমুর, বিয়ের গান ইত্যাদি রচিত হচ্ছে।

কুড়মালি লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে ড. বীণাপানি মাহাত, অঞ্জুলী মাহাত (জামসেদপুর) বিজয় মাহাত, লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, ইন্দ্রাণী মাহাত, মঞ্জুলা মাহাত (ঝাড়গ্রাম), গৌরীনাথ মাহাত, জগন্নাথ মাহাত (বোকারো), সদানন্দ মাহাত, ভোলানাথ মাহাত, গান্ধীরাম মাহাত, সলাবৎ মাহাত, (লালন পুরস্কারপ্রাপ্ত) দুঃশাসন মাহাত, বিরোচন মাহাত, অজমত মাহাত, বিহারীলাল মাহাত, কুচিল মুখার্জি মিহিরলাল সিংদেও (পুরুলিয়া), সুনীলবরণ মাহাত, সুধারানি মাহাত (বাঁকুড়া) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। নাচনি শিল্পীদের মধ্যে মালাবতী, বুটনদেবী, সরস্বতী, পস্তুবালা, পার্বতী, জ্যোৎস্নাদেবী, সন্ধ্যারানি উল্লেখযোগ্য।

কুড়মালি নৃত্যকলা : অনেক বিশেষজ্ঞের মতে গোষ্ঠীনৃত্য করম নাচ থেকেই এতদঞ্চলের নৃত্যকলার বিকাশ ঘটেছে। কুড়মি-মাহাতদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের আগে পর্যন্ত কৌমনৃত্য বা গোষ্ঠীনৃত্য হিসেবে করম নাচ বা পাঁতা নাচ প্রচলিত ছিল। যাতে পুরুষেরা গায়ক-বাদক এবং মহিলারা নাচে অংশগ্রহণ করত। অজস্র করমগীত কুড়মালি লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যেগুলি এখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। এই করম বা পাঁতা নাচের গানগুলির অধিকাংশ মহিলাদের দ্বারা রচিত। পাঁতা নাচের বিভিন্ন সুর-তালকে ভিত্তি করেই দরবারি ঝুমুর, নাচনি নাচ, বাঈ নাচ ইত্যাদির বিকাশ ঘটেছে। ছো-নাচেও এই সুর-তালগুলি ব্যবহৃত হয়। ছো-নাচেও কুড়মিদের অংশগ্রহণ-পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য। পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেপাল মাহাতও ছো-শিল্পী হিসেবে 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করেছেন। এছাড়া কালিপদ মাহাত, লাল মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাত, অনিল মাহাত, হেম মাহাত, আদালত মাহাত, সতীশ মাহাত, ডি. সি. মাহাত, ললিত মাহাত, সুধীর মাহাত, রামপদ সিং মাহাত ইত্যাদি অজস্র কুড়মি-মাহাত ছো-শিল্পী ছো-নাচকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাচনি নাচে চেপা মাহাত, বাউরিবন্ধু মাহাত, বিভূতি মাহাত, উচিত মাহাত অতুল মাহাতরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। ছো-নাচ পৃথিবীবিখ্যাত হয়েছে। নাচনি নাচ, সীতা নাচ, টুসু নাচ, নাটুয়া নাচ, ঘোড়া নাচ, পাইক নাচ, কাঠি নাচ ইত্যাদিরও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

কুড়মালি নাট্যকলা : মাছানি, বুলবুলি, রাসধারী ইত্যাদি কুড়মালি লোকনাট্য প্রায় অবলুপ্তির পথে। আধুনিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে গজাধর মাহাত, গৌরীনাথ মাহাত, পার্বতীচরণ মাহাত, ললিত মাহাত, সহদেব মাহাত, সুনীল মাহাত, বিভূতিভূষণ মাহাত, অনন্ত কেশরিআর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের কিছু সফল প্রয়াস দেখা গেলেও কুড়মালি নাট্যকলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম নেই।

কারিগরি ও শিল্পকলা : বাড়িঘর তৈরি, গ্রাম নির্মাণ পদ্ধতি, দরজা-জানালা, হাল-জোয়াল, গরুর গাড়ির চাকা, শষ্যাধার কুঁচড়ি, ডোল, মরাই, মুরি, পুকুর তৈরি, জমি তৈরি, জলসেচ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে এদের উন্নত কারিগরি বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু লোকশিল্প বা চিত্রকলার ক্ষেত্রে বাড়িতে দেয়ালচিত্র, কাঠের দরজা-জানালায় কারুকার্য, আল্পনা ইত্যাদির তেমন কোনো বিকাশ ঘটেনি।

অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বা হরিজন বৃত্তিজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক :

ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাত তাঁর 'Sanskritization Vs Nirbakaization' গ্রন্থে বলেছেন, "The Kudmi Mahatos for a considerable period of time made a social interaction in relation to agricultural technology, food habits, specialization in identification of paddy manure and cattle with other neighbouring tribals like Munda, Santhal, Kharia, Paharia, Ho, Oraon, Lodha, Kora-Mudi and others, formed a common social civilization in entire Jharkhand cultural region. It may be known as 'Hor-mitan' or Kherwal social civilization. The friendship bondage is so powerful that still Santhal women take cooked food in the Kudmi Mahatos houses and they believe that if a Santhal boy marries Kudmi girl then all the bongas (Deities) dance with joy."

কেদার মাহাত বলেছেন, "খুব সাম্প্রতিক অতীতেও অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছেই ব্রাহ্মণরা অচ্ছুৎ হিসেবে বিবেচিত হতেন। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে যখন সমগ্র ছোটনাগপুর এলাকা বিপর্যস্ত ব্রিটিশ সরকার স্থাপিত লঙ্গরখানায় কুড়মি-মাহাত এবং সাঁওতালেরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা রান্না করা খাবার খেতে অস্বীকার করে।"

কুড়মি জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় কুড়মিদের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবাদ প্রচলিত আছে সেগুলি যথার্থভাবেই প্রযোজ্য। এই প্রবাদ-প্রবচনগুলির কয়েকটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। (১) ঢঁড় কুড়মি (২) কুড়মিঞ অরজত চিনি খাত পানি (৩) কুড়মিক পেছুবাধে বুইধ (৪) ঢেরকাঠে মোহা মিঝেই ঢের কাথাঞ কুড়মি বুঝেই (৫) জেঁদে জেঁদে পানিক সত তেঁদে তেঁদে কুড়মিক জট (৬) কুড়মি হেকত্ খাই জাতা (৭) কল কুড়মি কড়া বেদ সাসতর ছাড়া (৮) ধইনরে কুড়মিনেক জিউ একসের পুনে তিনসের ঘিউ (৯) সান্তাল কুড়মি মমিয়ত ভাই।

প্রথম প্রবাদটিতে 'ঢঁড়' অর্থে জল ঢোঁড়া নির্বিষ সাপের সঙ্গে কুড়মিদের তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে কুড়মিরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চিনি ফলায় কিন্তু খাবার বেলায় পানি অর্থে ফ্যানভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে। তৃতীয়টিতে কুড়মিদের নির্বুদ্ধিতার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কোনো ঘটনা ঘটবার অনেক পরে কুড়মিরা সেটা অনুধাবন করতে পারে। চতুর্থ প্রবাদে বলা হয়েছে অনেক কাঠে মহুল সেদ্ধ হয় তেমনি অনেক কথা বলার পর কুড়মিরা বুঝতে পারে। পঞ্চম প্রবাদে বলা হয়েছে যেখানে যেখানে জলের আধার বা স্রোত সেখানে কৃষিজীবী কুড়মিরা বসবাস করে। ষষ্ঠটিতে কুড়মিরা খুব সাধারণ খাবারও এরা সন্তুষ্টচিত্তে খেয়ে যায়। সপ্তমটিতে কোল, কোড়া ইত্যাদি আদিবাসীদের সঙ্গে কুড়মিদেরকেও বেদবহির্ভূত জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টম প্রবাদটিতে একটি কুড়মি মহিলার সারল্যের কথা বলা হয়েছে। বাজারদর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এই মহিলা এক সের নুনের বিনিময়ে অবলীলাক্রমে তিনসের ঘি দিয়ে দিয়েছে এবং নবম

প্রবাদটিতে কুড়মি ও সাঁওতাল জাতিকে পরস্পরের মাসতুতো ভাই বলা হয়েছে।

এই সমস্ত প্রবাদগুলি বিশ্লেষণ করলে কুড়মিদের সঙ্গে আদিবাসী বা হরিজন সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে যাই সম্পর্ক থাকুক না কেন শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক যে ছিল না একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কাশীপুরের শ্যামাপদ মাণ্ডি বলেছিলেন, কোনো এক কুড়মি মাহাত রমণীকে সাঁওতালরা দেবীজ্ঞানে পূজো করে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত কুড়মি রমণীকে হয়তো বা সাঁওতালরা রক্ষা করেছিলেন নয়তো বা ওই কুড়মি রমণীই বিপর্যয়ের হাত থেকে সাঁওতালদের রক্ষা করেছিলেন।

রঘুনাথ সিং মাহাত, বুলি মাহাত, দামুদর দিগার, গোপাল মাঝি ইত্যাদি ব্যক্তিগণ কুড়মি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং এরা চুয়াড় বিদ্রোহে অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহে বড়হেট এলাকায় চান্কু মাহাত নামক কুড়মি যুবক ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে শহিদ হন। গোড্ডা এবং পাকুড় এলাকায় লোকসংগীতে এখনও চান্কু মাহাতর বীরত্বের কথা স্মরণ করা হয়। এতদঞ্চলের প্রতিটি আন্দোলনে কুড়মি-মাহাতরা অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে সমানতালে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু সবসময় আলাদাভাবে তাদের চিহ্নিত করা যায়নি।

কুড়মি-মাহাতরা উন্নততর কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ১৮৯২-৯৩ সালে ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও পঞ্চকোটরাও নীলমণি সিংদেও-এর কাছ থেকে বেশ কিছু কুড়মি কৃষককে যৌতুক প্রজা হিসেবে নিয়ে যান মহারানির জন্য ভালো চাল উৎপাদনের জন্য। এই সুদক্ষ কৃষকদের জন্য মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও লাখেরাজ সম্পত্তি বা নিষ্কর সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন। তাই কৃষিজীবী কুড়মি-মাহাতদের সঙ্গে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য আদিবাসী বৃত্তিজীবী, হরিজন ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীগুলির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা আজও অটুট রয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুলিয়ার কুড়মি-মাহাতদের ভূমিকা :

একসময় ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায় স্বাধীনতা আন্দোলন সহিংস ও অহিংস দুই শাখাতেই ছড়িয়ে পড়ে। পুরুলিয়া জেলাতেও তার ঢেউ আছড়ে পড়ে এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচি, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, শরীরচর্চা কেন্দ্র, লাঠিখেলার আখড়া ইত্যাদির আড়ালে ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ব্যাপক গণআন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে থাকে।

পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় এরকমই একটি লাঠিখেলার আখড়ার আড়ালে জনগণকে সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন সত্যকিঙ্কর দত্ত। ১৯২৯ সালে ১০ ডিসেম্বর ঝালদা শহরে গুপ্তঘাতকদের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন। বিষাক্ত তির এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৯ পুরুলিয়া হাসপাতালে মারা যান।

খবরটি ঝালদা এলাকায় দাবালনের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় সত্যকিঙ্কর দত্তর মৃতদেহ ঝালদা শহরে আনা হলে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এবং জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় জড়ো হন তাঁদের প্রিয় নেতাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য। চোখের জলে তাঁরা তাঁদের প্রিয় নেতাকে বিদায় জানান।

পরের বছর ১৯৩০ সালের ১৫ জানুয়ারি সত্যকিঙ্কর দত্তর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সত্যমেলা নামক এই স্মরণসভাকে বেআইনি ঘোষণা করে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হাজারে হাজারে জনতা সত্যমেলায় জমায়েত হয়। পুলিশ জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। সত্যমেলা সংগঠকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় যুবক

গণেশ মাহাত (গ্রাম—চিরুগোড়া), শীতল মাহাত (গ্রাম—চাতমঘুটু), গোকুল মাহাত (গ্রাম—নতুনডি) সহদেব মাহাত ও মোহন মাহাত (গ্রাম—সারাম্বা) পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

হরি মাহাত, শিবচরণলাল জয়সোয়াল, গোপীনাথ মাহাত, বিহারী চট্টোপাধ্যায়, মোহনদাস বাবাজি, হারাধন মাহাত, ছুট্টু মাহাত, মণিরাম মাহাত, মণীন্দ্রনাথ মুখার্জি, সদানন্দ মুখার্জি, ভানু দাস, যুগল মাহাত, কমল মাহাত, কণ্ঠিরাম মাহাত, প্রহ্লাদ মাহাত, রমণীকান্ত মাহাত, মতনু মাহাত, বৃন্দাবন মাহাত, ঘনশ্যাম মাহাত, মহেশ্বর মাহাত, হলধর মাহাত, বুধুরাম মাহাত গ্রেপ্তার হন। এঁদের উপর প্রচণ্ড পুলিশি অত্যাচার হয় এবং এঁদের সঙ্গে আরও চারশো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৪২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কংগ্রেস কর্মীরা মানবাজার থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। তার আগের দিন ২৯ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র মাহাতর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীরা বোরোগ্রামের মদভাটি তছনছ করে দেয়। খড়িদুয়ারা তহশিলদার অফিসেও তারা আক্রমণ চালায়। সেজন্য পুলিশ অত্যন্ত সতর্ক ছিল। পরদিন সত্যাগ্রহীরা চেপুয়া গ্রামে জড়ো হন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য মানবাজারে পৌঁছালে দারোগা ভগবান সহায়ের আদেশে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। ব্রিটিশ পুলিশেরগুলিতে কুদাগ্রামের চুনারাম মাহাত এবং নাথুরডি গ্রামের গোবিন্দ মাহাত শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

গিরীশ মাহাত, বলরাম মাহাত, হেমচন্দ্র মাহাত, বিষ্ণুপদ মাহাত, চুনারাম মাহাত (বামনি), চুনারাম মাহাত (নাথুরডি), জীতেন মাহাত (বামনি), মকর মাহাত (কুড়মাশোল), মানগোবিন্দ মাহাত, যতীন্দ্রনাত মাহাত, অবিনাশ মাহাত (সিজাডি) এবং আরো অনেকেই গুরুতর আহত হন। আন্দোলনের নেতা সত্যকিঙ্কর মাহাত আহতদের জল দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। পরদিন থেকে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। ভজহরি মাহাত, পদকচন্দ্র মাহাত, গিরীশচন্দ্র মাহাত, অশোককুমার মাহাত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মানভূমের গণআন্দোলনকারী হিসেবে চিহ্নিত হন।

দুটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মানভূম জেলাবাসী এবং মানভূমের কুড়মি-মাহাতরা কত ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য পুরুলিয়ার মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে যাঁরা শহিদ হলেন আজও তাঁরা শহিদের মর্যাদা পেলেন না।

শহিদ চুনারাম মাহাত, গোবিন্দ মাহাত, গোকুল মাহাত, গণেশ মাহাত, শীতল মাহাত, সহদেব মাহাত, মোহন মাহাতদের বীরগাথা আজও লেখা হয়নি ইতিহাসের পাতায়।

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলন :

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর মানভূমের বঙ্গভুক্তির প্রশ্নে পুরুলিয়ার কুড়মি-মাহাতরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে দেবেন মাহাত, সৃষ্টিধর সিং কাটিআরের নেতৃত্বে মাহাতরা স্লোগান তোলে 'মানভূম বিহারমে রহেঙ্গে'। পুরুলিয়ার কুড়মালি ভাষাভাষি অঞ্চলে মানভূমের বিহারে থাকার আন্দোলন জোরদার হয়। অন্যদিকে ভজহরি মাহাত, গিরীশ মাহাতদের নেতৃত্বে বাংলা প্রভাবিত এলাকা ভজহরি মাহাতর "শুন বিহারী ভাই তরা রাখতে লারবি ডাং দেখাঞ" টুসুগীত টুসু আন্দোলনে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে ১ নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি হয়। পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার আন্দোলন, ক্ষেত-মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক হাঙ্গামায় পুরুলিয়া জেলায় যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের

মধ্যে কুড়মি-মাহাতদের সংখ্যাই অধিক।

পুরুলিয়া জেলার কুড়মি-মাহাতদের অর্থনৈতিক অবস্থা :

পুরুলিয়া জেলার কুড়মি-মাহাতরা এখনও পর্যন্ত কৃষিকর্মের উপরেই নির্ভরশীল। সামান্য কিছু লোক সরকারি, বেসরকারি চাকুরি, স্কুল-মাস্টারি ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত, যা জনসংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত নগণ্য। জনসংখ্যার ১৫-২০ শতাংশ কৃষক এবং বাকি ৭৫ শতাংশ কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর হিসেবে জীবিকার্জন করে। শিক্ষাগত যোগ্যতায় চাকুরিরত মাত্র ১ শতাংশ।

যেহেতু পুরুলিয়া জেলা খরাপ্রবণ এলাকা এবং সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল, পুরুলিয়ার কৃষিকর্ম এবং ফসল উৎপাদন অনিশ্চিত। একবছর ভালো ফলন হলে তিন বছরের খরায় কৃষিজীবী কুড়মিদের নাভিশ্বাস ওঠে। একফসলি তাও অনিশ্চিত কৃষিকর্মই প্রধান জীবিকা থাকায় কুড়মিদের অর্থনীতি চরম বিপর্যস্ত। আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ সুবৃষ্টি হলে এই পাঁচমাস চাষের কাজ থাকে বাকি ৭ মাস সম্পূর্ণরূপেই কর্মহীন। ওই সময়ই নামালখাটা, ইঁটভাটার শ্রমিক এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পগুলিতে ঠিকাশ্রমিক বা বঁধুয়া মজদুর হিসেবে চালান হওয়াই এদের ভবিতব্য।

অতীতে এরা ক্ষুধার তাড়নায় আসাম, দার্জিলিং, শিলিগুড়ির চা-বাগানগুলিতে, সুন্দরবন, বাদাবন, বাংলাদেশে শ্রমিক হিসেবে চালান হয়েছে, চালান হয়েছে সুদূর মরিশাসে এবং অন্যত্র এবং এখনও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ড. বিভূতিভূষণ মাহাত তাঁর পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কুড়মালি লোকসাহিত্য গ্রন্থে কয়েকটি সারণি প্রকাশ করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ :—

সারণি—১

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বসবাসকারী কুড়মিদের সরকারি ও বেসরকারি কর্মে নিযুক্তি তালিকা :

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরি	বিহার	পশ্চিমবঙ্গ	উড়িষ্যা
শাসনবিভাগ	নাই	নাই	নাই
প্রতিরক্ষা নন-কমিশনড	১৫	১৫	১০
ডাকবিভাগ ,,	২০	২০	১৫
রেলওয়ে ,,	৫	৪	২
খনি ,,	নাই	১	নাই
ব্যাঙ্ক ও ইন্সুরেন্স ,,	৩০	৩১	১২
বিচার বিভাগ	নাই	নাই	নাই

(খ) রাজ্য সরকারি চাকুরি	বিহার	পশ্চিমবঙ্গ	উড়িষ্যা
শাসনবিভাগ	২	২	নাই
বিচার বিভাগ	২	নাই	নাই
পুলিশ নন-কমিশনড	১২	১০	৫
শুল্ক বিভাগ ,,	৬	৫	৩

	বিহার	পশ্চিমবঙ্গ	উড়িষ্যা
বন বিভাগ ,,	২০	১৫	১০
রাজস্ব বিভাগ ,,	১১	৯	৫
চিকিৎসা কমিশনড	৯	৬	৫
পশু চিকিৎসা ,,	৫	৪	৪
হোমিও আয়ুর্বেদ	৭	৮	৫
ইঞ্জিনিয়ারিং	১৫	১১	৮
পরিবহন ও যোগাযোগ ননকমি ঃ	৫	৪	৩
হোটেল ও রেস্তোঁরা ,,	৩	৩	২
ব্যবসা-বাণিজ্য ,,	১৫	১৫	৭
শ্রমিক	৫	৪	৩
ছাপাখানা ও প্রকাশনা	২	৪	৫
উৎপাদনমুখী শিল্প			
সরকারি পরিচালনাধীন	৪০	২৫	১৫
(করণিক ও ৪র্থ শ্রেণি)			
ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন নন-কমিঃ	৯০	৪০	২০
গৃহনির্মাণ প্রকল্প	নাই	নাই	নাই
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প			
(করণিক ও ৪র্থ শ্রেণি)	৪	৫	৩
শিক্ষাগত পেশা			
(প্রাথমিক বিদ্যালয়)	২০০০	৩০০০	১০০০
মধ্য বিদ্যালয়	৩০০	৪০০	২০০
উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	২০০	১০০
কলেজ	২০	১০	৯
বিশ্ববিদ্যালয়	১	নাই	নাই
খনি শ্রমিক	১০০০	৪০০০	৪০০০
অন্যান্য	৫০০০	৫০০০	৩০০০

সারণি—২

শিক্ষাক্ষেত্রে কুড়মিদের সামগ্রিক অবস্থা :

মাধ্যমিক বা সমতুল	১২০০০	১৯০০০	১০৯০০
স্নাতক	৮২০	১০২৫	৭০৯
স্নাতকোত্তর	৮০	১০০	৭০
ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক	১৫	১০	৯
মেডিক্যাল ডাক্তার	১০	৯	৬
পশুচিকিৎসক	৫	৫	৫

আইন বিষয়ে স্নাতক	৭৫	৪৫	৩৫
কৃষিবিদ্যায় স্নাতক	৯	৭	৫
শ্রম সম্বন্ধীয় স্নাতক	৫	৫	৩
ডক্টরেট	৬	৪	৩
আই. এ. এস.	নাই	নাই	নাই
আই. এফ. এস.	নাই	নাই	নাই
আই. পি. এস.	১(অবসরপ্রাপ্ত)	নাই	নাই

সারণি—৩, রাজনীতি:

	বিহার	**পশ্চিমবঙ্গ**	**উড়িষ্যা**
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা	**অতীত/বর্তমান**	**অতীত/বর্তমান**	**অতীত/বর্তমান**
ক্যাবিনেট র‍্যাংক	— —	— —	— —
অন্যান্য	— —	— —	— —
এম. পি.	১/১	১/১	— —
রাজ্য মন্ত্রীসভা			
ক্যাবিনেট র‍্যাংক	— —	১/ —	— —
অন্যান্য	২/ —	— —	— —
এম. এল. এ.	১২/৩	৯/৩	— —
এম. এল. সি.	২/ —	— —	— —
বৈদেশিক চাকুরি/রাষ্ট্রদূত	— —	— —	— —

১৯৮১ সালের জনগণনায় যে ৭৬ লক্ষ কুড়মি-মাহাত সম্প্রদায়ের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করেই বিভূতিবাবু যে সারণি তৈরি করেছেন তার থেকে আমরা এদের শিক্ষা, চাকুরি ইত্যাদির বিষয়ে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

বিহার বা ঝাড়খণ্ডের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ তথা পুরুলিয়ার কুড়মিরা বর্তমানে পিছিয়ে পড়া জাতি (OBC) হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু কুড়মিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন অনুযায়ী সচেতন কুড়মি বুদ্ধিজীবীরা কুড়মি সমাজকে পুনরায় আদিবাসী সূচির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি। কারণ চাকুরিক্ষেত্রে কুড়মি-মাহাতদের জন্য সংরক্ষণের সুযোগ না থাকলে এই বিশাল কুড়মি-সমাজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না।

ক্রমবিবর্তনে সাঁওতাল জাতি ও ভাষা-সাহিত্য প্রসঙ্গ

কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি

সাঁওতাল। শব্দটি অ-সাঁওতালদের দেওয়া। সাঁতভূম বা সামন্তভূম (বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদা'র সন্নিকটে) বঙ্গদেশের একটি দেশ ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই 'সাঁত' বা 'সামন্ত' শব্দ থেকেই বাংলায় 'সাঁওতাড়' ও হিন্দিতে 'সাঁওতাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আবার অনেকের মতে, 'সাঁওতাল' শব্দটি 'শ্যামতাল' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তাল থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে 'শ্যাম' অর্থে শ্রীকৃষ্ণ এবং 'তাল' অর্থে' তার নৃত্যকে বোঝান হয়। মাথায় পাগড়ির সঙ্গে ময়ূর পালক বেঁধে শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের মাঝে নাচ করেন তেমনি সাঁওতাল যুবকরা আখড়াতে খোপায় ফুল গোঁজা যুবতীদের নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দে বাঁশি বাজিয়ে থাকে। লীলাগত সাদৃশ্য দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক 'শ্যামতাল' থেকেই 'সাঁওতাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। যাই হোক, সাঁওতালরা কিন্তু 'মাঝি জাতি" নয় এবং তাদের ভাষাকে 'মাঝি ভাষা'ও বলা হয় না। ইদানিং অনেকে সাঁওতালদের ভাষাকে 'অলচিকি ভাষা' বলেন। এটাও কিন্তু ঠিক না। 'অলচিকি' অক্ষর মাত্র, ভাষা সাঁওতালি। আবার, সাঁওতাল পুরুষদের 'মাঝি' এবং মহিলাদের 'মেঝেন' বলতেও আমরা শুনে থাকি। 'সাঁওতাল,' 'মাঝি,' 'মেঝেন' শব্দগুলো সাঁওতালরা নিজের পদবি হিসেবে ব্যবহার না করলেও এবং না মানলেও পুরাতন জমির দলিল থেকে উক্ত শব্দগুলো পদবি হিসেবে সরকার কর্তৃক নথিভুক্ত হওয়ায় অনেকে মেনে নিয়েছেন। 'মাঝি' শব্দটি সাঁওতাল সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন (গ্রাম প্রধান) ব্যক্তিকেই বোঝায়।

সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' জাতি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। 'হড়' শব্দের অর্থ' মানুষ। মুণ্ডা, হো প্রভৃতি অস্ট্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাও নিজেদের 'হড়' বলে পরিচয় দেন। সাঁওতালরা যে ভাষায় কথা বলেন তাকে 'হড় রড়' বলা হয়। তবে সাঁওতাল জাতি হিসেবে বহুল পরিচিত হওয়ায় তাঁদের ভাষাকে সানতাড়ি পারসী (সাঁওতাল ভাষা)ও বলা হয়। 'পারসি' শব্দের অর্থ 'ভাষা'। অ-সাঁওতাল ব্যক্তিকে 'দিকু' বলা হয়। কোন সাঁওতাল ব্যক্তি সাঁওতাল পরিচয় দিয়ে যদি বাংলায় কথা বলেন তাহলে জিজ্ঞেস করা হয়—'হড়' সে 'দিকু' কানাম? অর্থাৎ তুমি 'সাঁওতাল' না 'অ-সাঁওতাল'? 'সানতাড়' সে 'বাঙালি' কানাম তৎক্ষণাৎ বলা হয়ে ওঠে না।

পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার—সাঁওতালি, মুণ্ডারী, হো, কোডা, বিরহড় প্রভৃতি ভাষা গোষ্ঠীর ভাষাকে মুণ্ডারি নামে অভিহিত করেছেন এবং এই শ্রেণীর ভাষাকে অস্ট্রিক বর্গের ভাষা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতে বসবাসকারী অস্ট্রিক বর্গের ভাষা সম্প্রদায়ের প্রাচীন গাথা ও লোকগীতি

থেকে জানতে পারা যায় যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা খেরওয়াড় বা খেরওয়াল জাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাঁওতালি 'চেঁড়ে' শব্দ থেকে 'খেড়' বা 'খেরওয়াল' শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। 'খেড়' শব্দের অর্থ পাখী। তাই 'খেরওয়াড়' বা 'খেরওয়াল' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় পক্ষী শিকারী। আবার 'খেড়' শব্দ থেকেই 'খেড়িয়া' নামে এক উপজাতি গোষ্ঠীও সৃষ্টি হয়। সাঁওতালী 'চেঁড়ে' শব্দ থেকেই হিন্দিতে 'চিঁড়িয়া' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। তবে অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

হড় বা সাঁওতাল জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে তার আদি ইতিহাস জানা দরকার। ইতিহাসের উৎস থেকে চারটি দিক পাওয়া যায়। যথা—(১) প্রাচীন ঐতিহ্য (২) বিদেশি পর্যটক পর্যবেক্ষণ (৩) প্রত্নতত্ত্ব এবং (৪) ইতিহাস বিষয়ক স্বদেশী সাহিত্য ইত্যাদি।

হড় বা সাঁওতাল জাতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে পাওয়া যায়। সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব ও সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস কারাম বিন্তি বা জমসিম বিন্তি ও ছাটিয়ার বিন্তি থকে পাওয়া যায়। সাঁওতালদের বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকগীতি আজও বেদ উপনিষদের মত সাঁওতালদের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, যেগুলি সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেই সমস্ত লোকগীতি যা গ্রন্থাকারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি আলোচনার সহায়ক হতে পারে।

হড় বা সাঁওতাল জাতির সৃষ্টির আদিস্থান হিহিড়ি পিপিড়ি নামক ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় অবস্থিত ছিল। 'হিহিড়ি পিপিড়ি' আদিনিবাস সম্পর্কে বহু গান তৎকালীন নাম না করা কবিরা রচনা করেছিলেন এবং সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় আজও সাঁওতাল জাতির মুখে মুখে বিধৃত হয়ে রয়েছে।

সাঁওতাল পূর্বপুরুষদের কথানুসারে জানা যায় যে তাদের পূর্বপুরুষেরা 'হিহিড়ি পিপিড়ি'তে জন্মেছিল, খঁজ কামানে মিলিত হয়েছিল, হারাতা তে সংগঠিত হয়েছিল এবং 'সাসাংবেডা'য় জাতিকরণ হয়েছিল। সাঁওতালী সাংস্কৃতিক গানে পরিষ্কার ভাবে তার উল্লেখ আছে।

হিহিড়ি পিপিড়ি রে বোন জানাম লেন
খজ কামান রে বোন খজ লেন .
হারাতা বুরু রে বোন হারালেন
সাসাং বেডা রে বোন জাত এনা হো।

হারাতা পর্বতকেই Ararat Mountain বলা হয়। পারসিকদের ইতিহাসে বলা হয়েছে—Ararat Mountain is the cradle of human being।

হারাতা পর্বত থেকে সাঁওতাল জাতি সাসাংবেডা নামক এক জায়গায় চলে আসে। সাসাংবেডা নাকি ব্যাবিলন দেশের দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে তাদের গোত্র বিভাজন হয়। তারপরে নাকি জারপি দেশ, আয়রে (ইরান), কাঁয়ডে বা কঁয়ডা অর্থাৎ আফগানিস্তানে চলে আসে। আফগানিস্তান, পূর্বে 'কান্দাহার' বা গান্ধার নামে অভিহিত ছিল। সাঁওতালি প্রাচীন গীতে গান্ধার দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চেতে লাগিৎ মাপাঃ কানা ক কঁয়ডাকো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে,
চেতে লাগিৎ গপচ্ কানাক বাদোলী কো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে?
সিমা লাগিৎ মাপাঃ কানাক কঁয়ডা কো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে

ডাণ্ডি লাগিৎ গপচ্ কানা কো বাদোলী কো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে।

অর্থাৎ কেন কঁয়ডারা কাটাকাটি করছে গান্ধার দেশে? কেন বাদোলীরা মারামারি করছে গান্ধার দেশে? সীমার জন্য কাটাকাটি করছে কঁয়ডারা গান্ধার দেশে, বাস্তুর জন্য বাদোলীরা মারামারি করছে গান্ধার দেশে।

কান্দাহার বা গান্ধার দেশে হড় (সাঁওতাল) বা অনার্য জাতি বসবাস ও রাজত্ব করেছিল এবং তাদের রাজ্যের নাম ছিল চাম্পা বা চম্পা। সেখানে কিস্কুরা রাজত্ব করত। টুডু গোত্রের লোকেরা লোহার কাজ করত, মারডি বা মাণ্ডিরা ব্যাবসা-বাণিজ্য করত, মুরমু গোত্রের লোক পূজা অর্চনা করত, তাই তদের ঠাকুর বলা হয়। হেমব্রমরা কুমার বা দেওয়ানের কাজ করত, হাঁসদা গোত্রের লোকেরা চাষ-আবাদ করত এবং সরেন গোত্রের লোকেরা ক্ষত্রিয়দের মত দেশের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিত। কালক্রমে প্রবল বর্ষণ ও ভূকম্পন এবং আগ্নেয়গিরির সৃষ্টির ফলে চাম্পা রাজ্য মাটির তলে তলিয়ে যায়। উল্লিখিত জারপি দেশ, আয়রে দেশ, কঁয়ডা দেশ, চাম্পা দেশ, শির দেশ, শিখর দেশ, সাঁতভূম প্রভৃতি দেশ বা জায়গায় বসবাস করার পর বর্তমানে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন জায়গায় সাঁওতালরা বসবাস করছেন। বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্রের পাশাপাশি বাংলাদেশ, ভুটান, নেপালেও সাঁওতালি ভাষাভাষী মানুষ আছেন। সেইসব পুরনো দেশ বা জায়গা কোথায় ছিল এবং সাঁওতালরা প্রথম কোথা থেকে এই দেশে এসেছিলেন, এটা সহজভাবে বলা দুরুহ ব্যাপার। ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী লিখেছেন যে ভারতে একেবারে প্রথম এসেছিল নেগ্রিটো বংশধর এবং আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছিল। তারপরে বোধ হয় প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড় (অস্ট্রিক ভাষাভাষি মানুষ) যারা ভূমধ্যপ্রদেশ-এ বসবাসকারীদের মধ্যে একশ্রেণীর মানুষ, তারা এই ভারতবর্ষে এসেছিল (ভারতীয় আর্য ভাষা এবং হিন্দি ১৯৭৭) । 'ভূমধ্যপ্রদেশ' হচ্ছে ভূমধ্যসাগর (মেডিটেরেনিয়ান সি)-এর পাশাপাশি জায়গাগুলোই। ডাঃ চ্যাটার্জীর এই কথাগুলো মেনে নিলে অনুমান করা যায় যে 'হিহিড়ি পিপিড়ি' হচ্ছে 'ভূমধ্য সাগর'-স্থিত 'সিসিলি'। প্রথমের 'স' শব্দ কখনও কখনও 'হ' তে রূপান্তরিত হয়। যেমন—সিধ = হিদ, সপ্তাহ—হপতাহ (সাঁওতালী তে হাপতা) ইত্যাদি। তাই সিসিলি, 'হিহিড়ি' হতেই পারে। 'পিপিড়ি' হিহিড়ির সহচর শব্দ হতে পারে। ভূমধ্য থেকে দক্ষিণ-পূর্বে লালসাগর বা লোহিত সাগর আফ্রিকা এবং আরবের মধ্যে আছে। তাই 'সাসাংবেড়া' ওই লোহিত সাগরের তীরবর্তী জায়গাগুলো হতে পারে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে সাঁওতালদের আদিম পূর্বপুরুষ কত হাজার হাজার বৎসর পূর্ব থেকেই ভূমধ্যসাগর কাছাকাছি জায়গাগুলো থেকে আরব, ইরান, আফগানিস্থান দেশ হয়ে আমাদের এই ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং প্রথম প্রথম সিন্ধুনদীর তীরবর্তী জায়গাগুলোতে বসবাস করেছিলেন। এটা সাঁওতালিতে ব্যবহৃত হিব্রু ও পুরান আরবি ভাষায় দু-একটা শব্দ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, যেমন—রকব (হিব্রু) = রাকাপ/রাকাব (সাঁওতালি) ; হমল (পুরন আরবী) = হামাল (সাঁওতালী) ইত্যাদি।

যাইহোক এটা অনুমান করা যাচ্ছে যে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ অর্থাৎ আদিম সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতিদের পূর্বপুরুষরা ভারত ও পাকিস্তান এর পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গাতেই বসবাস করছেন।

সাঁওতাল জাতি গোষ্ঠী

সাঁওতাল জাতি গোষ্ঠীতে বারটি (১২) পদবি রয়েছে। এগুলি হল (১) কিস্কু (২) মারডি

বা মাণ্ডি (মারাণ্ডি) (৩) হাঁসদাঃ (৪) মুরমু (৫) হেমব্রম (৬) সরেন (৭) টুডু (৮) বাস্কে (৯) বেশরা (১০) চঁড়ে (১১) পাঁওরিয়া এবং (১২) বেদিয়া।

চঁড়ে, পাঁওরিয়া এবং বেদিয়া—এই তিন পদবিভুক্ত সাঁওতালরা সংখ্যায় খুবই অল্প। বেদিয়া পদবিভুক্ত সাঁওতালরা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একেবারেই মিশে গেছে।

এক একটি পদবি'র আবার কতকগুলি উপ-পদবি আছে। যেমন, কিস্কু পদবির (১) নিজ কিস্কু (২) গাড় কিস্কু (৩) অবর কিস্কু (৪) মাঝি খিল কিস্কু (৫) নায়কে খিল কিস্কু (৬) সাদা কিস্কু (৭) বিটল কিস্কু (৮) বাদাড় কিস্কু (৯) টিম কিস্কু ইত্যাদি।

মান্ডি : নিজ মাণ্ডি, গদা মাণ্ডি, মাঝি খিল মাণ্ডি নায়কে খিল মাণ্ডি, রত মাণ্ডি, অবর মাণ্ডি, বিটল মাণ্ডি, সাদা মাণ্ডি, মিরু মাণ্ডি, জুগি মান্ডি, গাড় মাণ্ডি, বুরু বেরেৎ মাণ্ডি, টিম মাণ্ডি ইত্যাদি।

হাঁসদা : নিজ হাঁসদাঃ, চিলবিঁধা হাঁসদা, বাডওয়ার হাঁসদাঃ, কেডওয়ার হাঁসদাঃ, জিহু হাঁসদাঃ, সাদা হাঁসদাঃ ইত্যাদি।

এরকম প্রত্যেক পদবির এক একটি উপ-পদবি রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মাণ্ডিদের সঙ্গে মাণ্ডি পদবি'র বিবাহ চলে না। তারা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইদানীং অবশ্য অনেকে একই পদবি'র এযুক্তি মানতে নারাজ।

সাঁওতাল সমাজ সংগঠন

জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতিটা আজকের নয়। আদিবাসীরাও তাদের নেতা নির্বাচন করেন। তবে তা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে হয় না। হয় প্রকাশ্যে। গ্রামের মানুষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন করে থাকেন।

আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজে যিনি নেতা হন তাকে 'মাঝি' বলা হয় (গ্রাম প্রধান)। মাঝি গ্রাম পরিচালনার সর্বময় কর্তা। সমস্ত আবেদন-নিবেদনের যেমন শেষ স্তর সুপ্রিম কোর্ট, মাঝিও তেমনি সর্বপ্রধান। মোড়ল বলেও মাঝির পরিচিতি আছে।

মাঝির অধিকার ও কর্তব্য হল—গ্রামের সমস্ত রকমের ব্যাপারে তাঁর মতামত থাকবে। তাঁর গোচরে বিষয়টা অবশ্য জানাতে হবে। কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা মাঝিকে অবশ্যই জানাতে হবে। 'মাঝি' যদি কখনও প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তিনি গ্রাম্যসভা ডাকতে পারেন। কারুর বিরুদ্ধে চরম দণ্ড দিতে হলে গ্রাম্যসভার মতামত ছাড়া তিনি ব্যক্তিগত মতামত দিতে পারবেন না। নিজস্ব ধর্মের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা চলছে কিনা তার দিকে নজর রাখাও মাঝির কাজ। বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী।

মাঝির সঙ্গে কয়েকজন সহকর্মী থাকেন। তাঁরা হলেন, পারানিক, জগমাঝি, জগ-পারানিক, গডেত, নায়কে, কুর্ডাম নায়কে।

পারানিক—মাঝির সহকর্মী হচ্ছেন পারাণিক। সচিবের ন্যায় তার কার্যকলাপ। মাঝির অনুপস্থিতিতে সবকিছু পরিচালনা করেন।

জগ-মাঝি—যুবক-যুবতিদের নেতা বা পরিচালক। এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে গ্রামকে অপসংস্কৃতি থেকে রক্ষা করা। গ্রামে যাতে যথেচ্ছাচার না হয় তার জন্য জগ-মাঝিকে সদা সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়।

জগ-পারানিক—জগ-মাঝিকে সাহায্য করা জগ-পারানিকের কাজ।

গডেত—গডেত মাঝির দূত। মাঝির আদেশে তিনি গ্রামের লোককে সমবেত করেন।

নায়কে—নায়কে হচ্ছেন গ্রামের পূজারি ব্রাহ্মণ। যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে নায়কেই পূজা করেন।

কুর্ডাম-নায়কে—নায়কের সহকারীকে বলা হয় কুর্ডাম নায়কে।

কয়েকটি গ্রাম/অঞ্চল মিলে এক-একটি পরগনা ভাগ থাকে। পরগনার শাসনকর্তাকে বলা হয় পারগানা। কোনো গ্রামে মাঝি বিচার করতে না পারলে পরগানার ডাক পড়ে। পারগানা অনুসন্ধান করে বিচারের মীমাংসা করেন।

দেশ মাঝি—প্রত্যেকটি পরগনায় একটি করে দেশমাঝি থাকেন। সমস্ত পরগনার কথা দেশমাঝিগণ ভেবে থাকেন।

দিহরি—জাতীয় শিকারে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদেরকে দিহরি বলা হয়। প্রত্যেক এলাকায় একটি করে দিহরি থাকেন। সাঁওতাল সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে 'ল-বির-বাইসি'।

বর্তমানে সাঁওতালি ভাষা ও অলচিকি

অস্ট্রিক ভাষাবর্গের দুটি শাখা—অস্ট্রোনেশিয় এবং অস্ট্রোএশিয়। অস্ট্রোএশিয় শাখার মধ্যে প্রধান পাঁচটি ভাগ হল প্রত্নমলাক্কা গোষ্ঠী, খাসি নিকোবর গোষ্ঠী, মন ঘমের গোষ্ঠী, চাম গোষ্ঠী এবং কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠী। এই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর আবার পূর্ব পশ্চিম ভেদে দুটি ধারা—পূর্বাঞ্চলীয় এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় ধারা। পূর্বাঞ্চলীয় ধারার প্রধান ছয়টি ভাষা হল—মুণ্ডাবী, ভূমিজ, কোডা, হো, কোরোয়া এবং সাঁওতালি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতাল জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। জনসংখ্যার নিরিখে সাঁওতালি ভাষার স্থান ত্রয়োদশ। ভারতবর্ষে, বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্যে সাঁওতালি ভাষার মানুষ রয়েছেন। এছাড়া প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও নেপালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন।

ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জীর মতে—সাঁওতালি মুণ্ডারী ভাষা আমাদের দেশের সংস্কৃত সাহিত্যে নিষাদ গোষ্ঠীর ভাষা বলে পরিগণিত হচ্ছিল। কিন্তু কেউ কেউ এটাকে কোল ভাষা বলেও চালিয়ে যাচ্ছিল। 'কোল' শব্দ 'হড়' শব্দেরই অনুরূপ। কারণ অস্ট্রো এশিয়াটিক অর্থাৎ নিষাদ গোষ্ঠীর 'কোঁড়কু' ভাষায় প্রথমের 'হ' বর্ণ কখনও কখনও 'ক'তে রূপান্তরিত হয়। যেমন, হড়ক = কোড়কু ইত্যাদি। তিনি আরও বলেছেন, "আর্য ভাষার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে কোল ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষায় লোকে বলিত (পৃঃ ২৩) এবং প্রাচীন অনার্য ভাষা, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়, স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এগুলি আর্যভাষার প্রকৃতিতে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে ;এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কি দরজা দিয়া বহু অনার্য শব্দ আর্য ভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে"। (সংস্কৃত সাহিত্য ইতিহাস পৃঃ ২৬)

W. W. Hunter বলেছেন, "While Tracing of the Alphabet, We found reasonable ground to conjecture that the Aryan invaders of India had come in contact with the Santals, or a cognate race in primitive times and mentioned that prakrit a very early form of vernacular Sanskrit had adopted pure Santali terms' (The Annals of Rural Bengal p.176)

স্বাধীন ভারত প্রধানত— দুটি সাঁওতালি ভাষাঞ্চলে বিভক্ত হল। যথা— (১) Nothern Santali এবং (২) Southern Santali। এ সম্পর্কে ভাষাবিদ G. A. Grierson মন্তব্য করেছেন "The Purest Santali is spoken in the north, especially in the Santal Parganas and Manbhum. The dialect spoken in Midnapore, Balasore, Singbhum and

Orissa tributary states is more mixed and shows of gradually yielding to Aryan influence.''

(Linguistic Survey of India, p-32)

সাঁওতালী ভাষা কেন দুভাগে ভাগ হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। সাঁওতালি ভাষাভাষী জনগণ রুটিরুজির ধান্দায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করতে লাগলেন। ভৌগোলিক পটভূমিকায় সাঁওতালি ভাষাভাষী জনবিন্যাসের মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে যে ছবি আমরা দেখি তা হল, মোটামুটি সমগ্র ভারতের ৫২, ১৬, ৩২৫ (১৯৯১ সেন্‌সাস) জন সাঁওতাল ভাষাভাষী মানুষের বাস উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড় ; সাঁওতালপরগণা, হাজারীবাগ, সিংভূম ; পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, হুগলি প্রভৃতি জেলায় ;আবার কেউ বা আসামের চা বাগানে। স্বাভাবিক কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতালরা কিছু দ্বি-ভাষীও ত্রি-ভাষী। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সাঁওতালি ভাষা জীবন্ত ভাষা এবং অতীব গতিশীল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে পর্যন্ত এই ভাষার নিজস্ব কোন লিপি ছিল না। যা ছিল তা রোমান লিপি। রোমান লিপি সর্বপ্রথম ই. এল. পাক্সলে ১৮৬৮ সালে সাঁওতালি ভাষা লেখবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। পরে পি. ও. বোর্ডিং তার Materials for Santali Grammar বইয়ের ভূমিকাতে লেখেন, 'যতদিন এই সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিপি তৈরি না হচ্ছে, ততদিন বিভিন্ন ধ্বনি সঙ্কেতযুক্ত রোমান লিপির মাধ্যমেই সাঁওতালি ভাষায় লেখার কাজ চলতে পারে।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজ্য সরকার স্থানীয় ভাষার উপর জোর দেয় এবং সাঁওতালিদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়—রাজ্যের স্থানীয় ভাষার লিপি ব্যবহার করার জন্য। ১৯৪৭ সালে সাঁওতালি পত্রিকা 'হড়-সম্পদ' বিহার সরকার দেবনাগরী ভাষায় প্রকাশ করেন এবং ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'গালমারাও' পত্রিকা প্রকাশ করেন। অবশ্য মিশনারীদের স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন কতিপয় সাঁওতাল ব্যক্তিত্ব। সাঁওতাল মহাকবি সাধু রামচাঁদ মুরমু তার মধ্যে অন্যতম। তিনি সাঁওতালি ভাষায় জন্য ১৯২৩ সালে 'মঁজ দাঁধের আঁক' নামে লিপি উদ্ভাবন করেন। পাশাপাশি সাহিত্য চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু অর্থাভাবে এই লিপির ব্লক তৈরি করে তা প্রচার করা সম্ভব হয়নি বলে সাধু রামচাঁদের বর্ণমালা এখনও সাঁওতাল সমাজে অপরিচিত। অন্যত্র দেখা যায়, ১৯২৫ সালে পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু সাঁওতালি ভাষার উপযোগী 'অলচিকি' লিপির উদ্ভাবন করেন। এই লিপিও দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার পর 'আদিবাসী সোসিও এডুকেশনাল এণ্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' অলচিকি প্রচারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। অলচিকি প্রচারের আন্দোলন মূলত দানা বাঁধে সত্তর দশকের গোড়ার দিকে। তাবপর একটানা আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই লিপিকে ১৯৭৯ সালে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেন। তারপর থেকেই এই লিপির ব্যাপক প্রচলন সাঁওতালদের মধ্যে শুরু হয়। অপরদিকে বিতর্কও থেমে থাকে না। কারণ সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষিত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থানীয় লিপিতে ভীষণভাবে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন এবং ভাষা-সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালরা বাংলা লিপির আশ্রয়ে সাঁওতালি সাহিত্যের উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অন্যান্য লিপির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। যেমন উড়িষ্যাতে উড়িয়া লিপি, বিহারে বসবাসকারী সাঁওতালরা দেবনাগরী লিপি, আবার খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত সাঁওতালরা রোমান লিপি ব্যবহার করেন। ফলে ভাষাচর্চা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা যায়, 'অলচিকি'র ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও বাংলা লিপি ও দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে ভাষা সাহিত্য আন্দোলন অব্যাহত। বাংলা লিপির মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের যে বিনাশ লক্ষ করা যায় তা অন্যান্য লিপির ক্ষেত্রে বলা যায় না। আবার

একথাও ঠিক 'অলচিকি'র মধ্যে সাঁওতালদের নিজস্বতার অনুভব রয়েছে। ফলে বৃহদাংশ সাঁওতাল সমাজ অলচিকি লিপিকে মেনে নিয়েছেন।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন এখনও শুরু হয়নি। বাঁকুড়া জেলায় চারটি স্কুলে সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। সাঁওতালি ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের পড়াবার জন্য অলচিকি হরফে কিছু প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পড়ানোর সামগ্রিক পরিকাঠামো না থাকায় সাঁওতালিতে শিক্ষা দান স্তিমিত হয়ে যায়।

বর্তমানে রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকার নতুনভাবে চিন্তা শুরু করেছেন। যার ফলশ্রুতি বিদ্যালয় স্তরে সাঁওতালি ভাষা পড়ানো যায় কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য ডঃ পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে 'সাঁওতালি ভাষা কমিটি' গঠিত হয়েছিল। সরকারের কাছে কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছে। জানা যায়, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য (সাহিত্য বিষয় মাত্র) সিলেবাস তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাংলা হরফে পুস্তক ছাপায় 'অ্যাসেকা'র পক্ষ থেকে (অলচিকি আন্দোলনের সংস্থা) জোরালো প্রতিবাদ করা হয়। ফলে সাঁওতালিতে পঠন-পাঠন আবার ঝুলে যায়। অপরদিকে ঝাড়খণ্ড-এর রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুর তিলকা বিশ্ববিদ্যালয় দুমকার সিধু-কানু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় বি.এ/এম.এ পড়ানো হয়। সেখানে অলচিকি এবং দেবনাগরী—এই দুটো লিপি'ই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, লিপির এই সমস্যায় সাঁওতালী ভাষা-সাহিত্য বিকশিত হতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। তবে লিপির বিতর্ক যাই থাকুক, ভাষা নিয়ে কিন্তু সবাই এক। ইদানীং সাঁওতালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্তির আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। ফরস্বরূপ পশ্চিমবাংলা বিধান সভায় সর্বদলীয় ভাবে সাঁওতালি ভাষা বিল পাশ।

সাঁওতালি সাহিত্য প্রসঙ্গে

সাঁওতালিতে একটা বহু প্রচলিত কথা আছে। কথাটা হল'—'অল খন দ মুতি গে মরেসা।' অর্থাৎ লেখার থেকে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ। এই মানসিকতার জন্যই বোধ হয় সাঁওতালি সাহিত্য বহুকাল ধরে শ্রুতির আকারে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সাঁওতালরা বাড়ির দেওয়ালে নানারকম গাছপাতা, ফুল ইত্যাদি ছবি আঁকেন যাকে 'ফ্রেস্‌কো' বলা যায় কিংবা গরু মহিষের গায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম সাংকেতিক চিহ্ন আঁকেন—এটা সাঁওতাল জীবনের এক ঐতিহ্য। সাঁওতাল সাহিত্য রচিত হয়েছে মুখে মুখে এবং তা স্থান পেয়েছে মানুষের স্মৃতিতে। বলা যায়, সাঁওতালি ভাষায় লিখিত সাহিত্য শুরু হয় ইংরেজরা ভারতে আসার পর থেকে। আসলে লোক সাহিত্যই হল সাঁওতালি মূল সাহিত্য। লোকসাহিত্য বলতে বুঝি লোকমুখে প্রচলিত গীতি, ছড়া, হেঁয়ালি, প্রবাদ প্রবচন ও নানারকম কাহিনী। সাঁওতাল সমাজ এই লোকসাহিত্যকে নাচগানের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। ছড়া, হেঁয়ালী প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা গ্রামের বাটিতে বাটিতে আলোচিত হয়। অবশ্য সময় ও যুগের পরিবর্তনে আজকাল আর আসর বসতে দেখা যায় না।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইংরেজরা ভারতে আসার পর থেকে সাঁওতাল সমাজের বহুগান, ছড়া, কবিতা, কাহিনী সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা উড়িষ্যার বালাসোরে ১৮৩৬ সালে মিশন প্রতিষ্ঠা করে। মিশন পরিচালনার দায়িত্ব রেভারেণ্ড জে. ফিলিপ্স এর উপর অর্পিত হয়। তিনি ১৯৪৫ সালে সাঁওতালি গান ও ছড়া সংগ্রহ করে বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশ করেন। তারপর An introduction to the Santali Language গ্রন্থটি ১৮৫২ সালে প্রকাশ করেন। এরপর যাঁরা সাঁওতালি সাহিত্য চর্চা করে গেছেন তাঁরা হলেন—P.O. Bodding, L. O. Skrefsrud, E. L. Puxley, W. G. Archer ইত্যাদি। ঠিক

তাদের পরই সাঁওতালদের মধ্যে এগিয়ে এলেন সিংভূমের রামদাস টুডু রেসকা। তিনি 'খেরওয়াল বংশ ধরম পুথি' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) নামক পুস্তক রচনা করে গেছেন। এটি হল সাঁওতালদের নিজের চেষ্টায় লেখা প্রথম পুস্তক। এরপর শিলদার মহাকবি সাধুরাম চাঁদ মুরমু, উড়িষ্যার পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু, সাঁওতাল পরগনার পাউল জুজার সরেন, এস. সি. মুরমু, হিকিম মুরমু, পুরুলিয়ার রাজেন্দ্র নাথ মাঝি প্রমুখ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭ সাল থেকে বিহার সরকার কর্তৃক 'হড়-সম্বাদ' নামে সাঁওতালি সাহিত্য পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে এবং সম্পাদক ডমন সাহু সমীরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বহু কবি-সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছেন। অপরদিকে পশ্চিমবাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পছিম বাংলা', তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বর্তমানে বহু সাঁওতালি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এখানে কবি-সাহিত্যিকদের নাম ও প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা দিয়ে লেখা বাড়াতে চাই না। শুধু একথা বলতে চাই, সাঁওতালি সাহিত্যচর্চা বেশ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। এতে অংশগ্রহণ করেছেন বহু অসাঁওতাল বুদ্ধিজীবী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মহাশ্বেতা দেবী, ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, সুধীর মিত্র, ডঃ পরিমল চন্দ্র মিত্র ও আরো অনেকে। ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক তো সাঁওতালদের পুস্তক প্রকাশ করার জন্যই 'মারাং বুরু' প্রেস খোলেন। তবে সাঁওতালি সাহিত্য চর্চা দূর থেকে বোঝা মুশকিল। দূর থেকে এইজন্য বলছি, অনুবাদ সাহিত্যের অভাবের জন্য। ইদানীং অবশ্য অনুবাদ সাহিত্যেও অনেকে হাত দিয়েছেন।

তবে এ· থা বলতে বাধা নেই অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় বেশি মাত্রায় সাঁওতালি ভাষা-সাহিত্য চর্চা পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেকেই স্বীকার করেন পুরুলিয়া জেলা সাঁওতালি সাহিত্য চর্চার প্রথম পীঠস্থান। বলা যায়, পুরুলিয়া জেলায় প্রথম সাঁওতালি সাহিত্যচর্চার বিপ্লব ঘটেছে। সাঁওতাল সমাজের বিখ্যাত কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু এ জেলারই মানুষ। তাঁর রচিত 'ভুর্কা ইপিল' (১৯৫৩), 'কুহুবাও' (১৯৬০), গাম-গঁদার (১৯৬৭), লাহাঃ হররে (১৯৮৫), 'বিদাঃ বেড়া,' 'সলম লটম', 'সঙ্গীতিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ বহুল প্রশংসিত। 'খেরওয়াল আড়াং' ও 'সুসার ডাহার' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া তাঁর বহুবিধ কর্মপদ্ধতি ছিল।

পুরুলিয়া জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার নাম ঝারণা, সুস্কর ডাহার, তেতরে, সিলি, জিরিহিরি, তাপান দাঃ, পোঁডগোড়া, উমুল, জাংতিরয়ো, আরতাগম, মিদঃ আড়াং, রায়বার, গিরু, তিরায়া, খঁদরঁদ, যুগ ঝারণা ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য 'সিলি' ব্যতীত উল্লেখিত পত্রিকাগুলি আপাতত বন্ধ আছে।

সাঁওতালি সংস্কৃতিতে পুরুলিয়া জেলার স্থান অনন্য একথা সর্বজন স্বীকৃত। বহু প্রাচীন সাঁওতালি লোকগীতিতে আমোদিয়া বুরু, শিকার দিশম, বারহা দিশম, মান দিশম, পাতকম দিশম, গিরু নাই, চাকলতাড়ি ছাতা, তেলকপি ঘাট, 'মানবির সিঞবির প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এসবই পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত। আজও সাঁওতাল জগতের বহু লোক প্রতি বৈশাখ পূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসব, ভাদ্র সংক্রান্তিতে চাকলতাড়ির ছাতা, অস্থি বিসর্জনের জন্য দামোদর নদীর পবিত্র তেলকুপি ঘাটে এসে থাকেন। প্রকৃতি প্রেমিক এই সাঁওতালরা জীবনরসে ভরপুর, প্রাণ-প্রাচুর্যে উজ্জ্বল।

লোক-সংস্কৃতি ছাড়াও পুরুলিয়ার পরিচিতি অন্য দিক থেকেও আছে। অর্থাৎ কবিতা ও গানের দেশও পুরুলিয়াকে বলা হয়। জেলা শহরে দু-ধরনের সাহিত্য চর্চা হয়ে থাকে। (১) লোক সাহিত্য, (২) শহুরে সাহিত্য। শহুরে সাহিত্য চর্চা যারা করেন তাঁরা এতই আত্মকেন্দ্রিক যে তাঁদের একেবারে কাছের আদিবাসী সমাজের সাহিত্যচর্চার কথা একদমই খোঁজ রাখেন না। কেউ জানেন না,

যে কত বড় নীরব বিপ্লব হয়ে চলেছে আদিবাসী তথা সাঁওতাল সাহিত্যের মধ্যে। প্রতিদিন নতুন নতুন নাট্যকার, কবি, প্রাবন্ধিক তৈরি হচ্ছেন ; নতুন নতুন ভাবনা সমাজে দাগ কাটছে।

ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে আগামী দেড়শত বৎসরের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা বিলুপ্ত হবে, যদি না সাঁওতালবা সাঁওতালি ভাষার চর্চা করে। তিনি বেঁচে থাকলে আজকে নিশ্চয় খুশি হতেন। সাঁওতাল সমাজের মধ্যে নিজেদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য যে ভাবে আন্দোলন চালাচ্ছেন তাতে একটা বিষয়ে আশাবাদী হওয়া যায় যে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য চিরতরে বিলুপ্ত হবে না। এই ভাষা-সাহিত্য অন্যান্য ভাষা সাহিত্যের মত একদিন নিজের স্থান অর্জন করতে পারবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সহায়ক গ্রন্থ ও ঋণ স্বীকার

(১) সাঁওতাল সংস্কৃতি—দূরবীণ সরেন।

(২) সাঁওতালি ভাষা ও লিপি প্রসঙ্গে—পরিমল হেমব্রম।

(৩) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।

পুরুলিয়ার মাড়োয়ারি সমাজ

বংশীধর কাটারুকা
ওমপ্রকাশ রাঠী

মাটি সবাইকে আপন করে নেয়। মাটিই সন্ধান দেয় অন্নের। অন্নই হচ্ছে প্রাণ, চেতনা, ধ্বনি, অগ্নি, মন্ত্র, আরাধনা, জল, নক্ষত্র, এমনকি সর্বধর্ম সার।

এই মাটির টানেই সুদূর রাজস্থানের শেখাবটী অঞ্চল থেকে আজ থেকে ১৫০ বৎসর আগে একটি পরিবার বেরিয়ে পড়েছিলেন—প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ব্যাবসা। পথ চলতে চলতে বরাকর পেরিয়ে এক অজানা জায়গা শাল, পলাশ, মহুয়ার বনানী পেরিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন পুরুলিয়ার মাটিতে। পরিব্রাজক ছিলেন কাটারুকা পরিবার—গন্তব্যস্থল চাঁইবাসা। কথায় বলে—কার কোথায় মাটি, অন্ন, জল মাপা আছে কেউ বলতে পারে না। ব্রিটিশ সরকার তখন ভারতবর্ষে দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করে চলেছেন। তৎকালীন এক ইংরেজ সরকার এই পরিবারটিকে পুরুলিয়াতে ব্যাবসা করার জন্য অনুরোধ করেন এবং বিনিময়ে সর্বপ্রকার সরকারি অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেন। মাটির টান। কাটারুকা পরিবারের কর্তামশাই যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। এককথায় রাজি—এ তো তাঁর কাছে রাজকন্যাসহ রাজত্ব লাভ। এইভাবে পুরুলিয়া জেলাতে প্রথম মাড়োয়ারি সমাজের স্থাপনা হল।

মানুষ সামাজিক জীব। সে তো চায় তার কাছের-দূরের আত্মীয়-পরিজন নিয়ে বাঁচতে। হলও তাই। একে একে সুদূর রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মাড়োয়ারি পরিবার দল ভারী করতে ছুটে এলেন। এরপর ১৯৪৭-এর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিবেশী দেশগুলি থেকেও অনেক মাড়োয়ারি পরিবার মালক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে পুরুলিয়ায় এলেন বসবাসের অদম্য বাসনা নিয়ে—ঠিক যেমন এসেছিলেন দক্ষিণীরা, উৎকল, জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ।

এরপর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে মাড়োয়ারি সম্প্রদায় পায়ে পা মেলালেন। শুনতে অবাক লাগলেও আজকে পুরুলিয়া জেলায় নাই নাই করে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) মাড়োয়ারি বসবাস করেন। এঁরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আজ পুরুলিয়ার আপন মানুষ হয়েই স্বচ্ছন্দে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে চলেছেন। এইভাবে দীর্ঘ অধ্যবসায়, আন্তরিকতা, একাগ্রতার গুণে পরকে করেছেন আপন—আপনকে করেছেন পর।

মাড়োয়ারি সমাজ মূলত ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে দেখলেন সমাজকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পুরুলিয়াতে শিক্ষা প্রসারের জন্য বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন—যেগুলি পুরুলিয়ার শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম—

* রাজস্থান বিদ্যাপীঠ
* কস্তুরবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
* D.S.K. D.A.V. Public School
* শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ প্রাঃ বিদ্যালয়
* ভজনাশ্রম প্রাঃ বিদ্যালয়
* গুল্লিবাঈ প্রাঃ বিদ্যালয়
* G.R.K. D.A.V. Public School
* B.S.S. Central Public School
* বাল ভারতী
* ভজনাশ্রম স্কুল—বলরামপুর এবং অন্যান্য।

বর্তমানে ছাত্রসমাজের অনেকেই প্রকৃত শিক্ষার প্রভাবে পুরুষ এবং মহিলারা চাকুরি এবং পেশাগত ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উচ্চপদে আসীন আছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই সমাজের বিশেষ ভূমিকা আছে। তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রচুর অর্থসাহায্য দিয়ে এঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শ্রী রামলাল সরাওগী ও শ্রী সত্যনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন।

শুধু শিক্ষার প্রকৃত প্রসারই নয় এই সমাজ স্বাস্থ্য পরিসেবার বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন। পুরুলিয়া জেলাতে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিসেবার প্রতিষ্ঠানগুলিই এই সত্যতা প্রমাণ করে। এদের মধ্যে অন্যতম রামেশ্বরলাল সিংহানিয়া সেবা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার দায়িত্বও এই সমাজ গুরুত্ব সহকারে পালন করেন।

পুরুষশাষিত সমাজে রক্ষণশীল মহিলারাও আজ সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। এর প্রমাণ আজ থেকে ৫০ বছর আগে মহিলা সমাজের উন্নতি সাধনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মহিলা বিকাশ মণ্ডল'। প্রাতঃস্মরণীয় সমাজসেবী তথা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী যমুনালাল বাজাজের স্ত্রী স্বনামধন্যা সমাজসেবী শ্রীমতি জানকীদেবী বাজাজ এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এঁরই তত্ত্বাবধানে পুরুলিয়ার মাটিতে প্রতিবন্ধীদের শারীরিক ও শিক্ষাগত উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হল 'মনোবিকাশ কেন্দ্র'। জাতীয় স্তরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

শুধু এখানেই থেমে থাকেনি। এই সমাজ বহিরাগত ভ্রমাণার্থী এবং জনসাধারণের সাময়িক বসবাস ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য বহু ধর্মশালা জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন।

প্রধানত ব্যবসায়ী সমাজ হওয়ার কারণে সারা জেলায় ব্যাবসা ও শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। বর্তমান সরকারের শিল্প উন্নয়ন নীতির সাহায্যে এঁরা পুরুলিয়াতে বহু শিল্প স্থাপন করে চলেছেন—প্লাস্টিক, সিমেন্ট ব্যাগ, ত্রিপল, সিমেন্ট, বিস্কুট, স্পঞ্জ আয়রন, আধুনিক চাউল মিল ইত্যাদি কারখানা এবং নানান ক্ষুদ্র শিল্প ছাড়াও বিভিন্নপ্রকার খনিজ উত্তোলন এবং পরিশোধনের কাজেও এই সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। লাক্ষা শিল্পের উন্নতি সাধনেও এঁরা যুক্ত।

ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এই সমাজের পুরুষদের সাথে মহিলারাও যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। চীন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের যুদ্ধে নিজেদের প্রসাধন সামগ্রী, গহনা, অর্থ সাহায্য দিয়ে মাড়োয়ারি সমাজ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় এঁরা পিছিয়ে থাকেননি।

মাড়োয়ারি সম্প্রদায় ধর্মভীরু জাতি। হিন্দু শাস্ত্রে গাভীকে আমরা মা হিসেবে পূজা করি। এরই ফলস্বরূপ পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গোশালা স্থাপিত হয়েছে। "গো দুগ্ধ শক্তির উৎস"—এই লক্ষ্যে আধুনিক প্রজননবিধি দ্বারা বলদ ও গাভী প্রজনন করা হয়। কৃষিকাজের জন্য বলদগুলি দিয়ে গরিব চাষিদের সাহায্য করা হয়।

হিন্দুধর্মের প্রতি অগাধ আস্থা নিয়ে এঁরা বিভিন্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—

* সত্যনারায়ণ মন্দির
* রাম মন্দির
* সতী মন্দির
* হনুমান মন্দির ইত্যাদি।

দৈনন্দিন খেলাধুলা চর্চাতেও এঁরা পিছিয়ে থাকেননি। আজ থেকে অনেক......বছর আগেই নির্মিত হয়েছিল 'মাড়োয়ারি নবযুবক সঙ্ঘ (মানস)। এখানে প্রতিদিন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ক্রীড়াপ্রেমী মানুষেরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। দৈনন্দিন জীবনের শত কাজের মধ্যেও এরা সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করে চলেছেন।

মানুষের আশার শেষ নেই। আমাদের বিশ্বাস আগামী দিনে মাড়োয়ারি সমাজ পুরুলিয়ার সর্বস্তরের উন্নতিসাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

পুরুলিয়ার উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজ

বিজয় পান্ডা

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিয়ে কথকতায় প্রাক্‌কথন হিসাবে সার্বিক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। ব্রাহ্মণের সৃষ্টির মূল, ধর্ম, শ্রেণী বিভাজনের পূর্ববর্তী অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন, 'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সংভূব'। দেবতাদের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মাই মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ ইত্যাদি দশটি ব্রাহ্মণ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং প্রজাপতি ও আদি ঋষি বলে খ্যাত।

"ব্রাহ্মোণস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যককৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদাভ্যাং শূদ্র অজায়ত॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভগবানের মুখ হতে, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য এবং পদ হতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করেছে। সুস্থ মানব-সমাজ নির্মাণ ও বিকাশে উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের ভূমিকা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য প্রসঙ্গ ব্রাহ্মণ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, ব্রহ্মণ্ + অন। ব্রহ্মণ শব্দের অর্থ নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে যিনি জানেন এই অর্থে অন্‌প্রত্যয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যিনি সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ—

"সত্যবাদী জিতক্রোধা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
সন্ধ্যাস্নানরতো নিত্যং ব্রহ্ম যজ্ঞ পরায়ণ॥
বীতরাগভয়ক্রোধো লোভ মোহ বিবর্জিত।
মাতা পিনোহিতে যুক্তো গো ব্রাহ্মণ হিতেরতঃ॥
দতোযজ্ঞী দেবভজো ব্রহ্মালোকে মহীয়তে।
ত্রিবর্গসেবী সততং দেবতানাঞ্চ পূজনম্॥
ক্ষমা দয়া চ বিজ্ঞানা সত্যঞ্চৈব দমঃ শমঃ।
অধ্যাত্মং নিত্যতাজ্ঞানমেদদ্ ব্রাহ্মণলেক্ষনম্॥"

ধর্মের লক্ষণ—"ধৃতিঃক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদা সত্যমক্রোধো দশকম্ ধর্মলক্ষণম্॥"

সন্তোষ, ক্ষমা, মন ও ইন্দ্রিয় দমন, শুচি, আস্তেয়, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, সত্যবাদিতা ও অক্রোধ এই দশটি বাহ্মণের ধর্মের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণের পতন— "অনভ্যাসেন বেদানামাচাকস্য বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্ন দোষাদ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥"

বেদে অনভ্যাস, সদাচার পরিত্যাগ, আলস্য ও অন্নদোষ এই চারটি কারণে ব্রাহ্মণের মৃত্যু কল্পিত হয়।

তাছাড়া আরও বলা হয়েছে— "যঃস্বকর্ম পরিত্যজ্য যদন্যং কুরুতেদ্বিজঃ।
অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহ স তেন পতিতোভবেৎ॥"

যদি কোনো ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বা মোহবশত স্বধর্ম অর্থাৎ নৈমিত্তিকাদিকর্ম পরিত্যাগ করে অন্যকার্য করেন তাহলে তিনি পতিত।

ব্রাহ্মণের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মঃযজনা যঃজনঃ অধ্যয়নঃ দানঃ সৎপ্রতিগ্রহ ও অধ্যাপনা এই ষড়বিধ।

গোত্র ও প্রবর

ব্রাহ্মণের মূলের পরিচিতি তাঁর গোত্রে। গোত্রম শব্দটি (গো + ত্রৈ + ড) দ্বারা নিষ্পন্ন। অর্থ গরুর ত্রাণ বা রক্ষা পাওয়ার স্থান। আর্য ঋষিগণের গো-রক্ষণের স্থানগুলিই পূর্বে গোত্র নামে অভিহিত হত। প্রাচীনকালে ঋষিগণ দেবকার্য, পিতৃকার্য ইত্যাদি কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ধেনুপালন করতেন। এদেব হোমধেনু বলা হত। ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রম সন্নিকটেই গোচারণ বা গোরক্ষণের স্থান নির্ধারণ করতেন। বিশেষ ঋষিকৃত-নির্ধারিত স্থানটি তদ্‌গোত্রসজ্ঞা লাভ করত। গোত্র হল যা দ্বারা আদিপুরুষের নাম উক্ত হয়।

যে যে গোত্রে যে যে ঋষি বা প্রধান ব্যক্তি অবস্থান করতেন তাঁরা সেই গোত্র প্রবর্তক ঋষির শিষ্য বা সন্তান। ইহারাই গোত্রের প্রবর বলে খ্যাত। গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের প্রবর সংখ্যার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় অধিকাংশ ঋষিরই প্রবর সংখ্যা তিন। তবে বেশ কিছু গোত্র প্রবর্তক ঋষি আছেন যাঁদের প্রবর সংখ্যা পাঁচ। আবার একজন প্রবরবিশিষ্ট গোত্র প্রবর্তক ঋষিও আছেন। শাস্ত্রবিহিত পারিবারিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে উচ্চারিত মন্ত্রে গোত্রের সঙ্গে প্রবরও উল্লিখিত হয়। তাছাড়া প্রবরের খোঁজ পড়ে উপবীতে গিঁট দেওয়ার সময়। বিশেষ গোত্রের প্রবর সংখ্যা সংখ্যক গিঁট আলাদাভাবে উপবীতে দেওয়ার শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে। প্রবর অর্থে গোত্র প্রবর্তনকারী বা গোত্রের ভেদবোধক মুনিগণ।

ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ

বেদের অধিকারভেদে ব্রাহ্মণদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) ঋগ্বেদীয় (২) সামবেদীয় (৩) যজুর্বেদীয় (৪) অথর্ববেদীয়। যজুর্বেদ আবার দুভাগে বিভক্ত শুক্ল ও কৃষ্ণ।

দেশভেদে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন-(১) পঞ্চগৌড় (২) পঞ্চদ্রাবিড়। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর দিকস্থ পাঁচটি প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চগৌড় এবং বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকস্থ ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন।

পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়ামৈথিলিকোৎকল
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যসোত্তরবাসিনাম (স্কন্দ পুরাণ)

(১) সারস্বত (২) কান্যকুব্জ বা কনৌজ ব্রাহ্মণ (৩) গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ (৪) উৎকলীয় ব্রাহ্মণ (৫) মৈথিলি ব্রাহ্মণ।

সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণদের নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। প্রতিবেদনের মূল-আলোচ্য

বিষয় যেহেতু উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ফলে পরিসরের বিস্তৃতির শঙ্কায় অধ্যায়ে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

উড়িষ্যা বা উৎকলবাসী ব্রাহ্মণদের উৎকলীয় ব্রাহ্মণ বলা হয়। এ ব্যাপারে Risley বলেছেন, "A territorial division of the Pancha Goura Brahmans deriving its name from the province of Utkal."

উৎকল ব্রাহ্মণ সম্পর্কে John Beams-এর মন্তব্য, "Tradition relates that the original Brahmans of Orissa were all extinct at the time of rise of the Ganga Bansa Line time of kings but that 10,000 Brahmans were induced from Kanauj and settled in Jajpur the sacred city on the Brahmanel river. The date of this immigration is not stated but the fact is probably historical and may have been synchronous with the well known introduction of Kanaujia Brahmans into the neighbouring Province of Bengal by king Adisura in the tenth century, when the worship of the idol Jagannath began to be revived at Puri, the king of Orissa introduced many of the Jajpur Brahmans to settle round the temple and conduct the ceremonies. Thus there sprang up a division among the Brahmans. Those who settled in Puri being called the Dakshinatya Sreni or southern class, and those who remained at Jajpur the Uttara Sreni or northern class. This latter spreads all over northern Orissa. Many of the southern Brahmans however are also found in Balasor and the divisons of the two classes are fairly represented in most part of the district, though the southern is less numerous than the northern, The former are held in greater esteem for learning and purity of race than the later.

প্রাচীনকাল থেকেই যাজপুর উড়িষ্যায় বসবাসকারী ব্রাহ্মণদের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদের বসবাসের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে। কলিঙ্গ যুদ্ধের চার বছর পর লিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের সময়কাল খ্রিঃপূঃ ২৬১ ; অর্থাৎ খ্রিঃপূঃ ২৫৭ অব্দে উৎকীর্ণ অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপির ২য় অনুচ্ছেদে তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধের পর প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে কলিঙ্গ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। উক্ত নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু উৎকল সদ্‌গৃহস্থ ব্রাহ্মণও ছিলেন। শিলালিপির সপ্তম অনুচ্ছেদে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সপ্তম শতকের শেষদিকে বা অষ্টম শতকের প্রারম্ভে পুরীর মন্দির নির্মিত হয়নি। পুরুষোত্তমের নামডাকও পুরীর বাইরে তেমন ছড়িয়ে পড়েনি। জয়তি কেশরী দশম শতকের প্রথমদিকে পুরীর মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন। অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ নির্মাণকার্য শেষ করেন বারো শতকের মাঝামাঝি। শবরদের প্রিয় দেবতা নীলমাধব, 'জগনাইলো ব্রাহ্মণ্যধর্ম' দ্বারা অধিগৃহীত হওয়ার পূর্বের যে পরিস্থিতি তাতে উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণদের বেশ সুপ্রতিষ্ঠিতই দেখা যায়। অধিগ্রহণ পর্বটি বেশ চিত্তাকর্ষক তথা রোমান্টিক। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর মন্ত্রী বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন নীলমাধবের সন্ধানে। নীলমাধবের সন্ধান করতে গিয়ে বিদ্যাপতি বিশ্বাবসু শবরের কন্যা ললিতার প্রেমে পড়ে যান। পরে ললিতার মাধ্যমে গোপনে নীলমাধবকে অপহরণ করে আনা হয়। উপরোক্ত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে এবং Blams-এর মন্তব্যের পিছনে কোন শবরদের ডেরা থেকে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের কোনো উল্লেখ না থাকায় মিঃ বিমস্ বর্ণিত গঙ্গবংশের আধিপত্যের সময় উড়িষ্যা থেকে ব্রাহ্মণদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনাটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, পরে কনৌজ থেকে ১০,০০০ ব্রাহ্মণ এসে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত পবিত্র যাজপুর

নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। ঘটনাটিকে তিনি আদিশূরের সমকালীন বলে উল্লেখ করেছেন।

ব্রাহ্মণদের প্রাচীন বাসভূমি ব্রহ্মাবর্ত, আর্যাবর্ত, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান। ব্রহ্মাবর্ত বলতে বুঝায় গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী স্থান। কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল বা কান্যকুব্জ, মথুরা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র এই পরিসীমার মধ্যবর্তী স্থান মধ্যপ্রদেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পূর্ব এবং পশ্চিমে সাগরবেষ্টিতে ভূমিখণ্ড আর্যাবর্ত। আদি মধ্যযুগেও কান্যকুব্জ কোলাঞ্চ (ক্রোড়াঞ্চ), শ্রাবস্তি, মুক্তাবস্তু ইত্যাদি স্থানে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের বসবাসের খ্যাতি। ওই সমস্ত অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণেরা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন। কতকগুলি কুল-পঞ্জিকায় অনুরূপ পশ্চিম দেশের কান্যকুব্জ বা কোলাঞ্চ নামক স্থান হতে কুলীন ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষের বাংলায় আগমনের একটি কাহিনি পাওয়া যায়। কথিত আছে তাদের ছত্র ও পাদুকা বহনকারী শূদ্র ভৃত্য হিসাবে কায়স্থদের পূর্বপুরুষেরা এদেশে এসেছিলেন। কাহিনিতে ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস নাই। বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় আদিশূরের বিবরণ এক নয়। কোথাও আদিশূর গৌড়ের অধিপতি, কোথাও বাংলা-উড়িষ্যার নরপতি, কোথাও আবার অঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব, গুর্জর প্রভৃতি দেশের অধিপতি। কোনো গ্রন্থে আদিশূরের রাজধানী গৌড়, কোথাও বা বিক্রমপুর। বিভিন্ন কুল-পঞ্জিকায় ব্রাহ্মণদের আগমনের তারিখ ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪ ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪, ৯৯৯ শকাব্দ। বাংলাদেশে রাঢ় অঞ্চলে শূরবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করতেন। এই রাজবংশের বনশূর ও লক্ষ্মীশূর নামক দুজন ক্ষুদ্র নৃপতির কথা জানা যায়।

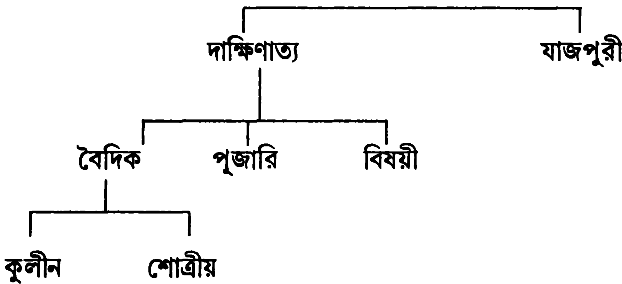
নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আদিশূরের রাজত্বের কিছু প্রমাণ আছে। আদিশূর পাল সম্রাটের সামন্তরূপে মিথিলা-বরেন্দ্র অঞ্চলে কোনো অংশে শাসন করতেন। আদিশূরের কাহিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত History of Bengal Vol-I-এ যা বলা হয়েছে তা উদ্ধৃত করা হল-'As regards Adisura different genealogies of his family are given in different texts : he is referred to as the grandfather (Mothers father) of Ballal Sena and as that of a remoteancestor of Ballal Sena in others. He is said to have been the ruler of Bengal and Orissa but some authorities add Anga, Kaling, Karnata, Kamrupa, Sourastra, Magadha, Malava and Gujrata to his dominions. Some say that the whole affair (i.e bringing of the Brahamins) was peaceful as Adisura had married the daughters of the Kanauj king while according to others he faught with him (i,e, the king of Kanauj) and his capital where he received the Brahmans is placed by some at Gouda and by others at Bikrampura. The reasons why the Brahmans were brought by him are variously stated. Six different authorities put forward names of different religious ceremonies for the performance of which the Brahmans were requisioned. According to a seventh account the king of Kasi (not Kanauj as in the other texts) being asked by Adisura to pay tribute refused to do so and in reply tauntingly referred to Adisura's dominions as bereft of Brahman's and vedic sacrifices. Where upon Adisura defeated him in battle and brought the five Brahmanas. The date of this event is also variously put down while the sets of named are given as those of the five Brahmanas.

উড়িষ্যায় কনৌজ থেকে ১০,০০০ ব্রাহ্মণের একই সাথে পরিযায়ন বেশ বিস্ময়কর ঠেকে, যেখানে পাঁচজন মাত্র ব্রাহ্মণকে আনার জন্য আদিশূরকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন কিংবা যুদ্ধ ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়েছে। ঘটনাটি আদিশূরের সমসাময়িক বলা হয়েছে ফলে বিস্ময়ের মাত্রা

আরও বৃদ্ধি করে। অনুরূপ গঙ্গ বংশীয় রাজাদের অভ্যুত্থানের সময় উড়িষ্যার আদি ব্রাহ্মণেরা উচ্ছিন্ন হয়েছিলেন এ ঘটনার পিছনে যুক্তি-সঙ্গত কারণ উল্লেখ না থাকায় গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। বরং কলিঙ্গ যুদ্ধের অবসানের পর অশোক অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিছু সদ্‌গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পরিবারকে সূক্ষ্ম এবং রাঢ় অঞ্চলে নির্বাসিত করেছিলেন জানা যায়।

দেশভেদে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পঞ্চগৌড়ের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। ভারতবর্ষে একসময় গৌড় নামে পাঁচটি নগর একই রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় উহা পঞ্চগৌড় বা শুধু গৌড় নামে অভিহিত হত। উক্ত পঞ্চগৌড় (১) রাঢ়প্রদেশ (২) বারেন্দ্রভূমি (৩) যবদ্বীপসহ বঙ্গদেশ (৪) মিথিলা প্রদেশ (৫) উৎকল প্রদেশ। উক্ত পাঁচটি প্রদেশে বসবাসকারী ব্রাহ্মণগণই পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্য এবং উৎকল ছাড়াও উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণদের ন্যায় কিছু কার্যকরী শ্রেণিবিভাজন লক্ষ করা যায়—(Mr. Beams goes on to explain how these two sub-castes are further broken up into functional divisions according to the Veda. Whose ritual they profess to abserve and into Gotras or Exogamous groups.) বিভাজন নিম্নরূপ—



বৈদিকগণের উপাধি সামন্ত, নন্দ, মিশ্র, আচার্য, সেনাপতি, সৎপতি, চেদি, পর্ণগ্রাহী প্রভৃতি। শোত্রীয়দের উপাদি ভট্ট, মিশ্র, উপাধ্যায় ওঝা, তেওয়ারি, সৎপতি প্রভৃতি।

শ্রেণীবিন্যাসসহ উৎকল শ্রেণির ব্রাহ্মণদের প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু কথা হল। মূল আলোচ্য বিষয় 'পুরুলিয়ার উৎকল ব্রাহ্মণ।' এতদঞ্চলে উৎকল ব্রাহ্মণদের বসবাসের ব্যাপারে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিহাসনির্ভর তথ্যসূত্র নেই যা আছে তা কিছু কিংবদন্তি এবং কাহিনীর ধোঁয়াসায় ঢাকা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডি. ডি. কোসাম্বি এই জনগোষ্ঠীকে স্বেচ্ছাপরিযায়ী বলেছেন। এঁদের ব্যাপারে প্রথম যে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ নজরে আসে তার সময়কাল ২৬১ খ্রিঃপূঃ, কলিঙ্গ যুদ্ধের কাল। কলিঙ্গ যুদ্ধের চার বছর পর অশোকের উৎকীর্ণ ত্রয়োদশ শিলালিপির সপ্তম অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিছু সদ্‌গৃহস্থ উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবারকে অরণ্য-কন্দর পরিবৃত জনবিরল এই উষর ভূমিতে অশোক নির্বাসিত করেছিলেন। ফলে পরিযায়নের প্রসঙ্গ আসে না। উক্ত সূত্রের আলোকে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে উৎকল ব্রাহ্মণেরা এতদঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বসবাস করছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময় অনেক উৎকল বাসী এতদঞ্চলে এসেছিলেন। উড়িষ্যা একদা দারিদ্রপীড়িত দেশ

ছিল। উড়িষ্যায় বেশ কয়েক দফা দুর্ভিক্ষ হয়েছে—১৭৭০, ১৭৮০, ১৭৯২ খ্রিঃ মারাঠা অধিকৃত থাকাকালীন আর একবার ১৮০৩ সালে ইংরেজ আমলে স্বজাতি অধ্যুষিত ; অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটিতে রাজানুকুল্য পাবার আশায় দুর্ভিক্ষকালীন কিছু মানুষের বসবাসের ইচ্ছা নিয়ে আসাটা এমন কিছু অবাস্তব ব্যাপার নয়।

উৎকল ব্রাহ্মণদের এতদঞ্চলে বসতি বিস্তারে কিংবদন্তি মিশ্রিত কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাব মধ্যে প্রথমটি হল কলিঙ্গের গঙ্গারাজ চোড়বর্মন কর্তৃক অপারমান্দার অভিযান। তাম্রলিপ্তের নৃপতি অনন্তবর্মন কলিঙ্গ বিজয়ের পর সেখানে গঙ্গারাজ্য স্থাপন করেন এবং সেখানেই তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গৌড়াধিপতি রামপালের পুত্র কুমার পালের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গঙ্গারাজ অনন্তবর্মন ১১৩৭ খ্রিঃ রাঢ়ের অপারমান্দার আক্রমণ করেন ও মন্দার রাজধানী আরম্যদুর্গ ধ্বংস করেন। কুমার পালের সুযোগ্য মন্ত্রী বৈদ্যদেব অনন্তবর্মনের অগ্রগতি প্রতিহত করেন। ফেরার পথে অনন্তবর্মনের বহু সৈন্যসামন্ত মল্লভূম ও শিখরভূমের বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। অনেক উৎকল ব্রাহ্মণও একথা বলে থাকেন যে তাঁরা অনন্তবর্মনের অভিযানের সময় এতদঞ্চলে এসেছেন।

দ্বিতীয়টি হল, নকুড়তুঙ্গ সম্পর্কিত। সিমলাপাল, শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুলমার উৎকল জমিদারদের দ্বারা বর্ণিত নকুড়তুঙ্গ সম্পর্কিত কাহিনিটি নিম্নরূপ,—'নকুড়তুঙ্গের প্রপিতামহ তুঙ্গ দেও উড়িষ্যার গণ্ডকী নদীর তীরে কোথাও বসবাস করতেন। তীর্থযাত্রাকালে শ্রীধাম পুরীতে এসে তিনি জগন্নাথদেবের কৃপায় পুরীর রাজা হন। তাঁর পৌত্র গঙ্গাধর তুঙ্গকে জগন্নাথ স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন যে, গঙ্গাধরের পর তাঁর বংশের কেউ পুরীর রাজা থাকবেন না, অতএব তাঁর পুত্র সপরিবারে সৈন্য-সামন্তসহ পুরীধাম ত্যাগ করে প্রায় দশ বছর নানা স্থানে ঘুরে অবশেষে দক্ষিণ বাঁকুড়ার শ্যামসুন্দরপুরের কাছে টিকারপুরে বসবাস শুরু করেন (১৩৪৮ খ্রিঃ)। অঞ্চলটি একদা রাজাগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। রাজাগ্রামের সামন্ত রাজা সামন্তসার বা সামন্তসুব যে কোনো কারণে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সপরিবারে মৃত্যুবরণ করেন, ফলে তাঁর বংশে রাজা হওয়ার কেউ ছিল না। বহুকাল রাজাগ্রাম রাজাশূন্য ছিল। বনদস্যু ডাকাতদের উপদ্রবে অঞ্চলটির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নকুড়তুঙ্গ দস্যুদের দমন করে ছত্রনারায়ণদেব নাম নিয়ে অঞ্চলটির রাজা হন। জগন্নাথের নাম অনুসারে নাম রাখেন জগন্নাথপুর। নকুড়তুঙ্গের নাম অনুসারেই অঞ্চলটি তুঙ্গভূম নামে পরিচিত হয়। নকুড়তুঙ্গের সাথে এসেছিলেন ২৫২টি উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁরাও এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। নকুড়তুঙ্গের একাধারে গুরু, মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন শ্রীপতি মহাপাত্র জন্মস্থান কটকের নিকট বিরামচন্দ্রপুর। শ্রীপতি মহাপাত্র বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আনুকুল্যে সিমলাপাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ কেউ বলেন, নকুড়তুঙ্গই তাঁর গুরু ও মন্ত্রী শ্রীপতি মহাপাত্রকে গুরুদক্ষিণা হিসাবে সিমলাপাল অঞ্চলের জমিদারি দান করেন। কেউ কেউ আবার দাশরথী মহাপাত্রকে মহাপাত্রদের আদি বলে উল্লেখ করে থাকেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, বিরামচন্দ্রপুর থেকে শ্রীপতি (সিংহ) মহাপাত্র এখানে আসেন। তিনি মল্লরাজের কাছে চাকুরির জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। মল্লরাজ তাঁকে রাজকর্মচারী (যোদ্ধা) হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে সিংহ উপাধি ও কিছু মৌজা দেন। তিনি সপরিবারে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং সিমলাপালের রাজা হন। আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন এবং পৌরোহিত্য ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উড়িষ্যা থেকে আট ভাইকে (গৌতম মিশ্র, উদ্দালক পাইন, বশিষ্ঠ সৎপথী, কাশ্যপ পাঠক, মধুগলপতি, কাত্যায়ন পণ্ডা, ষন্নিগ্রহী, জমদগ্নী, কাশ্যপপাত্র) নিয়ে আসেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা

বিশেষ কিছু না পেয়ে পরিবারসহ মহিষাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মহিষাড়ায় তাঁরা নিজেদের শ্রমে বসবাসের জন্য বাসগৃহ এবং একটি পুকুর খনন করেছিলেন। উড়ের বাঁধ নাম নিয়ে পুকুরটি আজও অবস্থান করছে। সেখানে বেশ সুবিধা করতে না পেরে কিছুদিন পর চলে আসেন বর্তমান পুরুলিয়া জেলার লাখরা গ্রামে। পরে সেখান থেকে তাঁরা অম্বিকানগরের রাজার সাথে সাক্ষাৎ করেন। অম্বিকানগরের রাজা একটি গ্রাম তাঁদেরকে ব্রহ্মত্তর হিসাবে দান করেন। সম্ভবত ব্রাহ্মণদের বসবাসের সুবাদে গ্রামটির নাম হয় ব্রাহ্মণডিহা। ব্রাহ্মণডিহা থেকেই আট পদবিধারী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন।

আট ভাইয়ের বিরামচন্দ্রপুর থেকে এতদ্ঞ্চলে আসার কারণ হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন ব্রহ্মত্তর ভোগ করার দাবিতে খাজনা না দেওয়ায় রাজার উৎপীড়নে চলে এসেছিলেন, কেউ কেউ আবার বলেন পুরীর মন্দিরে যজ্ঞের আগুনের সামনে বেদ পাঠ করতে হত। এই কষ্টের হাত থেকে বাঁচার জন্যই চলে এসেছিলেন। মহান্তিরা আট ভাইয়ের সম-সাময়িককালে এসেছিলেন বলে শোনা যায়। পুরুলিয়ার কিছুসংখ্যক গ্রামে কিছু উৎকল শ্রেণির ব্রাহ্মণ বাস করেন যাঁদের মধ্যে ওড়িয়া আচার-আচরণ অনেকাংশে বিদ্যমান এমনকি ভাষা পর্যন্ত। এদের ওড়িয়া বা দখনি বলে। দখনিরা মহান্তিদের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ করেন। উৎকল শ্রেণির ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চ এবং নামিভেদ আছে। কয়েক দশক আগেও গোত্রগত উচ্চবর্গীয়েরা নামিদের ঘরে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করতেন না। বর্তমানে সেই ভেদ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

পুরুলিয়ার হুড়া, পুঞ্চা, মানবাজার, বরাবাজার, বলরামপুর, কেন্দা, পুরুলিয়া সদর ইত্যাদি থানার মধ্যে উৎকল শ্রেণির ব্রাহ্মণদের বসতি সীমাবদ্ধ। মোটামুটিভাবে বলা যায়, উত্তরে কাঁসাই দক্ষিণে সুবর্ণরেখা মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চল উৎকল ব্রাহ্মণদের বাসভূমি। প্রাচীন মানভূমকে ধরে মোট গ্রাম সংখ্যা প্রায় ৯১টি। পদবি—মহান্তি, মহাপাত্র, পাত্র, সৎপতি, পাঠক, পতি, পণ্ডা, দাস, মিশ্র, তেওয়ারি, ষড়ঙ্গী, লায়েক, পাইন, গোস্বামী, ত্রিপাঠী ইত্যাদি। মানবাজার, বরাবাজার এবং বলরামপুর থানায় উৎকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহান্তিরাই সংখ্যাধিক্য। মহাপাত্র, আট-ভাইয়ের পদবিধারী ব্রাহ্মণ যাদের পুরুলিয়ায় দেখা যায় তাঁদের অনেকেই ব্রাহ্মণডিহা বা সিমলাপাল থেকে এসেছেন বলে অনুমিত হয়।

ঘোলকুঁড়ে বসতি স্থাপনকারী মহাপাত্রদের আদিপুরুষকে নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুমানকে অনেকখানি স্পষ্ট করবে বলে মনে হয়। 'দু-ভাই মহাপাত্র বাস করতেন সিমলাপালের পাশাপাশি অঞ্চলে। বড় ভাই মারা গেছলেন, তাঁর দু'ছেলে। ছোট ভাই বিয়ে করেননি। তাঁর একপাল মহিষ ছিল। তিনি সেগুলির পরিচর্যা করতেন। দীর্ঘদিন খাজনা না দেওয়ায় বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁকে পাইক পাঠিয়ে নিয়ে যান এবং বন্দি করে রাখেন। বন্দি অবস্থাতেই তিনি প্রত্যহ ভোর চারটায় স্নান সেরে ইষ্ট দেবতা শালগ্রামের পূজা ইত্যাদি সেরে আবার বন্দি অবস্থাতেই ফিরে যেতেন। ঘটনাটা রাণির নজরে প্রথম পড়েছিল। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং রাজাকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন এবং বামুনকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য রাজাকে অনুরোধও করেছিলেন। বামুন ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারত কিন্তু যেহেতু সে পালিয়ে যায়নি সে জন্যই তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য রাণি রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন। রাণির কথা শুনে রাজা স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখলেন এবং বামুনকে ডেকে বললেন, 'আপনি একদিন আমার মহলের রক্ষক পাইকদের পাশ দিয়ে যাবেন আপনার ক্ষমতা দেখব।' মহাপাত্র মহলের রক্ষকদের পাশ দিয়েই গেলেন তারা সড়কি চালিয়েও তাঁকে আঘাত করতে পারেনি। তাঁর অলৌকিক

শক্তি দেখে রাজা লম্বালম্বি তাঁর পায়ে পড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনাকে খাজনা দিতে হবে না, বলুন আপনার জন্য কী করতে হবে?' মহাপাত্র তখন তাঁর মহিষ পাল রাখবার জন্য কিছু জায়গা রাজার কাছে চাইলেন। রাজা একদিনে যতটা জায়গা তিনি পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করতে পারবেন ততটা পরিমাণ জায়গা তাঁকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরিক্রমার সাক্ষী হিসাবে দুজন অশ্বারোহী তিনি চাইলেন। কথিত আছে অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠে যতটা পথ পরিক্রমা করেছিলেন তিনি পায়ে হেঁটেই ততটা পথ পরিক্রমা করেছিলেন। রাজা তাঁর পরিক্রমাবেষ্টিত জায়গাটি তাঁকে নিষ্কর দান করেছিলেন। বড় ভাইপোকে তিনি সেই জায়গার রাজা করলেন। ছোট হল হিকিম। তার বৌদি, ছেলেদের বললেন 'জমিদারি-তো তোদের কাকার নামে, তোদের তো তাতে কোনো ভাগ নেই।' মহাপাত্র সেই কথা শুনে ভাইপোদের নামে জমিদারি লিখে দিলেন। পরদিন সকালে বৌদি তাঁকে খাবার জন্য ডাকছেন। তিনি বললেন, 'বৌদি জমিদারিতো আমার নামে নেই। অন্যের জমিদারির অন্ন আমি খাব কেন? এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এসে পৌঁছালেন পঞ্চকোট মহারাজার রাজত্বে মানভূমের ঘোলকুঁড়ে। সেখানে তিনি রাজার কোনো অনুমতি না নিয়েই বন কেটে বসতি গড়ে তুললেন। সেখানে এসে তিনি ছিরুডিতে বিয়ে করে সংসারী হলেন। ঘোলকুঁড়ের মহাপাত্ররা তাঁরই বংশধর। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। দুখানা পাথর দিয়ে তিনি প্রত্যহ মুগুর ভাঁজতেন। পার্শ্বলার বাঁধের কাছে তাঁর ভাজা মুগুরগুলো আজও পড়ে আছে। কিংবদন্তিটি স্থানবিশেষে অন্যরূপেও শোনা যায়। কিংবদন্তিটি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে সিমলাপাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এতদঞ্চলে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল। ছিরুডি গ্রামটি সেই প্রাচীনতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ছিরুডি হুড়া থানায়। ঘোলকুঁড় পুঞ্চা থানায়, পার্শ্বলা বাঁকুড়া জেলার লক্ষ্মীসাগরে।

কোন কোন ইতিহাসবিদ এতদঞ্চলে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পরিযায়ী, স্বেচ্ছাপরিযায়ী ইত্যাদি অভিধায় অভিসিঞ্চিত করেছেন কিন্তু এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে উপরোক্ত মন্তব্যকে মোটেই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। উৎকল ব্রাহ্মণদের বসতি সন্নিবেশিত কাঁসাই-সুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটি যে একদা উৎকলের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে। কিছুসংখ্যক উৎকল পরিবার যে অশোক কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছিলেন তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। কালিদাসের 'রঘুবংশমে,' রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে চতুর্থ সর্গে বলা হয়েছে, 'অতঃপর সৈন্যদের গজসেতু তৈরি করিয়ে তিনি কপিশা নদী পার হয়ে উৎকলে উপনীত হলেন। উৎকলের রাজারা তাঁকে পথ দেখিয়ে কলিঙ্গ দেশে নিয়ে চললেন।' কালিদাসের সময়কাল ৪৭২ খ্রিঃ (কিলহর্ন কর্তৃক অনুমিত) মোটামুটি পঞ্চম শতাব্দী। 'মা তীর্ত্বা কপিশাং সৈনোর্বদ্ধ দ্বিরদসেতুভি।।

উৎকলা দর্শিত পথ কলিঙ্গভিমুখোযযৌ।।' রঘুবংশ ৪।৩৮।

পঞ্চম শতাব্দীতে আলোচিত অঞ্চলটি যে উৎকলের অন্তর্গত ছিল উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে তা বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তাছাড়া রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপির 'তক্কনলাঢ়মে'-এর বর্ণনায় কপিশা বা কংসাবতীকে কলিঙ্গের উত্তর সীমানা বলা হয়েছে। রাজেন্দ্র চোলের সময়কাল ১০১৪ থেকে ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ। রাজেন্দ্র চোলের সময় পর্যন্ত অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থানের যে কোনো পরিবর্তন হয়নি তা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে। মুসলিম বা ইংরেজ আমলের পূর্বে অঞ্চলটির ভৌগোলিক সীমানা পরিবর্তনের কোনো প্রামাণ্য দলিল-পত্র না থাকায় একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা স্বভূমিতেই বাসস্থান পরিবর্তন করেছিলেন, পরিযায়ী বা স্বেচ্ছাপরিযায়ী হয়ে আসেননি।

তাছাড়া ঐতিহাসিক কালপঞ্জির পিছনের পাতাগুলো ওল্টালে দেখা যাবে প্রাচীন মানভূম মধ্যযুগের সময় পর্যন্ত বেশিরভাগ উড়িষ্যার শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এর দ্বারা উড়িষ্যার রাজনৈতিক সীমারেখা দীর্ঘকাল প্রাচীন মানভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মানবংশীয় রাজাদের নাম অনুসারে যে অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে মানভূম সেকথাও পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন। অঞ্চলটিতে যে মানদের আধিপত্য ছিল তার পরিচয় আজও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক কালানুক্রমে দেখা যায় (১৬৩-১৫০ খ্রিঃপূ:) খারবেলের সময় কলিঙ্গের অভ্যুত্থান ত্রিকলিঙ্গের জন্ম। উত্তর ভাগের মধ্যে পুরুলিয়া জেলা। (১৫০-১০০ খ্রিঃ পূঃ) উত্তর তোষলির মধ্যে ওড্র বা উড্রদেশের উদ্ভব। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ উড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ১৬০ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়া জেলার একাংশ ওডিভিসার অন্তর্গত। কালিদাসের কালের কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। ৫৭৯ খিস্টাব্দে মানবংশের মহারাজ শম্ভুযশ উত্তর ও দক্ষিণ তোষলির অধীশ্বর। উত্তর তোষলিতে সামন্তরাজা সোমদত্ত। সোমদত্তের রাজ্যাধীন পুরুলিয়া অঞ্চল। ৬০৩ খ্রিস্টাব্দে সোমদত্ত শশাঙ্কের অধীন। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশ দণ্ডভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়া জেলা কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে ভাগাভাগি। ১০১৪ থেকে ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়া জেলা দণ্ডভুক্তি ও দক্ষিণ রাঢ়ে। ১০৭৭-১০৯০ খ্রিস্টাব্দে কাঁসাইয়ের দক্ষিণাংশ দণ্ডভুক্তির মধ্যে। অবশিষ্ট অংশ তৈলকিম্প রাজ্যে। ১০৯০-১০৯৬ খ্রিস্টাব্দ কুলতুঙ্গ কর্তৃক পুরুলিয়ার দক্ষিণাংশ বিজিত। ১৬০১-১১ খ্রিস্টাব্দ পঞ্চকোট দুর্গের অধিশ্বর বীর হাম্বির। জাহাঙ্গির কর্তৃক সুবা বাংলা থেকে সুবা উড়িষ্যা পৃথকীকরণ। যে কটি কালানুক্রম দেওয়া হল তা থেকে কাঁসাই-এর দক্ষিণ অংশের স্বতন্ত্র অবস্থান তথা পুরুলিয়ার উড়িষ্যার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়ে থাকার কথা জানা যাচ্ছে।

উৎকল ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত কাঁসাই নদীর দক্ষিণের উপত্যকা অঞ্চলকে উড়িষ্যার সঙ্গে সাঙ্গীভূত ভাবার সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে পুরুলিয়ার দক্ষিণ এবং পূর্বের কয়েকটি থানা ছাড়া জেলার অন্যান্য থানাগুলিতে উৎকল শ্রেণির ব্রাহ্মণদের দেখা যায় না। শুধু তাই নয় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও এরা ছড়িয়ে পড়েননি। উড়িষ্যার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য রীতির প্রভাবও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ছাড়া অন্যান্য জেলাগুলিতে তেমন একটা পড়েনি।

উড়িষ্যা দারিদ্র পীড়িত রাজ্য। আজ থেকে দুচার দশক আগেও পুরী, কটক ইত্যাদি অঞ্চল থেকে কিছু ভিক্ষাজীবী উৎকল ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি করবার জন্য এতদেশে আসতেন। তাঁদের ভিক্ষা ক্ষেত্রটি স্বজাতি অধ্যুষিত উল্লিখিত অঞ্চলটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার বাইরে তাঁরা যেতেন না। এঁদের স্বধর্ম নিষ্ঠা ছিল প্রবল। দিনান্তে একবার স্বপাক অন্ন খেতে না উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যকারোর বাড়ীতে রান্না করে খেতেন না। অন্যের তোলা জলও তাঁরা খেতে ন না। পরম্পরাগত স্বভূমি ভাবনাই সম্ভবত তাঁদের অঞ্চলটিতে টেনে আনত। আজকাল তাঁদের আর দেখা যায় না।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে মানবাজার, বরাবাজার, বলরামপুর থানায় গরিষ্ঠ সংখ্যায় বসবাসকারী উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাহান্তিদের নিয়ে কিছু আলোচনার অবতারণা করা হচ্ছে। মাহান্তিদের ব্রাহ্মণত্বের ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তি আছে। উড়িষ্যার কায়স্থদের পদবি মাহান্তি ব্রাহ্মণদের নয়। এখানে ব্রাহ্মণেরা মাহান্তি লেখেন। সরলীকরণের মাধ্যমে কথ্যভাষায় মাইতি দাঁড়িয়েছে। আসলে মাহান্তিদের পদবিনন্দগোত্র কাশ্যপ। এর কাগুজে প্রমাণ আছে পুরুলিয়া Treasury'র double lock এ। গঙ্গানারায়ণের মৃত্যুর পর মুক্তক কমিশনের মাধ্যমে বরাবাজার রাজ-এর সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সন্ধি হয়েছিল তাতে বরাবাজার রাজ-এর পক্ষে সই

করেছেন দেওয়ান বংশীধর মাহান্তি। তিনি তাঁর নামের জায়গায় লিখেছেন বংশীধর মাহান্তি দেবশর্মা কাশ্যপ নন্দ। কুঁজরু কমিশনের সভাপতি ছিলেন J. C. Kunjru।

মাহান্তিরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত (১) খামারবেড়িয়া (২) কুড়ুমবেড়িয়া (৩) তেঁতুলিয়া। শ্রেণীবিন্যাস থাকলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে বিধিনিষেধ আছে নেই। তেঁতুলিয়াদের 'তেঁতুল-বিকা মাইতি' বলে অনেকে ঠাট্টা তামাশা করে থাকেনা। এ ব্যাপারে ছোট একটি কাহিনিও তৈরি হয়েছে। কাহিনিটি হল—ওই সম্প্রদায়ের মাহান্তিরা পুরী অঞ্চল থেকে এতদঞ্চলের দিকে আসছেন, সঙ্গে গাধার পিঠে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে আসছেন। রাস্তায় তাঁরা পড়লেন তস্করের হাতে। তস্করেরা শুধাল, 'গাধার পিঠে কী আছে?' মাহান্তিরা বললেন, 'তেঁতুল আছে, বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।' তস্করেরা তাঁদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কোন কোন মাহান্তী বলে থাকেন, তাঁদের মাহান্তী পদবী কাশীপুরের মহারাজাদের দেওয়া।

মাহান্তিরা কতদিন পূর্ব থেকে এতদঞ্চলে এসে বসবাস করছেন তার সঠিক সন-তারিখ বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। বর্তমান মাহান্তিরাও যথাযথভাবে বলতে পারেন না। তাঁদের কাছ থেকে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তা থেকে জানা যায় মাহান্তিরা প্রথমে পাতকুমে এসেছিলেন। পাতকুমের রাজাকে হত্যা করে পাতকুম রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে তাঁরা বিতাড়িত হন। এসে পৌঁছান বরাভূমে। বরাভূমে এসে রাজার কাছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হিসাবে কিছু আনুকূল্য লাভ করেন। রাজার কুলদেবতার পূজার দায়িত্ব পান। সেখানে একটি গ্রাম পত্তন করে তাঁদের কুলদেবতা রসিক নাগরের নামে গ্রামটির নাম দেন 'রসিকনগর'। রসিকনগর মাহান্তিদের এতদঞ্চলে আদি বাসভূমি। এখান থেকে মাহান্তিরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। একটা অংশ চলে যান মানবাজারে সেখান থেকে ঝাড় বাগদা। এই ঝাড়বাগদা থেকেই মাহান্তিদের একটা অংশ বাঁকুড়া জেলার খাতড় খানার, হিড়বাধ, হিতাশি ইত্যাদি জায়গায় বসতি স্থাপন করেন। ঝাড়বাগদার মাহান্তি এবং পাথরমহড়ার রাজা প্রথমে মানবাজারে থাকতেন। সাহেবরা এসে যখন মানবাজারে কাছারি বাড়ি খুলতে চাইল তখন সাহেবদের কাছাকাছি বসবাস না করার কারণে মাহান্তিরা চলে গেলেন ঝাড়বাগদায়, মানবাজারের রাজা গেলেন পাথর মহড়ায়।

ঝাড়বাগদা এবং বরাবাজার বলরামপুরের মাহান্তিরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যোদ্ধা ছিলেন। নিজেদের বুদ্ধিমত্তার জোরে তাঁরা রাজদরবারগুলিতে উচ্চ পদমর্যাদায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। উভয় রাজদরবারেই দেওয়ানের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন মাহান্তিরা। বরাবাজারের রাজার সৈন্যবিভাগেও কিছু কিছু উৎকল ব্রাহ্মণ কাজ করতেন। রাজদরবারগুলিতে তাঁদের যথেষ্ট খাতির-প্রতিপত্তি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেব লিখিত 'বরাভূম রাজ্যের শাসনকার্য্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা'তে তিনি রাজার দেহরক্ষী সৈন্যদের যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—৬০ ভুইএঞা, ৬০ মিএঞা, ৬০ নামাতা, ৬০ উৎকল।

বংশীধর মাহান্তি (বড়রা) বরাভূমের রাজা গঙ্গানারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ-বিদ্রোহে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ইংরেজরা বিদ্রোহী গঙ্গানারায়ণকে জঙ্গলের মধ্যেই ফাঁসি দেয়। বংশী মাহান্তি বিধবা রাণি এবং গঙ্গানারায়ণের নাবালক পুত্রকে খামারবেড়িয়াতে (বর্তমান বড়রা) লুকিয়ে রাখেন এবং নিজে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। এইভাবে তাদের বিব্রত করেন এবং একটা রফায় আসতে বাধ্য করেন। তখন রাজবাড়ি ছিল নদীর ওপারে। ওখানে রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও পড়ে আছে। ইংরেজের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তার শর্ত ছিল রাজার কোনো সৈন্যবাহিনী রাখা চলবে না। বার্ষিক একটা নজরানা দিতে হবে, তৎসহ ক্ষতিপূরণ

বাবদ কিছু। বরাভূমরাজের পক্ষে চুক্তিপত্রে সই করেন বংশীধর মাহান্তি। গঙ্গানারায়ণের পত্র সাবালক হয়ে রাজা হন এবং দেওয়ানকে ৩৯টি মৌজা মোজা দান করেন।

ঝাড়বাগ্দার মাহান্তিদেরও মানবাজারের রাজদরবারে খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সুনাম সুযশ সুফল কম ছিল না। তাঁরাই ছিলেন রাজার দেওয়ান, সৈন্যাধ্যক্ষ, সুপরামর্শদাতা। যোদ্ধা হিসাবে কেউ কেউ কিংবদন্তি পুরুষ হয়ে আছেন। বরাবর বরাবাজারের রাজার দেওয়ানের কাজ করে এসেছেন বলে ঝাড়বাগ্দার একটি মাহান্তি পরিবারকে 'দেওয়ানঘর' বলা হয়ে থাকে। মাহান্তিদের মধ্যে ভীম মাহান্তি সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং সমাজে সুখ্যাত ছিলেন। সমৃদ্ধিশালী হিসাবে তাঁর পরিচিতির গভীরতা নিম্নলিখিত প্রচলিত ছড়াটির মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট হয়।

"কদৈল কদৈল মাজা,
ভীম মাইতি রাজা,
আমার কদৈল টিংযা।'

মাহান্তি সমাজের অপর প্রতিথযশা নামটি নিত্যানন্দ মাহান্তির। তাঁর বীর্যবত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহসিকতা আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। যে ঘটনার স্মৃতি মাহান্তি সমাজে তাঁকে আজও অম্লান করে রেখেছে—সেটি হচ্ছে বরাবাজার মানবাজার সীমানা বিরোধ, ঘটেছিল ইংরেজ আমলের আগে। বরাভূমের রাজা ছাউনি ফেলেছিলেন এক বিরাট বটগাছের নীচে—সঙ্গে দেওয়ান এবং পাঁচ হাজার ভূমিজ সেনা—হাতে তির, ধনুক, টাঙ্গি, তরোয়াল ইত্যাদি অস্ত্র। খবরটা যায় পাথরমহড়ার রাজার কানে। রাজা তো খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। ডাক পড়ল দেওয়ান সুবল মাহান্তির। নিত্যানন্দ মাহান্তি তখন রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ। নিত্যানন্দ মাহান্তি ছিলেন সুবল মাহান্তির ছোট ভাই। বরাভূমে মানবাজারের তুলনায় ভূমিজের বাস বেশি। পাথরমহড়ার ভূমিজ সৈন্যের সংখ্যা দু-হাজারের অধিক ছিল না। দেওয়ান রাজাকে আশ্বস্ত করে বললেন, নিত্যানন্দ আছে, আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই। সৈন্যরা সব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গিলাপে (মোটা চাদর) সিধা (রসদ) বেঁধে নিয়ে চলল যেখানে বরাভূমের রাজা ছাউনি ফেলেছেন সেইদিকে। নিত্যানন্দ মাহান্তিও সিধা বেঁধে নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে চললেন। সিধা দেওয়ানের ঘর থেকেই পাওয়া গেল। যুদ্ধে রাজা বা দেওয়ান কাউকেই যেতে দেওয়া হল না। নিত্যানন্দ মাহান্তি বরাভূমের সৈন্যদের অদূরে ছাউনি ফেললেন। যুদ্ধস্থলের চারদিকে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে বরাভূম সেনাদের ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছালেন। বরাভূমের সেনারা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তিনি সেই বেষ্টনীর মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। বরাভূমের সেনারা ঘেরা ক্রমশ কমিয়ে আনতে লাগল তাঁকে ধরবার জন্য। নিত্যানন্দ মাহান্তি কৌশলে সেই ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলেন। বরাভূমের রাজা, দেওয়ান এবং সৈন্যরা নিত্যানন্দ মাহান্তির বল, বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পেলেন। তাঁদের অন্তরে কিছুটা ভয়ের সৃষ্টি হল। পরে নিত্যানন্দ মাহান্তি একটা তার ছুঁড়েছিলেন সেই বৃহদাকার বটগাছের একটা ডালে, যেখানে বরাভূমের রাজা, দেওয়ান এবং সৈন্যরা ছাউনি ফেলেছিলেন। ডালটা ভেঙে পড়েছিল। বরাবাজারের দেওয়ান হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে,—

'নিত্যানন্দ মাইতির কাঁড়,
যার লাগে তার মাগ রাঁড়।
গাছে পড়ে তো দুধিভে'ড়া,
ভুঁয়ে পড়ে তো তার লাগ।

তিরের লেখা পড়ে তাঁরা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। রাজা স্বয়ং যুদ্ধে এসেছেন। যাঁর তির চালনায় এমন দক্ষতা, যাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ সেই তির দিয়ে যদি শুধুমাত্র রাজাকেই মেরে দেন তাহলেই তো

যুদ্ধ শেষ। বরাভূমের দেওয়ান ছিল মাহান্তি তিনি যুদ্ধ না করে সন্ধি করার পরামর্শ দিলেন। রাজা নিত্যানন্দ মাহান্তিকেই সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দিলেন। দুই দেওয়ানে মিলে সীমানা নির্ধারণের কাজ শেষ করলেন। 'দুধিভেড়া' কথাটির অর্থ আধভাঙা।

বরাভূমের রাজপরিবারে অঞ্চলের বাসিন্দা মাহান্তিদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সমাদর ছিল। মাহান্তিদের প্রতি রাজপরিবারের প্রগাঢ় আস্থা-বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে তাঁরা রাজপরিবারের ঘাট-শ্রাদ্ধও পালন করতেন; তাঁদের ডাক পড়ত। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, প্রত্যুৎপন্নমতি মাহান্তি দেওয়ানের পরামর্শে অনেক সময় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান। একটি কথিত ঘটনার উল্লেখ বিষয়টি সুস্পষ্ট করবে। সর্দারদের ধারণা ছিল বরাভূমের রাজা তাঁদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত। একবার কিছুসংখ্যক সর্দার রাজদরবারে এসে দাবি করল তাদের ছেলের সাথে রাজার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। রাজা পড়লেন মহা মুশকিলে। দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দেওয়ান তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। দেওয়ান সর্দারদের বললেন, 'তোমরা মহালের ভিতরে চল এ ব্যাপারে আলোচনা হবে।' এই বলে দেওয়ান মহালে ঢোকার একটি খিড়কি দিয়ে একে একে ঢোকার জন্য পরামর্শ দিলেন। দেওয়ান মহালের ভিতরে ঢুকলেন এবং একটি তরোয়াল নিয়ে খিড়কির আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলেন। সর্দাররা একে একে ঢোকে আর দেওয়ান তাঁদের তরোয়াল দিয়ে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত সর্দার যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা একজনও ফিরে যেতে পারেননি। বিয়ে করার দাবিও আর কোনোদিন ওঠেনি।

প্রাচীন মানভূমের কয়েকটি সমৃদ্ধ উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিবার ঃ-

ঝাড়বাগদার মাহান্তি—শিক্ষায়-দীক্ষায়, ঐশ্বর্য, সম্পদে একদা সমৃদ্ধ একটি প্রাচীন গ্রাম ঝাড়বাগদা। শ্রম, বুদ্ধি এবং কৌশলের দ্বারা এঁরা অনেক মৌজার অধিকারী হয়েছিলেন। শ্যামসুন্দরপুর পরগনার অর্ধেক অংশ এরা খরিদ করে নিয়েছিলেন। এঁরা তৌজিভুক্ত জমিদার ছিলেন। সরাসরি ব্রিটিশকে খাজনা দিতেন। মহাজনি করেও এঁরা প্রচুর সম্পদ করেছিলেন।

কাসমারের তেওয়ারি—কাসমার একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হরি তেওয়ারি নিজ উদ্যোগে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। শ্যামসুন্দর পর পরগনার অংশ খরিদ করে তিনিও একজন তৌজিভুক্ত জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

ভাগাবাঁধের পাত্র—ভাগাবাঁধ শিলাবতী নদীর উত্তর তীরের একটি গ্রাম। গ্রামটি ছিল সর্দারদের। পাত্ররা মাইতি দুবরাজপুর থেকে এসে সর্দারদের কাছে কিছুটা জমিজমা নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরে ভাগাবাঁধ মৌজাটি তাঁদের হয়। এ ব্যাপারে লোককবির অনুভূতি প্রণিধানযোগ্যঃ—

'গাঁকে আ'ল সরু শাঁকা,
ভূমিজ রানীর মন বাঁকা।
মৌজা বিকে দিলম শাঁকা,
মোজা গেলরে জনামর মতন,
ভূমিজ রানী শাঁকা প'রে লাও মনের মতন।'

তাছাড়া গুনিয়াদার পান্ডাদের উপর বাইদ মৌজাটি মামলা করে তাঁরা ডিক্রি পান। পান্ডাদের মধ্যে তখন ভাতৃবিরোধ চলছিল। একপক্ষ আত্মীয়তার সুবাদে ভাগ বাঁধওয়ালাদের সাহায্য করেছিল বলে শোনা যায়। পাত্ররা ব্যবসায়িক কারণে মাঝে মাঝে পাতকুমের দিকে যেতেন। এদিকে গেলে তাঁদের আড্ডা হত রাজবাড়িতে। রাজার সাথেও তাঁদের একটা হৃদ্যতা তৈরি হয়েছিল। একবার পাত্ররা পাতকুমের দিকে যাচ্ছিলেন, পুরুলিয়ায় এসে শুনলেন পাতকুমের রাজার জমিদারি খাজনা না দেওয়ায় নিলামে উঠেছে। তাঁরা খাজনা জমা দিয়ে জমিদারী রক্ষা করে রাজাকে

গিয়ে খবরটা দেন। রাজা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের কিছু মৌজা দেন। তিনি চান্ডিল দিতে চেয়েছিলেন এঁরা নেননি। শিক্ষায় দীক্ষায় এবং সম্পদে ভাগাবাঁধের পাত্রদের একটা সুখ্যাতি সমাজে তৈরি হয়েছিল।

বড়রার মাহান্তি—বরাবাজার সংলগ্ন বরাবাজারের দক্ষিণ দিকের একটি গ্রাম বড়রা। শোনা যায় বর্তমানে যেখানে বড়রা গ্রাম সেখানে আদিতে বরাভূমরাজের খামারবাড়ি ছিল। নাম ছিল খামারবেড়িয়া। বড়রা প্রতিপত্তিশালী গ্রাম। শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-সম্পদে, রুচিশীলতা, শৌখিনতায় সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। এই গ্রামেরই যাদব মাহান্তি, ঈশান মাহান্তি দুই সহোদর ভাই পুরুলিয়া জজকোর্টের এককালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী। তাঁদেরই বংশে শুভেন্দু মাহান্তি নারান মাহান্তি দীর্ঘদিন S.D.J.M কোর্টে বিচারকের কাজ করেছেন। এ বংশেরই বরাভূমরাজের দেওয়ান বংশীধর মহান্তির ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে গঙ্গানারায়ণ-বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, গঙ্গানারায়ণের বিধবা স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানকে লুকিয়ে রেখে ইংরেজের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, গেরিলা কায়দায় ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বিব্রত ইংরেজকে সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন, সে সমস্ত ঘটনা শুধুমাত্র শ্রুতিতেই থেকে গেছে পুরুলিয়া জেলার ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই হয়নি। তিনি যে নাবালক বরাভূমরাজের পক্ষে সন্ধিতে সই করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখমাত্র কোথাও পাওয়া যায় না।

মানভূমের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবার—জেড়া, জামদা, সিদাগড়া, সনাদ, বাগমার মাহান্তি, ষড়ঙ্গডির পাত্র, ভূনীর পাঠক, বড়ামের ষড়ঙ্গী, সরবেড়িয়ার মাহান্তি ইত্যাদি। ষড়ঙ্গীদের মধ্যে সমাজে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে গিরিজাশঙ্কর ষড়ঙ্গী, শশীভূষণ ষড়ঙ্গীর নাম করা যায়। উল্লেখ্য, মাহান্তিরা সকলেই মহাজনি এবং লাক্ষা চাষের দ্বারা প্রচুর সম্পদশালী হয়েছিলেন। জামসেদপুরে যখন প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় তখন তাঁদের কাছে শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করা হয়েছিল বলে শোনা যায়। অনুরূপ একটি প্রস্তাব সনাদর বলাই মহান্তির কাছে এসেছিল কিন্তু তিনি উক্ত শেয়ার কেনেননি বলে জানা যায়। বলাই মহান্তি একজন সদাচারসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লাক্ষা চাষের দ্বারা প্রচুর ধনসম্পদ করেছিলেন। লাক্ষাতে প্রচুর অর্থাগম হত বলে লাক্ষাকে নিয়ে যে প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে, 'লাহার টাকা তাহার কী?' শোনা যায়, বলাই মাহান্তি তাঁর সামাজিক পরিচিতি এবং ব্যক্তিত্বের কারণে পুরুলিয়া জজকোর্টের জুরি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পুরুলিয়া জজকোর্টের ব্যপ্তি-বিস্তারও কম ছিল না। একদা তার পরিধি উড়িষ্যার সম্বলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল [Sambalpur under the judgeship of Manbhum-Paper Book-1936.]।

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যটি যথাযথভাবে ফুটে ওঠে অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপির সপ্তম অনুচ্ছেদের ভাষার মধ্য দিয়ে—'obedience to mother and father, obedeince to elders, proper courtsey to friends, acquaintances, companions and relatives, to slaves and servants.'

পিতা-মাতা বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্যতা দেওয়া, বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়, পরিচিত ব্যক্তি, সঙ্গী-সাথী, দাস এবং ভৃত্যদের প্রতি যথাযথ সৌজন্যতাবোধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি আজও উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজে বহুলাংশে লক্ষ করা যায়। কয়েক দশক আগেও মা-বাবার জীবদ্দশায়, তাঁদের সঠিক পরিচর্যার কারণে সন্তানরা পারতপক্ষে যৌথ পরিবার ভেঙে পৃথক হতেন না। বর্তমানে বৃহত্তর সমাজে সুখী গৃহকোণের সন্ধান যৌথ পরিবার সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যে যে যুগান্তরকারী পরিবর্তন

এনে দিয়েছে তার ঢেউ উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজকেও যে আন্দোলিত করেছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। প্রথম সন্তান তা সে কন্যাই হোক বা পুত্রই হোক তার মান্যতায় একটি পর্ব উদযাপন উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠ সন্তানের পাঁচ বছর বয়স থেকে মান্যতা দেওয়া শুরু হয়, চলে পরবর্তী জীবিতকাল পর্যন্ত। ওই বিশেষ দিনটিতে কন্যার জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্যও নতুন বস্ত্রাদি পাঠাতে হয়। প্রথম সূচনাকালে কিছু বেশি লাগে মিষ্টির হাঁড়ি ইত্যাদি। পর্বটিকে জ্যেষ্ঠাষ্টমী বা পূঢ়া পরব বলে। সাধারণত ভাতৃদ্বিতীয়ার পরের অষ্টমীর পরবর্তী অষ্টমী এই পর্ব উদ্‌যাপনের দিন। জ্যেষ্ঠ সকলের জন্য নতুন বস্ত্র আনতে হয়। ঘরের ভিতরের একটি বিশেষ জায়গাকে গোবর ইত্যাদি দিয়ে শুদ্ধ করে আলপনা দেওয়া হয়। সেই আলপনা দেওয়া জায়গার উপর বস্ত্র পেতে পরিবারের সমস্ত জ্যেষ্ঠদের বসার জায়গা করা হয়। সকলে একসাথে সেই জায়গার উপর বসেন। এইভাবে বসাকে 'পূঢ়া বসা' বলে। এই উপলক্ষে ঘট স্থাপন, পঞ্চ দেবতার পূজা ইত্যাদি বৈদিক আচারের সঙ্গে কিছু লৌকিক আচারাদি পালন করা হয়। পূজাদি শেষ হওয়ার পর জ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ এবং আরতির পর্ব। বয়োজ্যেষ্ঠরা সকলেই আতপ-দূর্বা ইত্যাদি দিয়ে আশীর্বাদ করেন। মাতৃস্থানীয় যারা মুখের সামনে প্রদীপ ঘুরিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে আরতি করেন। 'পূঢ়া' শব্দটি প্রৌঢ় থেকে এসেছে বলে মনে হয়। উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজে জ্যেষ্ঠদের যে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানটি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জ্যেষ্ঠ বা সমাজে মান্যতা পাওয়ার যোগ্য বা জ্যেষ্ঠদের মান্যতা দেওয়া উচিত অনুষ্ঠানটি তার শিক্ষাসহায়ক বা অনুরূপ মানসিকতা তৈরির সহায়ক বলে মনে হয়।

উৎকল ব্রাহ্মণেরা সদাচারসম্পন্ন স্বধর্মনিষ্ঠ এবং আড়ম্বরহীন জীবনযাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। এঁরা অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন এবং কঠোর পরিশ্রমী। অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের ব্রাহ্মণেরা গবাদিপশু রক্ষণ ও পরিচর্যা থেকে শুরু করে চাষাদি বিবিধ পারিবারিক কর্ম নিজেরাই সম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের জীবনযাপনের এই পর্যায়টি দেখেই সম্ভবত তাঁরা মণ্ডল কমিশনের বিচারে O. B. C. হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন। উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা দু-পাঁচ দশক আগেও বিশেষ শুদ্ধাচারিতা মেনে চলতেন। বাজারের দোকান-হোটেলে কোনোদিন খাননি। ঘর থেকে শুকনো খাবার গামছায় বেঁধে নিয়ে আসতেন এবং প্রতিষ্ঠা করা পুকুরে জল খেতেন। জলশুচিদের হাতে ছাড়া কোনোদিন জলপান করেননি। এঁরা মূলত বিষ্ণুর উপাসক। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রভুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন কুলদেবতা আছেন। টিকি রাখা এবং আহ্নিকাদি করা এদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাবন্দনাও অনেকে করতেন ; মালাজপ করতেন। অনেকে নিরামিষ ভোজন করতেন। অনেকে মাছ খেলেও খাসি বা পাঁঠার মাংস খেতেন না। মুরগামাংস সমাজে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েরা কুলদেবতার ভোগ-রান্নাদির প্রয়োজনে খাসি বা পাঁঠার মাংস খেতেন না।

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা সম্পদশালী হলেও কোনোদিন পোশাক-আশাকে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেননি। এ ব্যাপারে কিছু কিছু গল্পও প্রচলিত আছে। একবার এক বিত্তশালী উৎকল ব্রাহ্মণ গেছেন কলকাতায় ট্যাক্সি কেনার জন্য। তাঁর পোশাক-আশাকের ধরন দেখে দালালের প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তিনি ট্যাক্সি কিনতে পারবেন। যখন ট্যাক্সির দরদাম পাকাপাকি হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর কোমরে বাঁধা টাকার তোড়া থেকে টাকাগুলি গুনে দিয়ে ট্যাক্সি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। দু-পাঁচ দশক আগেও সম্পদ থাকলেও উৎকল শ্রেণির ব্রাহ্মণ মহিলারা পারতপক্ষে পায়ে জুতো পরতেন না।

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে একই পদবির মধ্যে গোত্রগত বিভাজন দেখা যায়। সগোত্র ছাড়া একই পদবির ভিন্ন গোত্রে এঁদের বিবাহের চল ছিল। 'আটভাইরা, মহাপাত্র, মাহান্তি এবং

আটভাই ছাড়া উৎকল শ্রেণীর অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতেন না। কথিত আছে, কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের সময় উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ডাক পড়েছিল কিন্তু তাঁরা যাননি। তাঁরা উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন শ্রেণীভুক্ত এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন জনিত শুদ্ধতা যে আছে সে যে কথা জানিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হয়নি। আচার, বিদ্যা, বিনয় প্রভৃতি গুণে কৌলিন্যের উৎপত্তি। মিথিলায় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল, করেছিলেন হরি সিংহ, কর্ণাট দেশীয় অন্তিম রাজা, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদে। বাংলার কৌলিন্য মূলত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের প্রভাবিত করেছিল, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের প্রভাবিত করতে পারেনি।

পঞ্চাশ-একশো বছর পূর্বেও উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ বা সরকারি চাকরির প্রতি আকর্ষণ তেমন লক্ষ করা যায় না। এমনকি চাকুরি পাওয়া সত্ত্বেও সরকারি চাকুরি করতে দেওয়া হয়নি এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কথিত আছে, ঝাড়বাগদার ত্রিলোচন মাহান্তির ছেলে আশুতোষ মাহান্তি ডাক্তারি পাশ করেছিলেন এবং সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে সেই চাকরীতে যোগ দিতে দেননি। তখনকার দিনে উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজে যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না এমন নয় তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। উক্ত সময়কালের মধ্যে স্কুলশিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিরল নয়, তবে বর্তমানে যেমন প্রশাসন থেকে শুরু করে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুল-কলেজের শিক্ষক এমনকি পুলিশ বিভাগ যে চাকরি উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা পছন্দ করতেন না, তাঁরা ওই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে সর্বত্র চাকুরিরত অবস্থায় মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন পূর্বে তেমনটা ছিল না। তার কারণ পূর্বে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জমিদারি ছিল, মহাজনি ইত্যাদি কারবারের মধ্য দিয়ে প্রচুর বিত্তশালী হয়েছিলেন ফলে শিক্ষা-দীক্ষা, সরকারি চাকুরির প্রতি সমাজের কোনো সামগ্রিক ঝোঁক ছিল না।

তাঁদের সমৃদ্ধির ব্যাপারে বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত একটি সার্ভে রিপোর্টে জানা যায়,—"A great many Utkal Brahmins are grain traders and money lenders in rural areas. Many of them have made considerable fortunes out of the original cultivators by lending money on mortgages and selling up the mortgages.

It is they who are largely responsible for the dispositions of the Santals in the area, very few of the Utkal Brahmins are in white collor employments and some of them are big land owners in the South Western thanas of this district (-F. W. Rabertson-Final Report on the survey and settlement operations in the District of Bankura. 1917-1924, Calcutta-1926 QPP 12-13.)

কেউ কেউ বলে থাকেন, 'এঁরা বিদেশাগত বলেই হয়তো এঁদের কৃষিযোগ্য জমির প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি।' উৎকল ব্রাহ্মণেরা বিদেশাগত না ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তনের কারণে নিজভূমে পরবাসী—এ ব্যাপারে গভীর অনুসন্ধান এবং সুনির্দিষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয। বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোকপাত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। কৃষিযোগ্য জমির প্রতি উৎকল ব্রাহ্মণদের যে আগ্রহ তা বিদেশাগত বলে নয়, এই আগ্রহ সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ক্ষত্রিয় জমিদারেরা, তাঁরাই উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ভূমি, মৌজা ইত্যাদি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে জমির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। কাশীপুরের মহারাজা দ্রাবিড়াগত বেড়োর ব্রাহ্মণদের ৮৪টি মৌজা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ক্ষত্রিয় রাজা বা জমিদাররা ভরণ-পোষণের জন্য ব্রাহ্মণদের জমিদান করতেন। শাস্ত্রবিহিত উক্ত কর্মটি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

কাশীপুরের মহারাজ জ্যোতিপ্রসাদ অত্যন্ত দানী রাজা ছিলেন। শোনা যায় তিনি কাঁসাই পার পরগণায় উৎকল ব্রাহ্মণদের পাঁচখানি মৌজা নিষ্কর দান করেছিলেন।

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদা অতি-গোঁড়ামি বা সংস্কারপন্থী মানসিকতা উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে তার কিছুটা আভাস মিলতে পারে। বড়রার ঈশান মাহান্তির ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যাওয়ার কথা হয়েছিল। এ ব্যাপারে উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজের অনুমোদন দরকার। তখন উৎকল ব্রাহ্মণরা এক-একটা চাক্‌লা ধরে বাস করতেন। ঈশান মাহান্তির বাবা রাতুল মাহান্তি বরাভূম মুলুক ডাকলেন। ব্রাহ্মণরা প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন না। বললেন, 'দুদিক রাখা যায় না, হয় জাত না হয় ঈশানকে রাখতে হবে। রাতুল মাহান্তি জাতকেই রাখতে বাধ্য হলেন, ঈশানকে রাখতে পারলেন না। বর্তমানে অনেক উৎকল ব্রাহ্মণ ছেলে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আসছে—বিদেশ থেকে। উচ্চশিক্ষা নিয়েতে কোনো বাধা নেই। যুগধর্মের প্রভাবেই অনেক উৎকল ব্রাহ্মণ ছেলে উন্নত ধী-শক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা জেলার জল, মাটি, হাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। জেলার জনজাতিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তাঁদের প্রাচীনতা ছড়িয়ে আছে প্রচলিত ছড়ায়। প্রবাদে-কিংবদন্তিতে। যে কিংবদন্তিটি তাঁদের জেলার শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে সেটি নিম্নরূপ। কিংবদন্তিটি শিলাবতী নদীর উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে। কথিত আছে একদা জয় পান্ডা নামে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিলাবতী ছিল তাঁর পরিচারিকা। একবার জয় পান্ডা গঙ্গাস্নানে যেতে মনস্থ করলেন। যাবার দিন শিলাবতী বলল, 'ঠাকুর, আমার তো গঙ্গাস্নানে যাবার কোনো সম্বল নেই ; আমি কিছু উপচার তোমার হাত দিয়ে পাঠাব তুমি সেগুলো আমার নামে মা গঙ্গাকে দিয়ে দেবে।' ঠাকুর গঙ্গাস্নান করে ওঠার পর হঠাৎ তাঁর খেয়াল পড়ল শিলাবতীর দেওয়া পুঁটুলিটির কথা। ঠাকুর সেই পুঁটুলিটি গঙ্গায় ছুঁড়ে দিতেই অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, গঙ্গার মধ্য থেকে শুধু দুটি হাত উপরে এল এবং পুঁটুলিটা ধরে নিল। জয় পান্ডা দেখলেন শিলাবতী তো সাধারণ মেয়ে নয় নিশ্চয়ই কোনো দেবী। এই ভাবনা নিয়ে শিলাবতীর কথা ভাবতে ভাবতে ঠাকুর দ্রুত বাড়ি ফিরে আসছেন। শিলাবতীকে দিয়ে পরিচারিকার কাজ করিয়েছেন এই অপরাধবোধ থেকেই হয়তো শিলাবতীর জন্য তাঁর মনে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে তিনি দেখেন শিলাবতী কলসি নিয়ে জল আনতে গেছে। তিনি 'শিলাবতী' 'শিলাবতী' করে ছুটে যাচ্ছেন। শিলাবতী ঠাকুরকে দেখেন কলসিটি ভেঙে দিয়ে নদী হয়ে ছুটতে শুরু করল। জয় পান্ডাও শিলাবতীর পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে ইন্দপুর থানার চৈতন্যডিহিতে জয় পান্ডা নদীতে পরিণত হলেন। তালডাংরা ও সিমলাপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূতশহরের কাছে শিলাবতীর সাথে জয় পান্ডার মিলন হল। 'চারে গন্ডা, পাঁচে পন্ডা' ইত্যাদি ছড়ার এবং 'এক উড়িয়ায় গাঁ উজাড়, একবুড়িয়ায় বন উজাড়' ইত্যাদি প্রবাদের মধ্য দিয়ে উৎকল ব্রাহ্মণেরা জেলার জনজাতিদের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে আছেন।

জেলার উৎকল ব্রাহ্মণেরা মানভূমি ভাষায় কথা বলেন। পুরুলিয়ার সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ, ভাষাও তাই। পুরুলিয়ার ভাষা এবং সংস্কৃতিতে উৎকলীয় প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে। যোহন্ন, রেহেল্লা, ফরি নানা নানা ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে যেগুলি ওড়িয়াগত। কেউ কেউ বলে থাকেন যাজপুর ধর্মপূজার আদিকেন্দ্র। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তা উৎকল ব্রাহ্মণবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক কারণ যাজপুরে উৎকল ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য এবং বসতি অনেক প্রাচীন। সন্দেহটি আরও দানা বাঁধে যখন জানা যায়, 'ধর্মমঙ্গলের লাউসেন এক

কলিঙ্গ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। বোধহয়, বাঁকুড়া জেলার বর্তমান সিমলাপালের রাজবংশের। এই বংশ অদ্যাপি। বর্তমান ইহাতে মনে হয় বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ কলিঙ্গ দেশ বিবেচিত হইত। [যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বঙ্গাব্দ, ১৩৪০, দ্বিতীয় সংখ্যা]

সাত শতকের শুরুতে উত্তর ও দক্ষিণ তোষালি মিলিয়ে উড়িষ্যার সমগ্র উপকূলভাগ, মানভূম, সিংভূম, মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর মহারাজ শম্ভুযশের শাসনাধীন ছিল। কেউ কেউ অনুমান করেছেন ওই সময় উড্রজাতির বসবাস ছিল মানভূম-সিংভূম অঞ্চলে [Studies Etc. Dr. D. C. Sarkar P. 145] তাছাড়া অনন্তবর্মন চোড়-গঙ্গের অপারমন্দার অভিযানেব ফিরতি পথে অনেক ওড়িয়া সৈন্য এতদঞ্চলে থেকে যান এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ইতিহাসে উল্লিখিত দেখা যায়। সেই সমস্ত সৈন্যরা উৎকল স্মারকটি হারিয়ে মিশ্রণের স্রোতে কোথায় বিলীন হয়ে গেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে এতদঞ্চলের জনবিন্যাসে তাঁদের তথা উৎকলীয় প্রভূত পরিমানে থেকে গেছে তাছাড়া তাদের বাহিত উৎকলীয় সংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ দ্বারা এতদঞ্চলের সংস্কৃতি যে পুষ্ট সেকথা ও অস্বীকার করা যায় না।

এতদঞ্চলের কিছু কিছু গ্রাম-নামের সঙ্গে উড়িষ্যার কোনো কোনো গ্রাম-নামের অভূতপূর্ব সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। হুড়া থানার চন্দনাপুর অনুরূপ একটি গ্রাম- নাম। যার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ভুবনেশ্বর পুরী রাজপথে পুরে থেকে ১০ কি.মি. দুরের চন্দনপুর গ্রামের। পুরুলিয়ার কেন্দা বা কুদা গ্রাম নামের সঙ্গে উড়িষ্যার কেন্দ্রা গ্রাম নামের যথেষ্ট মিল আছে। উৎকলীয় নাম সিমলিপাল থেকে সিমলাপাল; খানতাড়া থেকে খাতড়া নামটি এসেছে ভাবা খুব একটা অমূলক নয়। জগমোহনপুর, বলরামপুর এগুলি উৎকল প্রভাবিত নাম। ছিরুডি/চিরুডি গ্রাম-নাম উড়িষ্যায় থাকা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। উৎকল ব্রাহ্মণদের পত্তনিকৃত কিছু কিছু গ্রাম-নাম যেমন—পতিডি, ষড়ঙ্গীডি ইত্যাদি উৎকলীয় সংস্কৃতির স্মারক হয়ে আছে। তাছাড়া জেলায় উড়িষ্যার আদলে মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নির্মাণে উৎকল শিল্পীদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের মধ্যে উৎকল ব্রাহ্মণেরা যে ছিলেন না তা সহজে বলা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকেন এতদঞ্চলের জনজাতির সংস্কৃতির সঙ্গে উৎকল ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেননি। একথা যে কতখানি অমূলক উপরোক্ত তথ্য থেকে তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। তাছাড়া এতদঞ্চলের জনবসতি বিন্যাসে উৎকলীয় প্রভাব যে প্রভূত পরিমাণে রয়েছে তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব-পুরুষেরা আদিতে উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেখান থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রথমে শ্রীহট্টে এসেছিলেন। মাহান্তীদের কেউ কেউ বলে থাকেন তাঁরা মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরী ছেড়ে এই অঞ্চলে এসে বসবাস করছেন। চৈতন্য প্রভুর সময়কাল ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ।

উৎকল ব্রাহ্মণ মহিলারা কাঁথাশিল্পে অত্যন্ত দক্ষ। প্রাচীনারা কাঁথার উপর পাখি, পদ্মফুল, লতাপাতা ইত্যাদি চিত্র আঁকতে পারতেন। বর্তমানেও কাঁথায় সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ তাঁরা করতে পারেন। রঙিন সূতা দিয়ে কিছু কিছু ছবিও তার উপর তোলেন। উৎকল মহিলারা স্বাদিষ্ট এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পিঠা তৈরিতেও খুব পটু। আলপনা এবং দেওয়াল অলঙ্করণেও তাঁরা পটু। বিশেষ করে অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেওয়ালে পট অঙ্কনে তাঁদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা যে কান্যকুব্জ শাখার অন্তর্গত তার উল্লেখ মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া

যায়—যেখানে নাম, গোত্র ইত্যাদি উল্লেখের প্রয়োজন সেখানে প্রথমেই বলা হয় 'যজুর্বেদান্তর্গত কান্বশাখৈ দেশাধ্যায়ানে, ...ইত্যাদি। শ্রাদ্ধের কাজে লোকাচারে উড়িয়া ভাষার সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় 'কিমাপছু? শুভাশুভমাপছু।' অন্যত্র বচনে কোথাও উড়িয়া ভাষার লেশমাত্র নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্তমানে উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজ বরপণ রূপ দারুণ ব্যাধিতে ভুগছে। জমিদারি নেই, মহাজনিও বন্ধ হয়ে গেছে। সাধারণ পাত্রের পণ এক দেড় লাখ টাকা-পাত্র চাকুরে হলে পণ চার-পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠেছে কেউ কেউ ব্র্যাঙ্ক চেক দিতেও রাজি বাড়তি আসবাবপত্র। দরিদ্র পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে জমিজমা বিক্রি করে নিঃশেষ হতে হচ্ছে। সমাজ দুর্বল হচ্ছে, সামাজিক কোনো চেতনা নাই। কয়েক দশক আগে পণপ্রথা বন্ধের সামাজিক আন্দোলন হয়েছিল। শিক্ষিত যুবসমাজ পণ না নিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বছর খানিক স্থায়ী হয়েছিল। সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে নজর দেন তাহলে একটি সমাজ অবক্ষয়ের হাত থেকে বেঁচে যায়।

তথ্যসূত্র :

(১) বাঁকুড়া— তরুণদেব ভট্টাচার্য।
(২) পুরুলিয়া— তরুণদেব ভট্টাচার্য।
(৩) দামুন্যা কপিশা শিলাবতী— শক্তি সেনগুপ্ত।
(৪) সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (প্রথমখণ্ড)— ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।
(৫) দেবদেবীর স্বরূপ মূর্তিপূজা ও বাহন রহস্য— অমরেন্দ্রনাথ সাহা।
(৬) শ্রী ব্রহ্মানন্দ মাহান্তি— কুঢ়াব বাইদ্, মানবাজার।
(৭) শ্রী নারান মাহান্তি, শ্রী শুভেন্দু মাহান্তি— বড়রা, ববাবাজার।
(৮) শ্রী জগদীশ মাহান্তি— ঝাড়বাগ্দা, মানবাজার।
(৯) শ্রী গোপাল মাহান্তি— সনাদ, ববাবাজার।
(১০) শ্রী অশোক পতি—কুমরা বাইদ, হুড়া।
(১১) সারহুল পত্রিকা।
(১২) দক্ষিণবঙ্গ ব্রাহ্মণ কল্যাণ সমিতি (কংসাবতী)।
(১৩) শ্রী বসন্ত মাহান্তী—দামদা, বরাবাজার।
(১৪) শ্রী অশোকপতি— পতির ডাঙ্গা, ইন্দপুব (বাঁকুড়া)।

পুরুলিয়ার খেড়িয়া-শবর সমাজ

ড. সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শবরগোষ্ঠী পুরুলিয়া জেলার প্রাচীনতম অধিবাসী। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কিছু অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতেই এঁদের প্রধান বাসভূমি। এই জেলায় তাঁরা খেড়িয়া নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও এঁরা আজও ভূমিহীন। এঁদের সামাজিক প্রথা আজও বিদ্যমান—কেননা এঁরা আজও অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে আলাদাভাবে বসবাস করেন। কয়েকটি ঘর নিয়ে এঁদের গ্রাম যেগুলি খেড়িয়াখাড়া নামে পরিচিত।

এই ভূমিহীন অধিবাসীরা ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকারের আদেশ অনুসারে "অপরাধপ্রবণ জাতি" হিসেবে ঘোষিত হয়। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশের দশকে ভারত সরকার এদের 'বিমুক্ত জাতি' বলে ঘোষণা করেন।[১] মেদিনীপুরের লোধা-শবর ও পুরুলিয়ার খেড়িয়া-শবর এই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। লোধা ও খেড়িয়ারা নিঃস্ব কিন্তু আজও অনেকের চোখে সে অপরাধী। ভয়ংকর দারিদ্র এঁদের সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

খেড়িয়া-শবর পরিচিতি : প্রাচীন ও মধ্যযুগে পুরুলিয়া জেলা ছিল, শাল, পলাশ ও মহুয়াতে ঘেরা এক জঙ্গলময় অঞ্চল। পুরুলিয়ার আগে জেলার নাম ছিল মানভূম এবং তার আগে মঙ্গলমহল জেলা। অনেক দূর পর্যন্ত ছিল এর বিস্তৃতি। তারও পূর্বে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই অঞ্চল বঙ্গদেশের মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত ছিল—যার সদর-দপ্তর ছিল তাম্রলিপ্ত। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে দেখা যায় যে বঙ্গদেশের ১৯টা সরকারের মধ্যে মান্দারণ ছিল অন্যতম।[২] মান্দারণ সরকারের মধ্যে ছিল বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ বর্ধমান, পশ্চিম হুগলি, শিখরভূম (পঞ্চকোট), ধলভূম ও সিংভূম।[৩] সুলতান ফিরোজ শা তুঘলক ১৩৬০ সালে ওড়িশ্যা আক্রমণকালে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৪] আজকের খেড়িয়া-শবরেরা ছিলেন এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্তান। এরই প্রভাবে তাঁরা সারল্যের প্রথম পাঠ প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা করেছিলেন। সেদিনকার বনভূমির অস্তিত্ব আজ নেই, কিন্তু সেই মানবগোষ্ঠী আজও বিদ্যমান। এই মানবগোষ্ঠী চরিত্রে আজও বন্যপ্রাণীর মতো। এঁরা আজও আকৃতিতে জংলী এবং প্রকৃতিতে বুনো। এঁরা আজও বনভূমির মায়া কাটাতে পারেন নি। আজও তাঁরা মনুষ্যসৃষ্ট সভ্যতার জালে বাঁধা পড়েননি। কিন্তু আজ পুরুলিয়া জেলা শাল-পলাশে ভরা নয়, আজ সে রুক্ষ ও খরা কবলিত। বন-জঙ্গল কোন কোন স্থানে টিকে থাকলেও বন্যপ্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে। সেদিনকার বন্যপ্রাণী যেমন আজ বিপন্ন, তেমনি খেড়িয়া-শবরদের অস্তিত্বও আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। ফলে আজ আর বনে-জঙ্গলে সহজলভ্য খাদ্য পাওয়া যায় না। খেড়িয়াদের অস্তিত্ব আজ এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মানভূম জেলা থাকাকালীন ব্রিটিশ সরকার ছোটনাগপুরে স্বভাব দুর্বৃত্ত আইন (Criminal Tribal Act) চালু করেছিল। এর ফলে শবরেরা যেখানে-সেখানে আক্রান্ত হতেন। সেই সময় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ও ১১০ ধারায় খেড়িয়ারা ধরা পড়তেন। ফলে তাঁরা সাধারণ গ্রাম থেকে দূরে বসবাস করা শুরু করলেন। ছোট ছোট ছেলেরা গোচারণের কাজে লেগে গেল। তীর-ধনুক চালনায় তারা বিশেষ পটু ছিল। এঁদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও এঁরা বাংলাভাষাতেই বেশি রপ্ত। গাছের পাখি মারা ছিল এদের প্রধান কাজ। গাছের মহুয়া সংগ্রহও ছিল এদের জীবিকার অন্যতম। বনের ভেলা ও পিয়াল এদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বনের ভেলা থেকে এঁরা তৈলবীজ তৈরি করতেও জানতেন।[৫]

রামায়ণের যুগে আমরা "শবরীর" উল্লেখ পাই। একজন নিরক্ষর বনবাসীর হৃদয়ে কীভাবে এই চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল, তা আজও আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শবরী নিজ সাধনাবলে জেনেছিলেন যে শ্রীবিষ্ণু সপ্তম অবতারে দশরথনন্দন রামচন্দ্ররূপে এই ধরায় অবতীর্ণ হবেন এবং পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে আসবেন। সেই শুভদিনেব প্রতীক্ষায় শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য শবরী কিছু বনফল সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তিনি ফলগুলি খেয়ে দেখতেন কোন ফল মিষ্ট, আর কোন ফল টক। উচ্ছিষ্ট মিষ্টি ফলগুলি শবরী যত্নসহকারে তাঁর ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের জন্য তুলে রেখেছিলেন। অবশেষে সত্যই একদিন শবরীর জীর্ণ কুটীব শ্রীরামচন্দ্র সস্ত্রীক নিজ অনুজসহ উপস্থিত হলেন। শ্রীবামচন্দ্র শবরীর শ্রদ্ধার দান উচ্ছিষ্ট ফলগুলি পরম তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করলেন। শবরী এক নীচ জাতি বলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে উপেক্ষা তো করেনইনি, বরং তাঁর উচ্ছ্বসিত মহিমা কীর্তন করেছিলেন।

রামায়ণের যুগ থেকেই শবরেরা পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন। এই সম্প্রদায় অখণ্ড মানভূমের বান্দোয়ান, বরাহবাজার, মালবাজার, হুড়া, পুঞ্চা, পটমদা, ইচাগড় চাণ্ডিল প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করেন। এরা পশুপাখি শিকার করে, মধু সংগ্রহ করে, ডোবা নদী নালাতে মাছ ধবে দিনযাপন করেন। বাঁশ, কঞ্চি, কুলো, মাছ ধরার পলুই, শিয়াড়া, বাঁশের ছাতা, ঘুঘু মারার ফাঁদ ইত্যাদি তৈরি করা এদের পেশার মধ্যে পড়ে। ফল, মূল, কন্দ, পানিফল ইত্যাদি এঁদের খাদ্য। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে এরা ফলমূল ছাড়াও পাখির বাচ্চা, ঢ্যামনা সাপ, গোইসাপ, ব্যাঙ, শামুক ইত্যাদি খাদ্য গ্রহন করেন। ঢ্যামনা সাপ এঁদের প্রিয় খাদ্য। খেড়িয়াদের গায়ের গন্ধ পেলেই ঢ্যামনা সাপ কেঁচোর মত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এঁরা ক্ষেত থেকে নানাপ্রকারের ব্যাঙ, শামুক, মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি খেয়ে থাকেন। শীতকালে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে এঁরা ধানক্ষেতের আইল থেকে ইঁদুর ও গর্তের ধান সংগ্রহ করেন। একাজে শবর মেয়েরাও সমান পারদর্শিনী। শবর নারীদের দেহে আসুরিক শক্তি আছে। বসন্তকালে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে এরা স্থানীয় ফল সংগ্রহ করে। এইসময় এঁরা মধু সংগ্রহ করে বেড়ান। মৌচাকের ডিম সহ মৌচাক এঁদের খাদ্য। এছাড়া এঁরা বন্য পশুও শিকার করেন। শেয়াল, হুড়ার, খরগোস ইত্যাদির মাংস এঁদের প্রিয় খাদ্য।

বন্য পবিবেশে লালিত-পালিত খেড়িয়া-শবরেরা প্রকৃতির কোলের সন্তান। অনাবৃত দেহে রোদ, বর্ষা, শীতকে উপেক্ষা করেও এঁরা সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। এঁরা লম্বায় সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় ফুট পর্যন্ত, মাথা গোল ও নাক চেপ্টা হয়। এঁদের পায়ের পাতা বেশ শক্ত। এদের দেখলে মনে হয় যে ঐ শরীরে অসুরের শক্তি আছে।

শবরেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য কোন ঘর-বাড়ি করেন না। এঁদের ঘর সাধারণত

নয়-দশ ফুট উঁচু, ছয়-সাত ফুট লম্বা, মাটির দেওয়াল সামান্য খড় বা তালপাতা দিয়ে তৈরি থাকে। ঘরের দরজা অত্যন্ত ছোট অনেক সময় হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। ঘরের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকটা মাটির ভাঁড় ছাড়া আর কিছু থাকে না। এঁদের বেশভূষা একান্তভাবে আদিম। পুরুষদের সারা দেহ উলঙ্গ, কোমরের নীচে একফালি ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় দিয়ে এঁরা নগ্নতা ঢেকে রাখেন। প্রচণ্ড শীতের দিনেও এঁদের গায়ে কাপড় থাকে না। মেয়েদের সাজসজ্জাও তথৈবচ। মাথার চুল রুক্ষ-সুক্ষ, তেলবিহীন। কোমর থেকে হাঁটু অবধি একফালি কাপড় দিয়ে শরীরের সামনের দিক ঢাকা থাকে। এঁরা স্বামী-স্ত্রীতে সারাক্ষণ একসাথে থাকা পছন্দ করেন। পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি সক্রিয় ও বুদ্ধিমতী। লোকালয় বা গ্রামে এরা খুব আসেন না। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হলে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের খাবার জোগাড় করেন।[৬]

খেড়িয়া-শবরদের সামাজিক জীবন আদিবাসীদের মতো। এখন এঁরাও হিন্দু সমাজের পালাপার্বনে যোগদান করেন। শিবের গাজন, মনসা পূজা, গ্রামদেবতার পূজা এঁরাও করেন। ডাইন-ভূতে এঁদের অটুট বিশ্বাস। বনের লতা-পাতার শিকড় দিয়ে এঁরা ঔষধ তৈরি করেন। তসর গুটি থেকে সুতা প্রস্তুত করতেও এঁরা পারদর্শী। মাঘী- পূর্ণিমাতে এঁরা হাঁস ও মুরগি বলি দিয়ে থাকেন। এছাড়া এঁদের মধ্যে কালীপূজারও প্রচলন আছে। এঁদের পূজা-অর্চনা বা বিবাহউৎসবে কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। উৎসব-অনুষ্ঠানে এঁরা মদ্যপান করেন।

এঁদের বিবাহের রীতি-নীতিও এক মজার ব্যাপার। প্রথমে ছেলে কুটুম ঘর যাচ্ছি বলে মেয়ের বাড়ি যান এবং গোপনে মেয়েটাকে দেখেন। পছন্দ হলে বাবা-মা, কাকা-কাকিমাকে ঐ বাড়িতে পাঠান। তাঁরা গিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করেন। এরপর মেয়ের বাড়ি থেকে শবরেরা বিহানকে দেখার নাম করে ভাবী জামাই বাড়ি যান। সামর্থ অনুযায়ী সেখানে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। বরপক্ষ থেকে মা-শাড়ী, শাল, ধুতি, বাবা-ধুতি, মেয়ের শাড়ী-সায়া ও জামা দেওয়া হয়। এছাড়া বরপক্ষ বরযাত্রী নিয়ে যেতে তিন চার বারে আট-দশ মণ চাল, সাত-আট হাজার বিড়ি, চা পান খরচ ইত্যাদি যোগান দিয়ে থাকে।[৭] বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সামনের এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাচের আয়োজন করা হয়। ঐ সময় বাঁশী বেজে উঠে ও ধামসা-মাদলে ঘা পড়ে। রঙীন নেশায় শবরীদের চোখে মাদকতা ফুটে উঠে। বাজনার তালে তালে তাদের শরীর ও মন দুলতে থাকে। পুরুষেরাও নাচে তাদিকে সাহায্য করে। নাচের আসর ভাঙতে ভাঙতে সকাল হয়ে যায়। এরপর কন্যা বিদায়কালে মেয়েরা সমবেতভাবে গান গায়।[৮]

ছোটভাই বড়ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু বড় ভাইয়ের কাছে ছোট ভাইয়ের বিধবা কন্যাসদৃশা।[৯] কন্যা-সন্তান এঁদের কাছে অবাঞ্ছিত নয়। কন্যাপণ দেওয়ার প্রথা আছে। সম্বন্ধ বিবাহ ও প্রেমজ বিবাহ দুইই অনুমোদিত। বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বির্বাহ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই অনুমোদিত। বিধবার পুনর্বিবাহ, প্রেমজ বিবাহ বা বিবাহবিচ্ছেদ খেড়িয়া সমাজে আইন করে প্রচলিত করতে হয়নি। তাঁদের সমাজস্রষ্টারা জেনেছিলেন যে এরকম হতেই পারে। শবর সমাজে বধূহত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, মেয়েকে বোঝা মনে করা—এ সমস্ত সভ্য সমাজভুক্ত জিনিসগুলি একেবারেই নেই।

মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে খেড়িয়া-শবরদের ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে পুরুলিয়া অঞ্চলেও দেখা দিয়েছিল স্বাধীনতালাভের নতুন জোয়ার। এই জোয়ারের মূলস্রোতে খেড়িয়া-শবরদের নিয়ে আসার কথা অনেকে উপলব্ধি করতে

শুরু করেন। ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি ঝালদা শহরে মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। এই সময় মানভূমের জননেতা ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত 'মুক্তি'-পত্রিকায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখায় রাজদ্রোহীর অভিযোগে হাজারীবাগের কেন্দ্রীয় কারাগারে অবরুদ্ধ হন। নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র ঘোষের উপদেশ ও পরামর্শক্রমে রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ মানভূম কংগ্রেস সংগঠনের উদ্দেশ্যে বরাহনগর থানার জাহানাবাদ গ্রামে রামু শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কিছু সংখ্যক শবরকে নিয়ে এক শবরগোষ্ঠী গঠন করেন।

মানভূম জেলার এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সুদূর ঢাকার বিক্রমপুর থেকে শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি মাস্টার মশায় নামে পরিচিত ছিলেন) এসে উপস্থিত হন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব মানভূমে শবর-খেড়িয়াদের উন্নতির কাজ শুরু করেন। পুঞ্চা থানার ভূতাম, বাগ্‌দা ও পাঁকবিড়রা গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁকে একাজে সাহায্য করেন পুঞ্চা থানার বাগ্‌দা গ্রামের ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপালপুর গ্রামের জ্ঞানদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। এরা পুঞ্চা, বান্দোয়ান ও পটমদা থানাতেও কাজ শুরু করেন। খেড়িয়াদের উন্নতিকল্পে এইসময় জাহানাবাদ গ্রামে "অতুলাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়। খেড়িয়া-শবরদের কানু শবর, রাম শবর[১১] ও লছু শবর এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাগ্‌দা গ্রামের ভোলানাথবাবুর চেষ্টায় দামোদরপুরের খোকা শবর উৎসাহিত হয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার জন্য সর্বপ্রথম চুরি-ডাকাতি পরিত্যাগ করা এবং মদ্যপান বর্জন করার শপথ গ্রহণ করেন।[১২] জাহানাবাদের ধনঞ্জয় মাহাত এবং বরাহবাজারের হীরু সিং সর্দার একাজে শ্রীশবাবু ও ভোলানাথবাবুকে সাহায্য করেন। শবর-খেড়িয়াদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা, মাদক দ্রব্য- পরিহার, কার্পাস চাষ, চরখার প্রচলন ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। শবর সমাজকে স্বাবলম্বী করে তোলাই এইসব কাজের উদ্দেশ্য ছিল।

এইসময় ১৯৩২ সালে বান্দোয়ান থানার ঘাগকচা গ্রামে কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলনে অনেক শবর যোগদান করেন। রেবতীবাবু এই গ্রামের শবরগণকে সংগঠন করেছিলেন। দুইদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে অতুলচন্দ্র ঘোষও যোগদান করেছিলেন। ফলে শবরগণকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে বাদায়ান থানার দারোগা মড়িরাম শবরের খোঁজে এসে তাঁর স্ত্রীকে একটি গাছের নীচে ফেলে দেয়। ঐ গাছের উপরই মড়িরাম শবর ছিলেন। মড়িরাম তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে নেমে দারোগার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে তাকে গাছের সাথে বেঁধে ফেলেন। শেষে অনেক অনুনয়ের পর দারোগা নাখে খৎ দিয়ে কোনক্রমে প্রাণে বাঁচে। পরে অতুলবাবুর নির্দেশে মড়িরাম রিভলবার সহ পুরুলিয়া থানায় আত্মসমর্পণ করেন। বিচারে মড়িরামের জেল হয় এবং জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।[১৩]

ব্রিটিশ আমলে খেড়িয়া-শবরদের উপর পুলিশী অত্যাচার ছিল এক নিয়মমাফিক ব্যাপার। এই পুলিশী অত্যাচার থেকে শবরকুলকে রক্ষা করার জন্য রেবতীবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রেবতীবাবু আঁকড়োর জঙ্গলে বসবাসকারী শবরগনের মধ্যেও সংগঠন তৈরি করেন। আঁকড়ের সম্মেলনে অতুলচন্দ্র ঘোষ চুনারাম ছাড়াও স্থানীয় শবরগণকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১৪]

১৯৩৭ সালে নবনির্বাচিত বিহার বিধানসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়। বিহার বিধানসভায় মানভূমের প্রতিনিধিরা শবরদের উন্নতির জন্য এবং তাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকার তা অনুমোদন করে প্রশাসনকে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। প্রশাসন মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সাথে যোগাযোগ করে শবরগণকে বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। সেই সঙ্গে সংলগ্ন সামান্য

জমি তাঁদিকে চাষের জন্য দেওয়া হয়। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা সমাজবদ্ধভাবে গ্রামের পাশাপাশি বসবাসের সুযোগ পান। ফলে তাঁদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগ্রত হয়। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে ইংরেজদের পুলিশ কেবল তাঁদের উপর অত্যাচারই করেছে। কাজেই এই অবস্থায় কংগ্রেস সংগঠনে শক্তিশালী করলে শবর সমাজেরই উন্নতি হবে।

১৯৪২-এর "ভারত ছাড়" আন্দোলনে শবরদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ৯ই আগস্ট বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অবিলম্বে মানভূম থেকে অতুলচন্দ্র ঘোষ ও বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত যোগদান করেন। কংগ্রেস "ভারত ছাড়" প্রস্তাব পাশ করলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে। ফলে মানভূমের নেতারাও গ্রেপ্তার হন। ১০ই আগস্ট পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে আন্দোলন অহিংস থেকে সহিংস আকার ধারণ করে। জেলার বিভিন্ন স্থানে রেলপথ অপসারণ, পুল-ভাঙা, টেলিগ্রাফের তার কাটা, মদভাটি পোড়ানো ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু হয়। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে আন্দোলনকারীরা সমবেত হন। এই সম্মেলনে প্রকাশ্যেই ধ্বংসাত্মক কাজ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর বরাহবাজার, মালবাজার, বান্দোয়ান, হুড়া ও পুঞ্চা থানায় একযোগে কাজ শুরু হয়। মালবাজার থানার আন্দোলনকারীরা থানায় প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই চূণারাম মাহাত মৃত্যুবরণ করেন। গোবিন্দ মাহাত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখানে তাঁরও মৃত্যু হয়। এছাড়া পটমদা থানার কুমীর গ্রামে লক্ষনণ মাহাত আহত হলে তাঁরও একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়।[১৫]

জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে পুরুলিয়ার সরকারি কোষাগার দখল করার পরিকল্পনা করা হয়। সমবেত জনতাকে খাওয়ানোর জন্য ১২ মণ চাউলের ভাত রান্না করা হয়েছিল। উত্তেজিত শবরগন এইসময় রেবতীবাবুর নেতৃত্বে দলে দলে এই আন্দোলনে যোগদান করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। বরাহবাজার থানার আন্দোলনকারীরা থানার দুইজন সিপাহী ও একজন দারোগাকে বন্দী করে। পূবর্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শবরেরা এদিকে হত্যা করতে চাইলে কয়েকজন আন্দোলনকারী শবরগণকে নিরস্ত করেন। এই ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশ অনেক শবরকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। এইসময় যে সব শবরগণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁরা হলেন বরাহবাজার থানার জাহনাবাদ গ্রামের কানু শবর, লছু শবর ও রামু শবর। জিলিং গ্রামের লেংড়ু শবর, উদ্ধব শবর ও বিদ্যা শবর। পুড়িহাগা গ্রামের সনা শবর। হেরবনা গ্রামের যদু শবর, পীতম শট্টর, মন্টু শবর, সাবু শবর, রঘুনাথ শবর, জয় শবর ও চৈতন্য শবর। এছাড়া আরও অনেক শবরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেয়।[১৬]

৪২-এর আন্দোলনে পুরুলিয়ার কিছু বন্দীদের ভাগলপুর জেলে, আবার কিছুসংখ্যককে পাটনা ক্যাম্প জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এইসময় মানভূম জেলার কংগ্রেস সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ হাজারিবাগ জেলে ছিলেন। এই আন্দোলনে যে সমস্ত শবর অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেককেই জেলে বন্দি করা হয়। এঁদের মধ্যে বান্দোয়ন থানার ঘোলছড়া গ্রামের রাধা শবরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনে মদভাটি পোড়ানোর অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অনুরূপভাবে বরাহবাজার থানার হেরবনা গ্রাম থেকে মঙ্গল শবর, শম্ভু শবর, পীতম শবর, যদু শবর ও হাগরু শবরকে বন্দি করা হয়। এছাড়া বরাহবাজার থানা পোড়ানোর সাথে যুক্ত সন্দেহে বিদু খেড়িয়া ও নেগড়ু খেড়িয়াকে জেলে বন্দি করা হয়েছিল।[১৭]

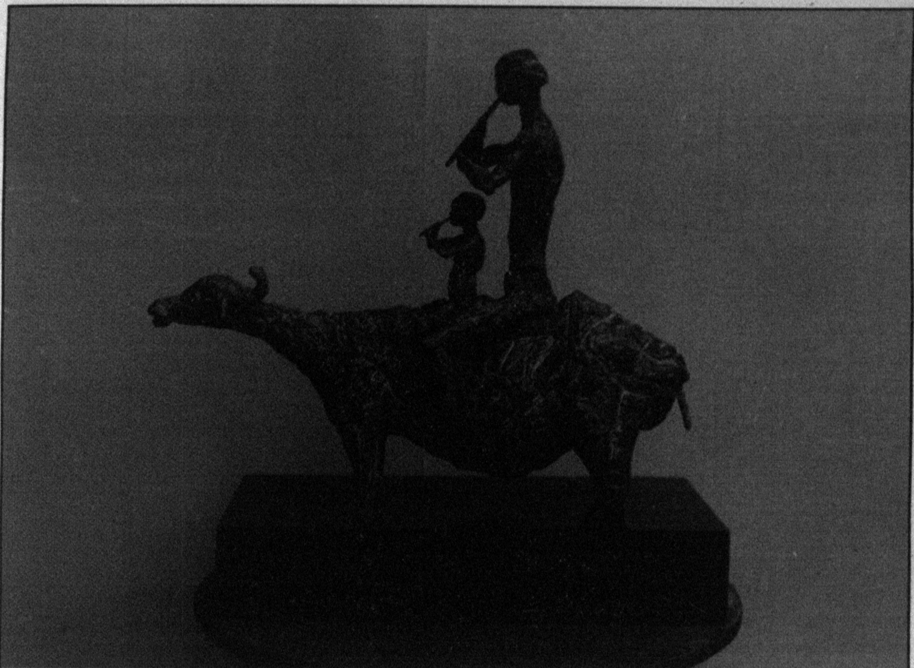
খেড়িয়া-শবরদের মধ্যে অনেকেই আমাদের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অশেষ দুঃখ-



নাটুয়া নাচ



বিরহড়দের জন্য পঞ্চায়েত নির্মিত গৃহ



পুরুলিয়ার শিল্পীর ভাস্কর্য



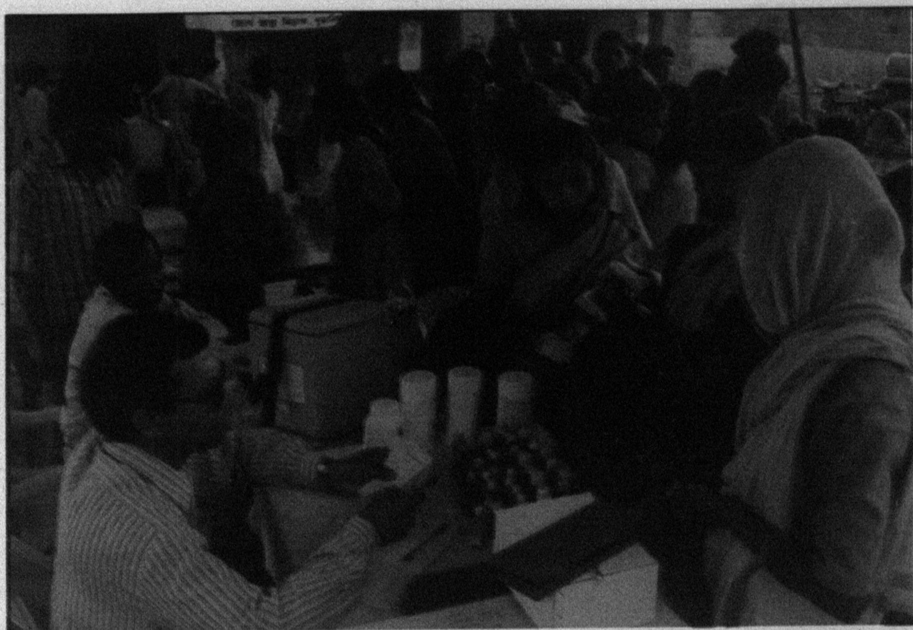
আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পে স্বল্পমূল্যের বাসগৃহ (ঝালদা)



রেডক্রস সোসাইটির হুইল চেয়ার বিতরণ



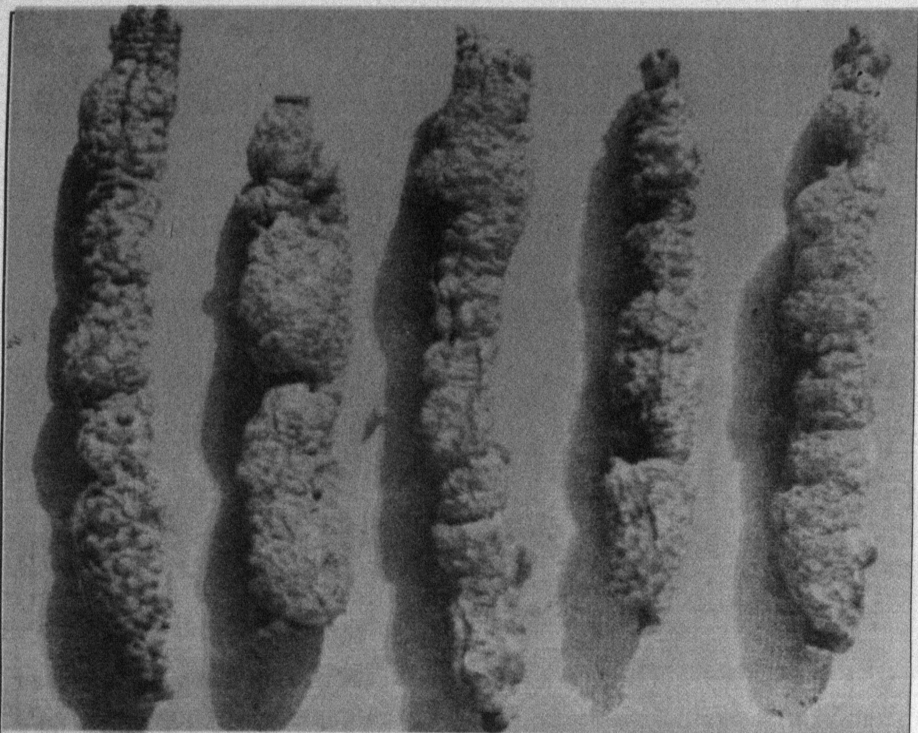
সাহেব বাঁধ



আদিবাসী পল্লীতে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির



শবরদের বস্ত্রদান করছেন জেলাশাসক


ছড়ি, লাক্ষা

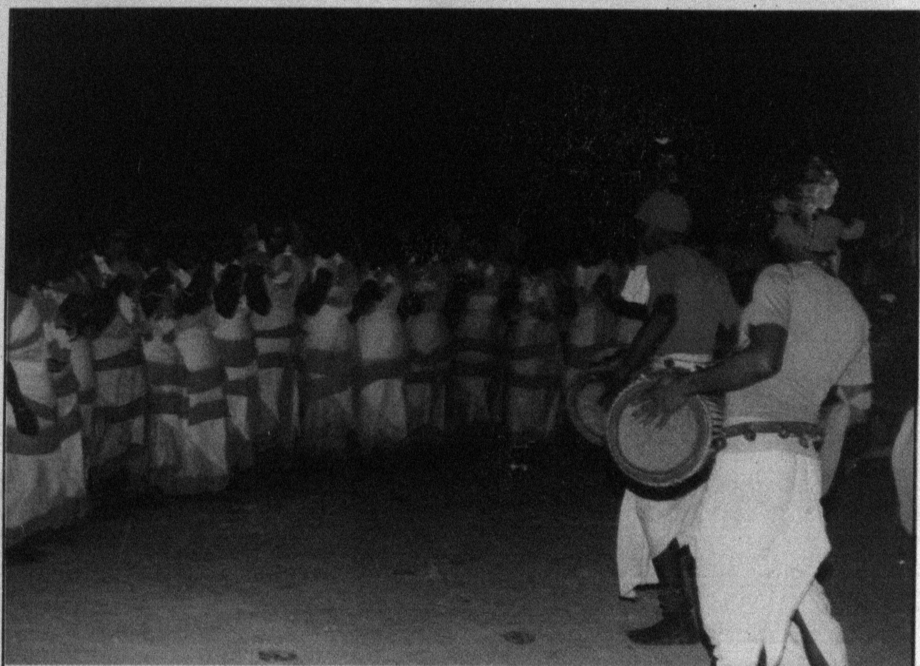

সাঁওতালবাড়ির দেওয়াল শিল্প



আদিবাসী পল্লীতে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির



বিরহড়দের শীতবস্ত্র দান করছেন জেলাশাসক



আদিবাসীদের নাচগান



আদিবাসীদের নাচগান

কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছিল। অনেক শবরের ব্রিটিশ জেলেই বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আর কিছুসংখ্যক শবর ব্রিটিশ সরকার দ্বারা অত্যাচারিত হলেও কোন না কোনভাবে জেল এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদেরও অবদান কম নয়।[১৮]

স্বাধীনোত্তর পর্বে জেলার খেড়িয়া-শবরদের অবস্থান ও কিছু উন্নয়ন প্রচেষ্টা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে স্বাধীনতার পর ভারত সরকার খেড়িয়া-শবর জাতিকে "বিমুক্ত গোষ্ঠী" হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাঁদের উন্নতিকল্পে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। তবুও আজও তাঁদের মূল-স্রোতে ফিরে আসার পথে অনেক বাধা। তৎসত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় আজ তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

খেড়িয়া-শবরেরা আজও বনবাসী, স্বভাব-চরিত্রে এখনও বন্যপ্রাণী। এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে জেলার স্থানে স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে খুব একটা পরিচয়ও ছিল না। স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগতভাবে ১৯৬৮ সালে শ্রদ্ধেয় গোপীবল্লভ লাল সিংদেও তাঁদের মধ্যে একতা স্থাপনের ও উন্নয়নের চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সততায় খেড়িয়া সমাজ নতুনভাবে বাঁচতে ও বসবাস করতে শেখেন। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গোপীবল্লভবাবু বলেন, "যখন সমগ্র সমাজকে একটা অবিশ্বাসের চোখে দেখা হয়, তখন তার প্রতি আচরণ সম্পর্কে সাধারণত সাধারণ মানুষের উদাসীন থাকাটা সঙ্গত বলেই মনে হয়।"[১৯]

খেড়িয়া-শবর সমিতির জন্মসাল ১৯৬৮ সাল হলেও তার প্রস্তুতিপর্ব তিন বৎসর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ ৬ই জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে মালবাজার থানার জুদা গ্রামে বুধন শবরের আহ্বানে এই সমিতি স্থাপিত হয়।[২০] সেদিন গোপীবাবু ও মদনবাবু ছাড়াও শবরদের পক্ষে শুকু শবর, নারায়নণ শবর, বুধন শবর, রাজু শবর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল শবরগণকে বনভূমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করা ও একতাবদ্ধভাবে বসবাস করা। এইসময় শবরদের ঐক্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল।

শবরদের দ্বিতীয় সভা ঐ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি আহ্বান করা হয়েছিল। এই সভায় জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী মানুষ ছাড়াও শবরদের অভূতপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই-সভায় বিভিন্ন থানা থেকে প্রায় পাঁচশত শবর উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিনের সভায় এই শবরদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কমলকিশোর দীক্ষিত, সুরেশ্বর সাউ, সুবোধ কুমার বসুরায় (পুরুলিয়া), মিহির চক্রবর্তী (ছটমুড়া), বনবিহারী মাহাত (চক্রধরপুর) এবং মদনচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ লাল সিং দত্ত ও গোপীবল্লভ লাল সিংদেও (রাজনোয়াগড়)। এদের উপস্থিতিতে শবর-সমিতির জেলা ও থানা কমিটিগুলি গঠিত হয়।[২১]

১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ছিল শবরদের সংগঠনের কাল। শবরদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা যত সহজে বলা যায়, কাজে তা করা সম্ভব নয়। এছাড়া এঁরা এমনি এক মানবগোষ্ঠী যাঁরা মানসিকভাবে বিপন্নতার শিকার। এঁদের বসতিও বিচ্ছিন্ন দুর্গম জায়গায়। ফলে শবরদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একের পর এক সভা আহ্বান করা হয়। জুনাড়া, মালিডি, জারা, বালকডি ইত্যাদি বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় এঁদের একত্রিত করা হয়েছিল। ফলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সময় অতটা সহজ ছিল না। ইতিমধ্যে ইর্মাজেন্সীর মিসা আইন চালু হওয়ার ফলে অনেক শবরকে গ্রেপ্তার ও বন্দি করা হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে অধ্যাপক সুবোধ বসুরায় মহাশয় জেলা বেতার সমীক্ষক দলকে গোপীবাবুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। সুনীল সাহার নেতৃত্বে আকাশবাণীর দলটার সাথে শিক্ষক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। শবরদের সম্পর্কে গোপীবাবুর বক্তব্য টেপ করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তা কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। সুবোধবাবু তাঁর সম্পাদিত "ছত্রাক"-পত্রিকাতেও এই ভাষণটি প্রকাশ করেছিলেন।

এইসময় শবর জাতির উন্নতিকল্পে পুরুলিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রে মাননীয় অমলেন্দু রায় মহাশয়ের যোগদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আদর্শ ছিল মানুষের জন্য বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণে আসতে পারে সেজন্য তিনি গাছ-গাছড়ার উপকারিতা সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। উপেক্ষিত ও বঞ্চিত শবর জাতি যাতে স্বনির্ভর হতে পারে সেজন্য তিনি শবরগ্রামে কূপখনন ও কৃষি ব্যবস্থা, জলাধারে মাছ চাষের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প—যেমন শালপাতার ঠোঙা, বাঁশের ছাতা তৈরি করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সামান্য মাত্র অর্থ লগ্নি করে যাতে শবরেরা উপার্জন করতে পারেন এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।[২২]

১৯৮৩ সালে মালবাজার থানার কুদা গ্রামে ডাকাতি হয়। ঐ ডাকাতিকে কেন্দ্র করে কুদা ও তুড়াং গ্রামের অধিবাসীগণ শবরদিগকে বয়কট করে। এইসময় খেড়িয়া-শবরদের উপর ঘৃণা, উপেক্ষা ও অত্যাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে মাননীয়া মহাশ্বেতা দেবী এই শবর সমিতির সাথে যুক্ত হন। তাঁর যোগদান উপলক্ষে পুরুলিয়া থানার মালডিতে শবর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এইসময় থেকে শবর-সমিতির নামকরণ হয় " পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি।[২৩] মালডির শবরদের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পুরুলিয়া জেলার প্রতিটি থানাতে এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও সিংভূম জেলাগুলিতে খবর দেওয়া হয়। মেলার দিন পুরুলিয়া জেলার অনেক স্থান থেকেই শবর স্ত্রী-পুরুষেরা একত্রিত হতে শুরু করেন। জনসভার আগে যেখানে বেদী বাঁধা হয়েছিল সেখানে পাঁচ গ্রামের পাঁচজন শবর পুজো করেন। মালডির এই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীলছু শবর। উক্ত সভায় শবরদের মধ্য থেকে যাঁরা বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কানু শবর—শিরিবগোড়া, বুধন শবর-ডুমুরডি, রাজু শবর—অকড়াবাইদ, হরি শবর—মালডি, জলধর শবর—কুদা, সবুজ শবর—তামাঘুন, দশরথ শবর—দামোদরপুর এবং আরও অনেকে। এই সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—মহাশ্বেতা দেবী-কোলকাতা, সুবোধকুমার বসুরায়—পুরুলিয়া, অমলেন্দু রায়—পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, মদনমোহন রায়—রাজনোয়াগড় এবং গোপীবল্লভ লাল সিং দত্ত—রাজনোয়াগড়। এরপর দীর্ঘদিন ধরে নানা সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে শেষে ১৯৮৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি এই সমিতি সরকারি রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়।[২৪]

মালডি শবর মেলায় মহাশ্বেতা দেবী যুবকদের এগিয়ে আসতে উপদেশ দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্থানে শবর সমিতি গঠন করা, শবরগণকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাঁদের মধ্যে মদ্যপান বন্ধ করা। তিনি বলেন এ সব কাজ করতে না পারলে সমাজ গঠন করেও কোন ফল হবে না। শবরদের বদনাম দূর করতে হলে হাতের কাজ শিখতে হবে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে হবে—তবেই এই সমাজের উন্নতি হবে। তাঁর কথামত সেদিন শবরেরা শপথ নিয়েছিলেন আজ থেকে আমরা সভা-সমিতিতে কোথাও মদ খাব না, সমাজের বদনাম দূর করব, হাতের কাজ শিখব, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাব, সমিতির নির্দেশমত কাজ করব। আমাদের কথা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।"[২৫]

১৯৮৬ থেকে পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র খেড়িয়া-শবরদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করে। ১৯৮৮-৯০ সালে কলকাতার সেতু সেন্টার ফর মাস কমিউনিকেশনের সার্বিক সহায়তায় কিছু অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। এই সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। গোপীবল্লভ লাল সিংদেও, অমলেন্দু রায় ও খান্দেকর গোলাম কুদ্দুস।[২৬] ১৯৯০ সালে গোপীবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি সুজাতা সমিতির কার্যালয়ের জন্য জমি দান করেন। ঐ সময় মাগা নামে সংস্থা থেকে পাওয়া বারো হাজার টাকা, সিতু থেকে পাওয়া নয় হাজার টাকা ও গোপীবাবুর দানে একটা মাটির দেওয়ালের ঘর তৈরি হয়। এটা ছিল সমিতির প্রথম ভবন ও কার্যালয়।[২৭] রাজনোয়াগড়ের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশেই এই ভবন। কালক্রমে এটি একটি তিনতলা পাকা বাড়িতে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের জন্য একটি পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শবর ছেলে-মেয়েদের পাশের হাইস্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুলের নিজস্ব পোশাক আছে। তাদের দেওয়া হয়েছে খাঁকি প্যান্ট ও নীলরঙের জামা। এদের বিনা পয়সায় প্রাইভেট পড়ানোরও ব্যবস্থা আছে। শবর ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় দান করার জন্য মহাশ্বেতা দেবীর উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই সংস্থার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কমিটিতে রয়েছেন জলধর শবর, প্রশান্ত রক্ষিত, বীরেন মহাপাত্র, মলয় সিংদেও এবং গোপীবল্লভ লাল সিংদেও।

সমিতির যে নতুন গৃহটি উদ্বোধন হয়েছে তার নাম "শবর হস্তশিল্প কেন্দ্র"। ১৯৯৩ সালে এই কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয় থেকে এই সমিতিতে ৪,৯৬,৩০০ টাকা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রক থেকে ১,৬৫,৩০০ টাকা টাকা সমিতি পেয়েছে।[২৮] এছাড়া শবরদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন ডি.জি. (পুলিশ) অরুণ প্রসাদ মুখার্জী।

বিভিন্ন গ্রামের খেড়িয়া-শবরদের কর্মমুখী করে তোলার জন্য হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এঁরা প্রত্যেকেই কাশি-ঘাস ও খেজুরপাতা দিয়ে নানারূপ সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি এইসব উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কিনে নিয়ে সেগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছে। প্রতি মঙ্গলবার রাজনোয়াগড়ের হাটে এইসব জিনিষপত্র বিক্রি হয়ে থাকে। ফলে সামান্য কিছু অর্থ আসার ফলে শবরেরা অনেকেই স্থানীয় মল্লভূম গ্রামীন ব্যাংকে নিজ নিজ একাউন্ট খুলেছেন।[৩০] জেলার বাইরেও এঁদের হস্তজাত শিল্প বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত পুরুলিয়া শহরের বইমেলায় এঁদের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিশেষ প্রশংসিত ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি হস্তশিল্পীর ব্যক্তিগত নামে গ্রুপ ইন্সিওরেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অদ্যাবধি প্রায় চল্লিশটি গ্রামের পাঁচশত পরিবার এই শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া তসর ও লাক্ষা শিল্পেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পলাশ, কুসুম, কুল ইত্যাদি গাছগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পাঁচজন আইনজীবিকে নিয়ে এক নিজস্ব আইনি মেল গঠন করা হয়েছে। শবরদের গ্রামের নদী, ডোবা ও পুকুরগুলিতে মৎস্যচাষেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জেলার কয়েকটি স্থানে খেড়িয়া-শবরদের উন্নতিকল্পে কমিউনিটি সেন্টার গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অকড়বাইদের সেন্টারটি—যেখানে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। এছাড়া পুঞ্চা থানার দামোদরপুর গ্রামেও আরও কয়েকটি স্থানে এরূপ সেণ্টার

গড়ে উঠেছে। আরও কোন কোন স্থানের শবর গ্রামে এ ধরনের কমিউনিটি সেণ্টার গড়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা চলছে। এই সেণ্টারগুলিতে শবরগণকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে শবর ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া ও শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সংস্থার মাধ্যমে শবরদের গ্রামে পুকুর খনন করে সেগুলিতে মাছ-চাষেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি চারটি লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে যাদের মধ্যে উল্লেকযোগ্য হল স্বাস্থ্য, আর্থিক বিকাশ, শিক্ষা ও সচেতনতা। পুরুলিয়া জেলার খেড়িয়া শবরেরা বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত। তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে পুরাতন পদ্ধতিতেই তাঁদের স্বাস্থ্য সেবা আজও দাঁড়িয়ে আছে। জন্মে শিশুর নাড়ীচ্ছেদন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা নিজ পদ্ধতিতেই অবিচল আছেন। ফলে এদিকে মেডিক্যাল স্বাস্থ্যবিধি এবং ঔষধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার কাজ শুরু হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে এ্যালোপাথি চিকিৎসাসহ তাঁদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশু বিশেষজ্ঞা ডা. মলি শবরদের এ্যালোপাথি চিকিৎসার জন্য টাকা দান করেছেন। এছাড়া মানবী নামক মহিলা সমিতি থেকে প্রাপ্ত ৫৪,৩১৩ টাকা শবরদের এ্যালোপাথি চিকিৎসাতে খরচ হয়েছে।[৩২] সমিতি এইসব শুভানুধ্যায়ী ডাক্তারদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন জনগোষ্ঠী খেড়িয়া-শবরদের উন্নতিকল্পে সরকারি ও বেসরকারি পর্য্যায়ে চেষ্টা হয়েছে। শবর হস্তশিল্পের ধারা তাঁদের কিছুটা বৃত্তিমুখী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টার দ্বারা শিক্ষা প্রসারে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর ধারাবাহিক সাহায্যে এই জনগোষ্ঠীকে কিছুটা সাহায্য করেছে। তাঁর 'জ্ঞানপীঠ' সম্মানলব্ধ ১০ লক্ষ টাকা তিনি শবরদের কল্যাণে নিয়োগ করেছেন। "কমিশনার তুষার তালুকদার অবসর গ্রহণের পরও সমিতির অনেক দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। এছাড়া ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন দিয়েছে দু লক্ষ টাকা, পিয়ারলেস দিয়েছে দু লক্ষ টাকার কাছাকাছি। শবর নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন গায়ত্রী স্পিভাক।"[৩২]

সরকারি স্তরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলার খেড়িয়া-শবরদের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের ভবিষ্যত উন্নতির জন্যও কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শবরগণকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ব্লকস্তরের সমস্ত বি.ডি.ও মহোদয়গণকে অবহিত করা হয়েছে। শবরদের জন্য বিবিধ স্বনির্ভর প্রকল্পগুলি (SHG) নিম্নবর্ণিত ব্লকগুলিতে শুরু হয়েছে :

হুড়া বান্দোয়ান, বরাবাজার, মানবাজার ১ ও ২, বলরামপুর ও পুঞ্চা

শবরদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন জেলা প্রশাসন ২০০১ থেকে। প্রতিটি শবর মৌজায় পানীয় জলের ও রাস্তা তৈরির ব্যবস্থা ছাড়াও সরকারি খাস জমি বিতরণ, ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যবস্থা (মোবাইল ভ্যানে ডাক্তার, নার্স, ঔষধ সমেত) ও সাক্ষরতার কেন্দ্রে শবরদের আনার প্রচেষ্টা হয়েছে।

এছাড়াও পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন বেসরকারি সংগঠনগুলির সাথে যৌথভাবে শবরদের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করেছে। মার্চ ২০০২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত অর্থাৎ বিগত বছর শবরদের মধ্যে বিনামূল্যে ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ, ফ্রক, জামা, প্যাণ্ট, ইজার, সোয়েটার, চাদর, মশারি ইত্যাদি বিতরণ করেছে অন্তত ৬৭৪০ জন শবর উপকৃত হয়েছেন।

পুরুলিয়া জেলাধীশের এক নির্দেশের বলে বিভিন্ন ব্লকের বি.ডি.ও-গণ দারিদ্র্য সীমারেখার

নীচে (BPL) বসবাসকারী শবরদের তালিকা তৈরি করেছেন।[৩৩]

পুরুলিয়া জেলাধীশ জেলার বিভিন্ন ব্লকে শবরদের উন্নয়নের জন্য ফলের বাগান, পশুখাদ্য, উদ্যান তৈরির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪]

এছাড়াও সরকারের তরফ থেকে খেড়িয়া-শবরদের উন্নতির জন্য কিছু ভবিষ্যত পরিকল্পনাও করা হয়েছে। এতে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শবর ছেলে-মেয়েদের এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য সুষম খাদ্য-বন্টনের কথা বলা হয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই পরিকল্পনা শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া ৩৫০০ শবরের বাসস্থান তৈরির জন্যও বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা জেলার ব্লকস্তরে জানানো হয়েছে। পুরুলিয়া জেলাধীশ শ্রী দেবপ্রসাদ জানা এ ব্যাপারে পি এবং আর ডি বিভাগের সাথে আলোচনা করে উপরোক্ত কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।[৩৫] পি এবং আর ডি বিভাগের তরফ থেকে এই বিষয়ে সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

খেড়িয়া-শবরগণ ক্রমশ মূলস্রোতে ফিরছে। এরজন্য ব্যাপকভাবে তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক চাহিদা পূরণের দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

শবরদের মূলস্রোতে ফেরানোর চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হচ্ছে এটা আমরা নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে বুঝতে পারি।

১. বিভিন্ন শবর পরিবারকে সরকারের উদ্যোগে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে।
২. B.PL তালিকাতে শবর পরিবারগুলির নাম রাখা হয়েছে।
৩. বাঁন্দোয়ানে শবর ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে হোস্টেলে থাকার সুবিধা।
৪. শবর ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারি স্কুল হয়েছে।
৫. শবর মহিলাদের দাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
৬. একটি শবর ছেলে বলরামপুর কলেজে বি.এ পাঠরত আছে।

সহায়ক গ্রন্থসূচি

১. বর্ত্তিকা (জুলাই-ডিসেম্বর, কলিকাতা, ১৯৯৬), পৃঃ ১
২. আবুল ফজল, আইন-ই আকবরী (ইংবেজি অনুবাদ, নতুন দিল্লি, ১৯৮৮) পৃঃ ১২৭-১২৮।
৩. আকবরের আমলে বঙ্গদেশেব ১৯টা সরকারের মধ্যে সরকার মান্দারণ ছিল অন্যতম। সরকার মান্দারণ আবার ১৬টা পরগণা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এইসব পরগনাগুলি থেকে আকবরের শাসনকালে ২,৩৫,০৮৫ টাকা রাজপথ হিসেবে সংগৃহীত হত। গোলাম হোসেন সলিম, রিয়াজ-উ সালাতিন (ইংরেজি অনুবাদ, দিল্লি, ১৯৭৫), পৃঃ ৪৯।
৪. ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, বাঁকুড়া (কলকাতা, ১৯৬৮) পৃঃ ৭৮-৭৯
৫. জগবন্ধু ভট্টাচার্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে শবর (বর্ত্তিকা, পৃঃ ৩-৪)।
৬. গোপীবল্লভ লাল সিংদেও, শবর পরিচিতি (ঐ, পৃঃ ২২-২৪)।
৭. মহাশ্বেতা দেবী, অরণ্য-সন্তান—শবর-ঘেড়িয়া (কলকাতা, ১৯৯৮)
৮. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শবরদের গ্রাম (উদ্ধৃত লোকশ্রুতি, কলকাতা, ১৯৯৬) পৃঃ, ৪৭-৪৮।
৯. অরণ্য-সন্তান, পৃঃ ১০।
১০. ভজহরি মাহাত, রক্তে রাঙা মানভূম (পুরুলিয়া, ১৯৫৫), পৃঃ ৩৮।
১১. কানু শবর শিরিষগোড়ার বাসিন্দা। ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। পুলিশ তাঁকে নানাভাবে অত্যাচার করে শেষে গ্রেপ্তার করে। জেলখানায় শবরদের দিয়ে মেথরের কাজ করানোর প্রতিবাদে কানু শবর প্রতিবাদ করেন। পুলিশ তাঁকে নানা অভিযোগে সাজা দেয়। বর্ত্তিকা, পৃঃ ৭, রক্তে রাঙা পৃঃ ৯৭ (ঘ)।

১২. নিবারণচন্দ্রের নির্দেশে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় অস্পৃশ্য শবর ও সাঁওতালদের উন্নতিকল্পে পুঞ্চা থানার দামোদরপুর গ্রামের খেড়িয়া-শবর ও বলিখুন গ্রামের সাঁওতালগণকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন।
১৩. রক্তে রাঙা, পৃঃ ৭৬।
১৪. ঐ পৃঃ ১৭৩।
১৫. জগবন্ধু ভট্টাচার্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে শবর (বর্ত্তিকা, পৃঃ ৬)।
১৬. ঐ, পৃঃ ৬।
১৭. রক্তে রাঙা, পৃঃ ২৭।
১৮. জগবন্ধু ভট্টাচার্য, মুক্তিযোদ্ধা বীর বিভূতি (বাংলা ১৩৮৫), পৃঃ ৩৯।
১৯. গোপীবল্লভ লাল সিংদেও, শবর পরিচিতি (বর্ত্তিকা, পৃঃ ২৫)।
২০. মহাশ্বেতা দেবী, অরণ্য-সন্তান, পৃঃ ১৮।
২১. বর্ত্তিকা, পৃঃ ২৬।
২২. অধ্যাপক সুবোধ কুমার বসু রায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত।
২৩. এইসময় ৩৩ জন সদস্য নিয়ে এই কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছিল।
২৪. বর্ত্তিকা, পৃঃ ৪১।
২৫. ধীরেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, বর্ত্তিকা, পৃঃ ৩৮।
২৬. খোন্দেকর গোলাম কুদ্দুস, বর্ত্তিকা, পৃঃ ৫১।
২৭. প্রশান্ত রক্ষিত, সর্বদা সামনে হিমালয় (ঐ পৃঃ ৪২)।
২৮. জলধর শবর, আমার জাতির কথা (ঐ পৃঃ ১৪)।
২৯. বর্ত্তিকা, পৃঃ ১৫-১৬।
৩০. অরণ্য-সন্তান, পৃঃ ২৪।
৩১. শশধর শবর, আমার জাতির কথা (বর্ত্তিকা, পৃঃ ১৭)।
৩২. অরণ্য-সন্তান, পৃঃ ২০।
৩৩. পুরুলিয়া জেলাধীশের সার্কুলার নং ২২/সি, তাং ৭.১.২০০৩।
৩৪. জেলার বি.ডি.ও-গণকে জেলাধীশের নির্দেশ, নং ১৯৫(৮)/সি, তাং ২২.২.২০০৩।
৩৫. জেলাধীশের পত্রসংখ্যা ১৩৯০/সি, তাং ২০.১১.২০০২।

পুরুলিয়ায় বিরহড় সমাজ

জলধর কর্মকার

বিখ্যাত সাহিত্যিক Oscar Wilde-এর "The Selfish Giant" গল্পের সেই ছোট্ট শিশু এবং ফুলটির কথা প্রায় সবারই জানা। "Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again, and went off to sleep."..... "একদা এক সুন্দর ফুল ঘাসের ভেতর থেকে মাথা তুলেছিল কিন্তু যেই না সে নোটিশ বোর্ডটি লক্ষ্য করল, সে শিশুদের জন্য এতই দুঃখ পেল যে সে আবার মাটির তলায় ঘুমিয়ে পড়ল।"

স্বার্থান্ধ মানুষের অত্যাচারে পৃথিবীর বুক থেকে ঐ সুন্দর ফুলটির মতো কতই না মনুষ্য-প্রজাতি হারিয়ে গেছে কিংবা হারিয়ে যেতে চলেছে তার হিসাব মেলা ভার।

মানুষের যে সমাজ আজ আমরা দেখি, তা এক সভ্য সমাজ। হাতের নাগালের বাইরে ছিল বলে—"আয় আয় চাঁদ মামা, টিপ্ দিয়ে যা..." বলে ছেলে-ভুলোনোর কাজে যা একদিন ব্যবহৃত হত সেই চাঁদ মামাও আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। বহু বছর আগেই মানুষ তাকে জয় করেছে। এখনো পর্যন্ত আর এক অধরা 'মঙ্গল গ্রহে' পৌঁছতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে সময় লাগবে প্রায় আড়াই বছর। এখন ঐ আড়াই বছর না খেয়ে সুস্থ শরীরে কর্মঠ মন নিয়ে অজানা ঐ মঙ্গল গ্রহকে নির্বিঘ্নে জয় করে কিভাবে আবার নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসা যায় এখন চলছে তারই পরিকল্পনা। সভ্যতার চরম উন্নতির এই যুগেও হঠাতই মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা— "পিলসুজে প্রদীপ যেন জ্বলছে। উপরে আলো, নীচে অন্ধকার...।" তাই একদিকে যখন গ্রহে উপগ্রহে মানুষের দাপাদাপি; অজানাকে জানবার জন্য, অধরাকে ধরবার জন্য কোটি কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ তখনি আরেক দিকে বন-পাহাড় থেকে তারই আদিম পূর্বপুরুষদের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে অস্তিত্ব রক্ষার করুণ কাহিনি।

"বাস করি ধুঁধে ঝাড়ে, ব্যাঙ ইঁদুর মারে খাই
ইটাকে কি বাঁচা বলা যায়?
বইল্যে দেন ভাই—কেমন কইরে কাল কাটাই।
বন বাদাড় হর‍্যে লিল, শিকড় বাকড় ফুরাঞঃ গেল;
পাখ পাখুড় পাওয়া হোইল দায়
পেট আছে পিঠ আছে, মেয়্যা আছে ছ্যেল্যা আছে
বল এদের কেমনে বাঁচাই?
বইল্যে দে-ন ভাই—ইটাকে কি বাঁচা বলা যায়?

অস্বীকার করার উপায় নেই এই সভ্য সমাজে পৌঁছাবার পূর্বে মানুষকে সভ্যতাপূর্ব বন্য ও

বর্বর জীবন যাপন করতে হয়েছিল। প্রাক্-সভ্য সেই জীবন ছিল এক অন্ধকার জীবন। ভাবতে অবাক লাগে সে যে কারণেই হোক স্বাধীনতার পর এক এক করে ৫৬টি বর্ষা-বাদল পেরিয়ে গেলেও ভারতের আদিমতম উপজাতি বিরহড় এবং শবরেরা অনেকটা সেই তিমিরেই আছেন।

সাঁওতালি ভাষায় 'বির' মানে জঙ্গল আর 'হড়' মানে হল মানুষ। এক কথায় বিরহড় মানে জঙ্গলের মানুষ। হ্যাঁ জঙ্গলের মানুষই বটে। তবে আঁতকে উঠার বিষয় হল জঙ্গলের প্রকৃত মানুষ এই বিরহড়রা আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে।

পাহাড়ের এক একটি প্রস্তরখণ্ডের সাথে যাদের প্রাণের সম্পর্ক, পাহাড়ি সুগন্ধিফুলেরা যাদের কাছে বোনের মতো ; ভল্লুকেরা, হরিণ, বাঘ, হাতি যাদের ভাই, পাহাড়ি চূড়া প্রান্তরের শিশির বিন্দু প্রভৃতির সাথে যারা এক পরিবারভুক্ত সেই আদিমদের এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেবলমাত্র বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের গুটিকতক জায়গায় বসবাস। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি, বলরামপুর, ঝালদা এবং বান্দোয়ান থানা এলাকার চারটি পাহাড়ি উপত্যকায় হাতে গোনা ৭৪টি পরিবার আগের মতন শিকড়-বাকড় না মেলায় জীবন-রক্ষার সংগ্রামে স্থানীয়ভাবে কিছু কাজকর্ম করে জীবনযুদ্ধে এখনও যুঝে চলেছেন।

নৃ-তত্ত্ববিদদের মতে বিরহড়রা হলেন অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। 'বিরহড়' শব্দটি মূলত অস্ট্রিক শব্দ। দৈহিক গঠন অনুযায়ী প্রোটো-অস্ট্রেলিয়া জাতির সঙ্গে এদের মিল আছে। এদের দৈহিক গঠন সাধারণের থেকে একটু আলাদা। গায়ের রঙ কালো, উচ্চতা মাঝারি, নাক চওড়া, মাথার চুল কিছুটা ঢেউ-খেলানো। এদের মধ্যে এখন আপাতত দুটো ভাগ পরিলক্ষিত হয়। (১) উথলু বা ভুলিয়া এবং ড্যামি বা মানিয়া। ভুলিয়ারা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায় আর ড্যামি বা মানিয়ারা কিন্তু কোথাও না কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের বিরহড়রা প্রায় সকলেই ড্যামি পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি সারা বিশ্বের মধ্যে মানবপ্রজাতির বসবাসের প্রথম স্থান একথা আজ সর্বজনবিদিত। ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন হিমালয় পর্বত থেকেও প্রাচীন হল পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, এবং এর বয়স ১৬৫ লক্ষ বছরের কম নয়। সম্প্রতি অযোধ্যা রেঞ্জের শেষ দিকে বলরামপুর থেকে বাগমুণ্ডি যাবার রাস্তায় পাটডির কাছাকাছি চাউনিয়ার উঁচু জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেখানে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নদী—সেখানে পাওয়া গেছে আদিম মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। পাথরকে ছুঁচালো করে তীরের ফলার মতো করে অস্ত্র বানানো কিংবা বর্শার মতো করে তাতে বাঁট দিয়ে অস্ত্র হিসাবে তাকে ব্যবহার করা কিংবা এক ধরনের শক্ত পাথরকে ক্রমশ ধারালো করতে করতে ব্লেডের মতো ধারালো বস্তুতে পরিণত করে তা দিয়ে মাংস কাটা—এসব বহু কিছুর নিদর্শন অযোধ্যা পাহাড়ের চারপাশে এখনো বর্তমান। ঐতিহাসিকেরা বলছেন এই অঞ্চলের ব্যবহৃত ঐ পাথর কিংবা অন্যান্য নমুনাগুলির বয়স ১৮-২০ হাজার বছরের কম নয়। যাই হোক অযোধ্যা পাহাড় এবং এর চারপাশে দুর্গম গিরিগহ্বরে বাড়রিয়া, লহরিয়া, মাদলা, বাড়েডি, নিচিতপুর, খামার, বেড়সা, হেঁসাহাতু প্রভৃতি জায়গায় এখনো এদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে।

সাঁওতালি ভাষার সাথে কিছুটা মিল থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এদের ভাষা এখন অবলুপ্ত। বেশি কথা এরা বলে না। আকারে-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করতেই এরা বেশি অভ্যস্ত। যে কোন কারণেই হোক বানর কিংবা হনুমানের সাথে এদের চিরশত্রুতা। বানর পেলেই এরা ধরে ধরে খায়। বানররাও এদের দেখলেই জোড়হাত করে যেন ক্ষমাভিক্ষা চায়। হয়তো বা এমনটাও হতে পারে বানর কিংবা হনুমানরা সাহায্য করেছিল বলেই আর্যরা সেদিন সারা আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যে

আদিবাসীদের ছলে-বলে-কৌশলে পরাভূত করে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। পরম্পরাগত সেই রাগ ও ক্ষোভ থেকে থাকতেই পারে। যাই হোক, বিষয়টি বিতর্কিত। তবে বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করে এই বিরল প্রজাতির পশ্চিমবাংলায় নিম্নরূপ বাস্তবচিত্র লক্ষ করা গেছে।

১। বাগমুণ্ডি থানা এলাকার মাদলা-ভূপতিপল্লীতে	৪৪টি পরিবার
২। বাগমুণ্ডি থানা এলাকার বাড়রিয়ায় ভূপতিপল্লীতে	৬টি পরিবার
৩। বাগমুণ্ডি থানা এলাকার বাড়েডি নিচিতপুরে	১টি পরিবার
৪। বলরামপুর থানা এলাকার বেড়শা গ্রামে	১০টি পরিবার
৫। ঝালদা ১নং ব্লকের হেঁসাহাতু মহলটাঁড় অঞ্চলের খামার টোলা ঢাকাই গ্রামে	৫টি পরিবার
৬। বান্দোয়ানের ইঁচাহাতু এলাকা	৮টি পরিবার
মোট	৭৪টি পরিবার

বলরামপুর থানার বেড়সাতে যে ১০টি পরিবার আছে তাদের পরিচয় হল নিম্নরূপঃ

পরিবারের ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পিতা/স্বামী	বয়স	পুং/মহিলা	পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক
(১)	কৃষ্ণ শিকারি	*কালিপদ	৩৬ বৎসর	পুং	কর্তা
	মন্দরী শিকারি	কৃষ্ণ	৩০ বৎসর	মহিলা	স্ত্রী
	শুকদেব শিকারি	কৃষ্ণ	৬ বৎসর	পুং	পুত্র
	সুখদা শিকারি	কৃষ্ণ	৩ বৎসর	মহিলা	কন্যা
(২)	মঙ্গল শিকারি	*কালিপদ	৩০ বৎসর	পুং	কর্তা
	শুকুরমনি শিকারি	মঙ্গল	২৫ বৎসর	মহিলা	স্ত্রী
	সুমিত্রা শিকারি	মঙ্গল	২ বৎসর	মহিলা	কন্যা
(৩)	সনাতন শিকারি	*কালিপদ	২৫ বৎসর	পুং	কর্তা
	সারথী শিকারি	সনাতন	২০ বৎসর	মহিলা	স্ত্রী
	রূপবান শিকারি	সনাতন	৩ বৎসর	মহিলা	কন্যা
	সোমলাল শিকারি	সনাতন	২ বৎসর	পুং	পুত্র
(৪)	মুখী শিকারি	*কালিপদ	৭০ বৎসর	পুং	কর্ত্রী
(৫)	হরি শিকারি	*ক্ষুদিরাম	৪৫ বৎসর	পুং	কর্তা
	পার্বতী শিকারি	হরি	৪০ বৎসর	মহিলা	স্ত্রী
	মঞ্জু শিকারি	হরি	৭ বৎসর	মহিলা	কন্যা
	বিজলী শিকারি	হরি	৫ বৎসর	মহিলা	কন্যা
(৬)	জগন্নাথ শিকারি	*ক্ষুদিরাম	৪০ বৎসর	পুং	কর্তা
	রানী শিকারি	জগন্নাথ	৩৫ বৎসর	মহিলা	স্ত্রী
	হীরামনি শিকারি	জগন্নাথ	৪ বৎসর	মহিলা	কন্যা
	শংকর শিকারি	জগন্নাথ	৩ বৎসর	পুং	পুত্র
	বুধা শিকারি	জগন্নাথ	২ বৎসর	পুং	পুত্র
(৭)	রবি শিকারি	*ক্ষুদিরাম	৩৫ বৎসর	পুং	কর্তা
	বুধনী শিকারি	রবি	১ বৎসর	মহিলা	কন্যা
	*লগনী শিকারি	রবির স্ত্রী	(সর্পদংশনে কিছুদিন আগে মারা যান)		

(৮)	মগ শিকারি	*ক্ষুদিরাম	২৫ বৎসর	পুং	কর্তা
(৯)	গুরুবারী শিকারি	*ক্ষুদিরাম	৭৫ বৎসর	মহিলা	কর্ত্তৃ
(১০)	সোমবারী শিকারি	*কেশব	৫০ বৎসর	পুং	কর্ত্তৃ
	দীপক শিকারি	*কেশব	১৮ বৎসর	পুং	পুত্র
	পার্বতী শিকারি	,,	১৫ বৎসর	মহিলা	কন্যা
	গোপাল শিকারী	*	১২ বৎসর	পুং	পুত্র

বেড়সার বিরহড়দের উপরিউক্ত চিত্র থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয় যে, তাদের বেশিরভাগ লোকের বয়সই কিন্তু ৪০-এর নীচে। *কালিপদ এবং *ক্ষুদিরাম এই দুই বিরহড়ের বংশধর বাকি সকলেই। কোন এক সময়ে খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে অযোধ্যাপাহাড়ের একবারে সানুদেশে বলরামপুর শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার ভিতরে এরা আশ্রয় নিয়েছিল। বেড়সার পাশেই আছে শিরগি বলে একটি গ্রাম। স্থানীয় লোকেরা বলেন শিরিঙ্গি! সাঁওতাল জাতির উৎপত্তির সাথে বহু কাহিনি শিরগীর এই পাহাড়টির সাথে জড়িত। স্থানীয় লোকে পাহাড়টিকে বলেন 'বুড়ার আইড়'। সাঁওতালরা বলেন যুগী বুরু। সাঁওতালদের আদি মানুষ (সৃষ্টির প্রথম পুরুষ মহিলা) পিলুচ হাড়াম এবং পিলুচ বুড়ির পাষাণ মূর্তি, তাদের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়ের পাথর চিত্র, কুয়া বহুকিছুর নিদর্শন এই দুর্গম জায়গাটিতে এখনো বর্তমান। শিরগি এবং বেড়সার মাঝামাঝি একটি নদী বয়ে গেছে। নাম তার 'পুন্নাপানি'। স্থানগুলি খুবই প্রাচীন। চারদিকে ডুংরি পাহাড় আর নদী। পশুশিকার করার এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখেই *কালিপদ এবং *ক্ষুদিরাম হয়তো বা বেড়সাতে এসে প্রথম বসবাস শুরু করেছিলেন। *কালিপদ স্ত্রী মুখী শিকারি (বয়স ৭০ বৎসর) এবং *ক্ষুদিরামের স্ত্রী গুরুবারি (বয়স ৭৫ বৎসর) শক্তসমর্থ শরীর নিয়ে এখনো বেঁচে আছেন।

মাদলার বিরহড়রা

বাগমুণ্ডি থানা এলাকার মাদলার ভূপতিপল্লিতে সর্বাধিক বিরহড়দের বাস। অযোধ্যা এলাকার বিরহড়দের প্রথম বসবাস ছিল শিলিংদা, সাপারমবেড়া, ভূদা প্রভৃতি জায়গায়। ১৯৫৯-৬০ সালে সরকারি উদ্যোগে এলাকার ছড়িয়ে থাকা বিরহড় পরিবারগুলিকে একত্রিত করে বাগমুণ্ডি ব্লকের মাদলাতে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভূপতিরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নামানুসারে পুনর্বাসন কেন্দ্রটির নামকরণ হয় ভূপতিপল্লি। বলরামপুর থেকে বাগমুণ্ডি যাবার রাস্তায় নিমতল বাসস্টপেজ থেকে বাঁ দিকে ২ কিলোমিটারের মধ্যেই পড়ে এই ভূপতিপল্লি। সরজমিনে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলে এই বিরহড়দের ৪৪টি পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরিবারের কর্তা কিংবা কর্ত্রীরা হলেন—

১। ফতু শিকারি	২। মগল শিকারি	৩। গান্ধী শিকারি
৪। দুর্গা ,,	৫। কাল্লা ,,	৬। মোহনচাঁদ ,,
৭। চুনজা ,,	৮। চুনু ,,	৯। দুলু ,,
১০। কিষ্ট ,,	১১। কেদার ,,	১২। বানেশ্বর ,,
১৩। পাহলু ,,	১৪। ভোলানাথ ,,	১৫। দুখনী ,,
১৬। কানাই ,,	১৭। রঙ্গলাল ,,	১৮। রবনী ,,
১৯। কমল ,,	২০। সোমচাঁদ ,,	২১। সনাতন ,,

২২। মানিক ,,	২৩। অহল্যা ,,	২৪। বাসন্তী ,,
২৫। রামচন্দ্র শিকারি	২৬। মাদলু ,,	২৭। মঙ্গল ,,
২৮। বুদ্ধেশ্বর ,,	২৯। হরিপদ ,,	৩০। ছুটজেঠু ,,
৩১। বিরাজ ,,	৩২। লালমোহন ,,	৩৩। শীতল ,,
৩৪। সুভদ্রা ,,	৩৫। লুতুর ,,	৩৬। টেম ,,
৩৭। দুর্ম ,,	৩৮। পুতুল ,,	৩৯। ভুটুক ,,
৪০। জুরু ,,	৪১। কাঁদরু ,,	৪২। মালতী ,,
৪৩। মতি ,,	৪৪। বুধনী ,,	

বাড়েডিতে যে একটি পরিবার আছে তার প্রধান হলেন গুরুপদ শিকারি। ঝালদা থানার খামার এলাকায় ৪টি ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে আছে ৫টি বিরহড় পরিবার। ঐ ৫টি পরিবারের মধ্যেই সমাজ-সংসার বিয়ে-থা সবকিছু। একইভাবে মাদলা, বেড়সা কিংবা ইঁচাহাতু এলাকার বিরহড়রাও নিজেদের মধ্যে পরিবৃত্ত রচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। পদবির জায়গায় এরা লেখেন শিকারি। শিকার করে বন্যজন্তুর মাংস, শিকড়, কন্দ এবং ফলমূল খাওয়া থেকেই হয়তো শিকারি পদবি। পদবির ক্ষেত্রে যেমন শিকারি তেমনি নামের ক্ষেত্রেও সরাসরি পাহাড়ি ছোঁয়া। যেমন— বুধু শিকারির বাবার নাম ডকা বিরহড়। খামারের বিরহড় পরিবারের প্রধানরা হলেন কাতরু শিকারি, ঝুরুয়া শিকারি, গেজরা শিকারি, পটরা শিকারি প্রভৃতি। ইঁচাহাতুর বিরহড়রা হলেন ভেধব শিকারি, মাগলু শিকারি প্রভৃতি। খামারের ঢাকাই গ্রামের কাতরু শিকারির বর্তমান বয়স একশোরও বেশি।

বিরহড়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

জন্ম থেকেই অরণ্যে যাদের বাস, অরণ্যই যাদের একপ্রকার পিতা-মাতা। তারা যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ আদিবাসী সমাজের সঙ্গে অবণ্যের এক নিবিড় সম্পর্ক। বিরহড়রাও এর ব্যতিক্রম নয়। যৌথ পরিবারে বাস করতেই এরা অভ্যস্ত। পরিবারের কর্তা কিংবা কর্ত্রীর আদেশ অবশ্যই এদের কাছে মান্য। বিবাহ প্রথা এবং অন্যান্য রীতিনীতি অনেকটা সাঁওতালদের মতোই। অসুখ-বিসুখে বন-জঙ্গলের শিকড়-বাকড়ই এদের মহৌষধ। কোন্ গাছের শেকড় কোন্ গাছের ছাল, কোন্ গাছের পাতার রস কি কি অসুখে কাজে লাগে বংশানুক্রমে এটা তারা জেনে জেনে আসে।

অর্থনীতির দিক থেকে অরণ্যের উপরই এরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মাদলা, বেড়সা, খামার, ইচাহাতু কিংবা বাড়রিয়া সমস্ত এলাকার বিরহড়দেরই দেখা গেছে নিকটস্থ হাটে কিংবা বাজারে বিভিন্ন রকমের শিকড়-বাকড় তথা ওষধি বিক্রি করে এদের সংসার চলে। সম্প্রতি অনেকে বনের চিহড়লতার আঁশ থেকে দড়ি তৈরি করে বিক্রি করেন। কেউ কেউ আবার এখন পাহাড়ের কাঠ পার্শ্বস্থ হাটে কিংবা বাজারে বিক্রি করেও জীবিকার্জন করে। বনে-পাহাড়ে থাকার কারণে চাষবাসের কাজে এরা অনেকটাই আনাড়ি। এ কারণে চাষবাসের কাজে এদেরকে বড় কেউ একটা ডাকে না। তবে সম্প্রতি পেটের জ্বালায় এরা চাষের কাজে সমতল এলাকায় এসে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এখন আবার কেউ কেউ ছাগল পুষেও সংসার চালায়।

বিরহড় ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া নেই বললেই চলে। বেড়সাতে ১০টি পরিবারের ৩০ জন বিরহড়ের মধ্যে হরি শিকারির ৭ বৎসরের কন্যা মঞ্জু এবং কেশব শিকারির ১২ বছরের পুত্র গোপাল ২য় শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। ভূপতিপল্লির বিরহড় কন্যা শিবানী শিকারিকে কমঃ

নকুল মাহাতো একরকম জোর করেই ভর্তি করে দিয়েছেন মানবাজারের শুশনিয়ার আদিবাসী স্কুল ও ছাত্রাবাসে। ভূপতিপল্লিতে বিরহড়দের পুনর্বাসন কেন্দ্র ১৯৫৯-৬০ সালে গড়ে উঠলেও দেখভালের অভাবে তা এতদিন চতুষ্পদ জন্তুর আবাসস্থল হিসাবেই ছিল। ঐ গ্রামেই দুজন বিরহড় যুবকের উদ্যোগে কোনরকমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছিল। সম্প্রতি জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের জেলা সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী নকুল মাহাতো এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মন্ত্রী মাননীয়া বিলাসীবালা সহিস তৎসহ প্রশাসনের উদ্যোগে ঐ বিদ্যালয়টির সংস্কার করে পূর্ণ উদ্যমে ঐ এলাকার বিরহড়দের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন এবং সমাজের মূল স্রোতে সম্পূর্ণভাবে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়ায় তাদের মনে আশার আলো। তাদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করতে গিয়ে দেখা গেছে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। নিজেদের অভাব-অভিযোগ এবং সমস্যা সম্পর্কে তারা এখন যথেষ্টই সচেতন। ২০০১ সালের ২১ ও ২২শে জানুয়ারি লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক এবং ঐ পর্ষদের সভাপতি শ্রী নকুল মাহাতো, মন্ত্রী উপেন কিস্কু প্রমুখদের প্রত্যক্ষ উৎসাহে পুরুলিয়া রবীন্দ্রভবনে আয়োজন করা হয়েছিল বিরহড়দের কর্মশালা। সেখানেও তারা নিজেদের অভাব-অভিযোগ এবং বাস্তব সমস্যার কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

সাঁওতালদের মতোই বঙ্গাবুরু তথা প্রাকৃতিক শক্তির এরা উপাসক। নিজেদের তৈরি আলোবাতাসহীন কুম্বার মতো ঘরেই থাকতে এরা বেশি ভালোবাসে। নিজেদের মধ্যে নাচগান এদের সবই আছে তবে নিজেদের প্রকৃত ভাষা কিংবা নাচগান চল্লিশের নীচে বয়ঃক্রমের বিরহড়রা কেউই প্রায় জানে না। সাঁওতালদের দেখাদেখি সাঁওতালদের ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথেই তাই এখন এদের মেলবন্ধন।

অতি দ্রুত বন শেষ হচ্ছে। শেষ হচ্ছে বনের কেঁদ, পিয়াল, ভুঁড়রু, পঁপড়, শিকড়, বাকড় আর চিহড়লতা। অতি সত্বর ব্যবস্থা না নিলে—"দাও ফিরে সে অরণ্য - লহ এ নগর..." বলে পরে আমরা যতোই চেঁচাই না কেন (যা আমাদের অভ্যাস) তখন আর থাকবে না কিছুই। হারিয়ে যাবে আমাদেরই পূর্বপুরুষের এক প্রজাতি। দৈত্যের বাগানের মতোই প্রাণহীন হয়ে খাঁ খাঁ করবে আমাদের এই মনুষ্যসমাজ।

আশার কথা, জেলা প্রশাসনের আন্তরিক চেষ্টায় অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের সাথে সাথে বিরহড়দের উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক শ্রী দেবপ্রসাদ জানার ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রতিটি বিরহড় পরিবারের আবাস নির্মাণ প্রকল্পে প্রতিটি পরিবার পিছু ৭৬,৫৯৬ টাকায় গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বাগমুণ্ডি, বলরামপুর ও ঝালদা ব্লক এলাকায়। এছাড়াও, শৌচাগার, নলকূপ, রাস্তা, কমিউনিটি হল, বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই ভূমিপুত্রদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার প্রয়াসে। ২০০১-২০০২ সালে মঞ্জুরীকৃত ৬১,০১,০০০ টাকার কাজ চলছে তিনটি ব্লকে। চেষ্টা চলছে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রয়াস। রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত অ-সরকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগ এদের কল্যানে এগিয়ে এসেছে। এই সরল সুন্দর অধিবাসীরা উন্নয়নের অংশীদার হোক।

মানভূমের প্রাচীন রাজবংশগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দিলীপকুমার গোস্বামী

মানভূম-পুরুলিয়ার জনজীবনে প্রাচিন রাজপরিবারগুলির প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। রাজবংশগুলির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে এতদ্ অঞ্চলের জনগণের ইতিহাস গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই ভূখণ্ডের সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, প্রত্নসম্পদ, লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও অর্থনীতির উপর গভীর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা এতাবৎকাল পর্যন্ত হয়নি। কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, দামোদরের তীরে তীরে যে অজস্র অফুরান মন্দির-সৌর্ধ প্রত্নসম্পদ ছড়িয়ে আছে কারা তার স্রষ্টা, কোন নৃপতির অর্থানুকূল্যে অথবা কোন শ্রেষ্ঠীর কৃপায় তৈরি হয়েছিল সে সভ্যতা তা খুঁজে বের করাই তো ইতিহাস অনুসন্ধান। এ-কাজ তো দেশেরই কাজ। আধুনিক মানুষ এত বিশাল একটি সভ্যতা সম্পর্কে কেন আলোকদীপ্ত হতে পারবে না, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সারা পৃথিবী জুড়ে যে সামন্ততন্ত্র দীর্ঘ দেড় সহস্র বৎসর জুড়ে তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, ভারতবর্ষেও সেই প্রলম্বিত সামন্তযুগের প্রভা ও দীপ্তি ছিল দীর্ঘস্থায়ী। মানভূম-পুরুলিয়ায় অজস্র সামন্তপ্রভু, ছোট ও বড় জমিদার, মানকি, মাহাত, ঘাটোয়াল এবং রাজারা তাদের অমিত বিক্রম দেখিয়েছে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই এলাকার জন সাধারণ তাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার নিয়ে নিজ নিজ সামন্ত প্রভুদের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে চলতেন। 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার' এই রবীন্দ্রবাণী সারা ভারতের মতো পুরুলিয়াতেও সত্য ছিল। বেশিদিন ও বেশিভাবেই। তার অনেক কারণও ছিল। ভূমিবণ্টনব্যবস্থা ছিল প্রাচিন সামন্তরীতির। জমির খাজনা তো কৃষক দেবেনই তৎসহ কৃষকের জমিতে বড় গাছ থাকলে তার ফল, বড় পুকুর থাকলে তার মাছ জমিদারকে দিতে হত। ভূমিহীন মানুষজন থেকে মধ্যবিত্ত কৃষক পর্যন্ত প্রত্যেকের শ্রম, চাষের উপকরণ, লাঙ্গল, বলদ সবই জমিদার নিজের জোতে ও সংসারের কাজে ইচ্ছে হলেই ব্যবহার করতে পারতেন। বেগার প্রথা সাতের দশকের গোড়া পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। উচ্চবিত্ত কিছু মানুষ, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত শ্রেণী এই কঠিন নিয়ম থেকে ছাড় পেতেন তবে জমিদারি ব্যবস্থাটি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁরাও কিন্তু অন্যভাবে রাজতন্ত্রকে পোষণ করতেন। বেশ কিছু নিম্নবর্গীয় মানুষ—বাউরী, বাগতি, হাঁড়ি, রাজোয়াড়, ভূমিজ, রাজা ও জমিদারের মজুত সৈন্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এখানের প্রজারা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ থেকে ডোম বাউরী মুচি দেশোয়ালী মাঝি বাগতি পর্যন্ত সবাই রাজা, জমিদার, মানকি, মাহাতর গৌরবে নিজেরাই গর্বিত ছিলেন। সামন্তপ্রভুদের প্রতি এই মান্যতা ও আনুগত্য বিস্ময়কর।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতা থেকে বহুদূরে অবস্থান করত বলেই মানভূম-পুরুলিয়ার সমাজ সামন্ততন্ত্রের মত একটি পশ্চাৎপদ সমাজবীক্ষায় অনুগত থাকল দীর্ঘদিন। বাংলাদেশের গঙ্গা বিধৌত সমভূমি সহ কলকাতা নগরী উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের জয়গান শুনে দ্রুত মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। জাগৃতির কূজন আমরা বহুপরে শুনেছি—তাই যুগযুগান্তরের তন্দ্রা থেকে উত্থিত হতে সময় লাগল। শিখরভূমের পঞ্চকোট, পাতকুম, মানভূম, বরাভূম প্রাচীন রাজ্য। তুলনায় নবীন ঝালদা, জয়পুর, বেগুনকোদর, বাঘমুণ্ডি,পাণ্ড্রা, ঝরিয়া। এদের মধ্যে পাতকুম,পাণ্ড্রা, ঝরিয়া বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। পাতকুমকে বাদ দিলে প্রাচিন বজ্রভূমির আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। যেমন—তৈলকম্প ছাড়া এই ভূভাগের ইতিবৃত্ত খণ্ডিত হয়ে যায়। অতীতের এবং অধুনাতনকালের মানভূমের সীমান্তবর্তী কয়েকটি রাজ্যের কথা উল্লেখ না করলে আমাদের দেখার দৃষ্টি সম্পূর্ণ হবে না। সুদূর অতীতে পুষ্করণ রাজ্যটি অত্যুচ্চ গৌরব নিয়ে বিরাজ করত—গুপ্তযুগের এই রাজ্যটি শুশুনিয়া পাহাড় থেকে ৭/৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। ছাতনা, বিষ্ণুপুর, সুপুর, অম্বিকানগর শ্যামসুন্দরপুর প্রভৃতির রাজ্যগুলিতে সামন্ত প্রভুরা বিরাজ করতেন প্রবল প্রতাপে। এদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের সংস্কৃতি ও ইতিহাস অতি উচ্চমার্গের। এছাড়া আছে কুইলাপাল, হেসলা, মুদালি এবং পঞ্চকোটের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও গুরুবংশীয় জমিদারদের অধিষ্ঠানগুলি যেমন—রাজনোয়াগড়, চাকলতোড়, বাবুগ্রাম, জবড়রা, ডুমুরকলা ও গদীবেড়োর আচার্য পরিবার।

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হবে পঞ্চকোট বাদ দিয়ে ঝালদা, জয়পুর, বেগুনকোদর, মানবাজার ও বরাভূম রাজপরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই রাজপরিবারগুলির কোন লিখিত ইতিহাস কোনকালেই ছিল না—ছিল না স্বীকৃত কোন বংশলতিকা। লোকপ্রচলিত কল্পকথায় এবং কিংবদন্তী দিয়ে নির্মিত হয়েছে এখানের ইতিহাস। অবশ্য সম্প্রতিকালে কোন কোন রাজপরিবারের বংশলতিকা ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানভূমের রাজপরিবারগুলির মধ্যে একমাত্র পঞ্চকোটের লিখিত ইতিহাস আছে। পঞ্চকোট রাজ্য সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে পুনরুক্তি হবে বলে বর্তমান প্রবন্ধে তা অনালোচিত রইল।

(১) **ঝালদা রাজপরিবার**ঃ রাজ্যটির উদ্ভবের সঠিক সময়কাল নির্ণীত হয়নি অদ্যাপি। রাজপরিবার স্বীকৃত কোন বংশপঞ্জীও পাওয়া যায় না। ৮/১০ পুরুষের একটি তালিকা পাওয়া যাচ্ছে। তৎপূর্বকালের রাজপুরুষরা কিংবদন্তীর নায়ক বলে অনুমান হয়। রাজাদের যে তালিকাটি পাওয়া যাচ্ছে তাদের সময়কাল সম্পূর্ণই অনুমান নির্ভর।

১। নটবর সিং — ১৭৫০-১৭৮০

২। বিশ্বম্ভর সিং — ১৭৮০-১৮২০

৩। হরিহর (অপুত্রক) — ১৮২০-১৮৬৫

৪। রাজমাধব (হরিহরের সেজভাই) — ১৮৬৫-১৮৮০

৫। বলরাম — ১৮৮০-১৯১০

৬। উদ্ধবচন্দ্র — ১৯১০-১৯৪০

৭। অনন্তনারায়ণ — ১৯৪০-১৯৫৫

৮। অমরনাথ (মৃত্যু) — ১৯৯৪ (৭৫ বৎসর বয়সে)

৯। স্বরূপনারায়ণ সিং দেও-জন্ম — ১৯৪৪ ৫ই আষাঢ়।

নটবর সিং — এর সময়কালে ঝালদা পঞ্চকোট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পঞ্চকোটেশ্বর রঘুনাথ নারায়ণের (১৭৫০-১৭৯৩) সময় হয়েছিল এই অন্তর্ভুক্তি। এই সময়কালটি ধরেই নটবরের

সময়কাল অনুমান করতে হচ্ছে। হরিহরের সময় সিপাহি বিদ্রোহ হয়েছিল, রাজা হাজারীবাগের জেলে ছিলেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে না থেকে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে যোগ দেন। উদ্ধব-চন্দ্রের সময় সত্য কিঙ্কর দত্তকে খুন করা হয়েছিল। উদ্ধবচন্দ্রের সময় ঝালদায় নাটকচর্চা, খেলাধূলা, অর্থনীতি সমস্ত বিষয়ে উন্নতি ঘটেছিল। রাজা নটবর সিং-এর জীবন কাহিনি নিয়ে লেখা 'নটবর চরিত' 'অন্নপূর্ণা' প্রভৃতি নাটক প্রায়ই অভিনীত হত। এসময় নাট্যকার ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র।

ঝালদা রাজবংশের বনবীর সিং ও চয়ন সিং সম্ভবত কিংবদন্তীর রাজা, স্বরূপনারায়ণ সিং দেও বর্তমান জমিদার।

(২) **জয়পুর রাজপরিবার তৌজিনং-০৬ :** 'পঞ্চকোট ইতিহাসে' উল্লিখিত আছে "নারায়ণ সিং নামে কোলজাতিয় একজন ব্যক্তি জয়পুর জমিদারী পরগণায় যাইয়া প্রকাশ করে যে পঞ্চকোটের মহারাজা উহাকে জয়পুর পরগণার ইজারাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন..........জয়পুরের জমিদার ইহাতে ভীত হইয়া পঞ্চকোট রাজের শরণাপন্ন হন এবং মহারাজা জগন্নাথ শেখরের অধিনতা স্বীকার করিয়া বার্ষিক খাজনা দিতে অঙ্গীকার করেন' পঞ্চকোট রাজ জগন্নাথ শেখরের সময়কাল ১৭০৩-১৭১৮ খ্রিস্টাব্দ। অতএব ধরা যায় জয়পুর রাজপরিবারের উৎপত্তিকাল ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি—অন্তত এই সময়ের পরে নহে। কারও কারও মতে পরিবারটির উৎপত্তি ১৭৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দ। এ-ধারণা ঠিক নয় বলেই অনুমান করা যায়।

উজ্জয়িনীর একজন ভাগ্যান্বেষী যুবক জয় সিং জয়পুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জয়সিং-এর নামানুসারে জয়পুর গ্রাম—জয়পুর জমিদারীর নামকরণ। জয় সিং-এর পরবর্তীকালের কয়েক পুরুষের ইতিহাস খুব সম্প্রতি পাওয়া গেল। দুর্জন সিং সপ্তম পুরুষ। সরলমতি ও নিরক্ষর এই রাজার অতি গুনবতী রানী বিদ্যাধরী জয়পুর রাজ পরিবারের গৌরব। মূলতঃ এরই নেতৃত্বে রাজপরিবারটি সর্ববিধ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এ সময় রাণীবাঁধ খনিত হয়। পূর্বতন রাজগড়ের পরিখাগুলি মিলিয়ে রাজাবাঁধ তৈরি হয়। রাজগড়ের সন্নিকটে গৃহদেবতার পূজার জল সরবরাহের জন্য ছোট রাণীবাঁধ খোড়া হয়। প্রতি মৌজায় একটি করে বৃহৎ পুষ্করিণী খোড়া হয়—কৃষিকাজের ব্যাপক উন্নয়ণ হয় এ সময়। এরই আমলে রাজপরিবারটি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুরলীধারীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের সমসময়ে পূর্বতন রাজগড় নির্মিত হয়। বর্তমান গড়টি নির্মিত হয়েছে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। অনুমান করা হয় বিদ্যাধরী ছিলেন বেগুনকোদর রাজপরিবারের রাজকন্যা। দুটি পরিবার প্রায় একই সময় বৈষ্ণব প্রভাবিত হয়েছিল, একসময় ১০৬টি মৌজার অধিকারী হয়েছিল রাজপরিবারটি—এর সমস্ত কৃতিত্বই রাণী বিদ্যাধরীর।

দুর্জন সিং-এর পুত্র মদনমোহন। এর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না। মদনমোহনের তিন পুত্র—রাজা কাশীনাথ সিং, হিকিম গোপল সিং, রাজকুমার দোলগোবিন্দ সিং। কাশীনাথ সিং-এর আমলে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। জয়পুর রাজপরিবারের কেউ এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কাশীনাথ সিং-এর আমলে দুর্গাপূজার সময় খড়ের চালায় আগুন লাগে—রাজা স্বর্ণনির্মিত দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করানোর মানত করেন। এক সের সোনা, রূপা দেড় মণ দিয়ে বেনারস থেকে দ্বিভূজা মূর্তি তৈরি করিয়ে আনা হয়। এখনও জয়পুরে সোনার দুর্গা পূজিতা হন—সারা বছর প্রতিমাটি থাকে পুরুলিয়া States Bank of India-র Locker-এ—পূজার সময় চারদিন পুলিশ হেফাজতে প্রতিমা জয়পুরে আসেন, যথাবিধি পূজা হয়।

কাশীনাথ সিং-এর পুত্র ভিক্ষাম্বর সিং—ইনি দীর্ঘজীবনের অধিকারী হয়েছিলেন। শেষ বয়সে অন্ধ, বধির, প্রায়-অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন। এর তিন রাণী—(১) রুক্মিণী (২) শ্রীমতী (৩) চন্দ্রাবলী।

শ্রীমতির এক পুত্র দুই কণ্যা। চন্দ্রাবলীর এক পুত্র ও এক কণ্যা। ভিক্ষাম্বরের দুই পুত্রই তাঁর জীবিতকালে মারা যান। তিন কণ্যার মধ্যে ছোট রাণীর কণ্যা ব্রজরাজকুমারী ছাড়া অন্য দুজনের বিবাহ ইতিপূর্বেই সাঙ্গ হয়েছিল। মৃত্যুর দু বৎসর পূর্বে ২৪/৯/১৯১৯ তারিখে রাজা এক উইলে লেখেন, "উক্ত ছোটরাণী এক্ষণেও পুত্রসম্ভবা এবং বর্তমানে তাঁহার শ্রীমতি ব্রজরাজকুমারী নাম্নী এক কন্যা আছে। ইহা সেওয়াই আমার বিবাহিত পত্নীর গর্ভবতী না হইলেও আমার ঔরসজাত এক পুত্র আছেন, তাহার নাম শ্রী রঘুনন্দন সিং দেও। শ্রীমান রঘুনন্দন টিঁকাইত হরিনন্দনের সমসাময়িক এবং তাঁহার সহিত একত্র আমার গড় মোকামে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন"। (পৃষ্ঠা-২) তৃতীয় পৃষ্ঠায় লেখেন "........আমার জামাতা শ্রীরণ বাহাদুর সিংহ আমার গড়জয়পুর মোকামে আসিয়া উক্ত দৌহিত্রদের নামে তাবৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দলিল করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।........আমি তাহা করি নাই".......আমার ছোট রাণী অন্তঃসত্তা থাকায় তাহার গর্ভে পুত্র সন্তান জম্মিলে উক্ত পুত্রই আমার তাবৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক ও গড়জয়পুরের রাজা হইবেন।.....

২) ঈশ্বর না করুন যদি ছোট রাণীর পুত্র সন্তান না হয় অথবা উক্ত পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হয়, তাহা হইলে আমার সম্পত্তি দুই সম অর্দ্ধ অংশে উক্ত শ্রীমতি চন্দ্রাবলী দেবী ও শ্রীশ্রীরঘুনন্দন সিংহ মালিক হইবেন।"

১৯২১ সালে ভিক্ষাম্বর সিংহ মারা যাওয়ার পর রঘুনন্দন সিং উইলের শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার জন্য District Judge of Manbhum-Sambalpur-এর নিকট ৬/৬/১৯২১ তারিখে মামলা করেন (Case No. 52,1921)।

তেরজন সাক্ষীর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিচারক W.H. Boyee-৯.৬.১৯২২ তারিখে তার গুরুত্বপূর্ণ রায় দান করেন। এই রায়ে তিনি রঘুনন্দনের অর্দ্ধেক সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার নাকচ করে দেন—"This application of probate is accordingly dismissed with costs."

রঘুনন্দন এই রায়ের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্টে উইল স্বীকৃত হয়। "The appellant, therefore, prays that the judgement and decree of Mr. W.H.Boyee I.C.S. district judge of Manbhum-Sambalpur dt. the 9th June 1922 be set aside and the appeal be decreed and prabate granted."

(Memorandum appeal No. 216,1922)

মূল রাজবাড়ি ব্রজরাজকুমারীর অধিকারে থাকে। দেবসেবার সমস্ত অধিকারও ব্রজরাজকুমারীর পরিবারের আছে। রাঁচি রোডের ধারে ছোট রাজবাড়ি তৈরি হয়। রঘুনন্দন ও তাঁর পরিবার ওখানেই বসবাস করেন।

ব্রজরাজকুমারী ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁর সন্তান বীরেন্দ্রনারায়ণ। ব্রজরাজকুমারীর বিবাহ হয়েছিল সেরাইকেলার ইচা স্টেটের তৃতীয় রাজপুত্র বিদ্যাসুন্দরের সাথে। বিদ্যাসুন্দর সংগীত নাটক চর্চায় জয়পুরে জোয়ার এনেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসুন্দরের মৃত্যু হয়। ভিক্ষাম্বর সিং-এর পর রাজাসাহেব হিসেবে প্রচার পেয়েছিলেন রঘুনন্দন। সকলে তাঁকে রাজর্ষি বলতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সহ বহু জনহিতকর কাজে তাঁর উদ্যোগ ছিল।

রঘুনন্দনের মৃত্যু হয় ৩০/৪/১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর ৫ পুত্র, ৪ কন্যার মধ্যে জীবিত তিন পুত্র শচীনন্দন, বিশ্বমঙ্গল ও প্রাণগৌর বর্তমান আছেন।

রাজপরিবারের গুরুবংশ গোস্বামী পরিবার। পুরোহিত বংশ আচার্য পরিবার। এই দুটি পরিবারের অধিষ্ঠানভূমিও জয়পুর।

১। জয় সিংহ — মুকুন্দ সিংহ — জগন সিংহ

২। সয়ান সিংহ।

৩। মোহন সিং।

৪। ভূপাল সিং।

৫। নারায়ন সিং

৬। অনিরুদ্ধ সিং

৭। রুদ্র সিং

৮। দুর্জন সিং

৯। মদনমোহন সিং — ব্রজমোহন সিং (হিকিম)

১০। কাশীনাথ সিং — গোপাল সিং (হিকিম) (বর্ত্তমানে সিধি)

১১। ভিক্ষাম্বর সিং (১৮৩৮-১৯২১)

১২। ব্রজরাজকুমারী (১৯০১-১৯৯২) — বিদ্যাসুন্দর (মৃত্যু ১৯৩৮)

১৩। বীরেন্দ্র নারায়ণ (জন্ম ১৯২৫ অক্টোবর)

(৩) **বেগুনকোদর রাজপরিবার** — তৌজি নং —০২ জে.এল. নং.—১২৯।

১। হিলোল সিং — দলেল সিং (১০৯০ বঙ্গাব্দ—১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ)

২। বক্রেশ্বর সিং (১৭১৯-১৭৫২)

৩। উদয়নারায়ণ (১৭৫২-১৭৭৩)

৪। রতন সিং (১৭৭৩-১৮০৩)

৫। দিগম্বর সিং (১৮০৩-১৮৫০)

৬। জগন্নাথ সিং (১৮৫০-১৮৮৭)

৭। বংশীবদন - ভীষম্বর (রাজসিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বেই মৃত)

৮। শম্ভুনাথ (১৮৮৭-১৮৯৫)

৯। রাধারাণী (১মা স্ত্রী) (১৮৯৫-১৯০৭)

১০। লোচনকুমারী (২য়া স্ত্রী) (১৯০৭-১৯৬১, ২৮ অক্টোবর)

১৭০০ খ্রিস্টাব্দের সমসময়ে বেগুনকোদর রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা। লোকপ্রচলিত কাহিনি থেকে সময়কালটি অনুমিত হচ্ছে। রাজপরিবার স্বীকৃত কোন কুর্শিনামা না থাকলেও রাজাদের নাম/সময়কাল নির্দ্ধারিত হয়েছে জনগনের সাহায্যে। ১০৯০ বঙ্গাব্দে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে হিলোল সিং ও তাঁর ভাই দলেন সিং উড়িষ্যা থেকে এসে কুড়িরাম গ্রামের মাহাত জমিদারদের সাহায্যে হেটনগর/জাহিরাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। (স্থানটি বর্তমান বেগুনকোদর গ্রামের উত্তরে অবস্থিত)

হিলোল সিং-এর পুত্র বক্রেশ্বরের আমলে জাহিরাবাদ থেকে বর্তমান বেগুনকোদর গ্রামে রাজধানীটির স্থানান্তর হয়। বর্গী হাঙ্গামার ভয়ে রাজধানীর স্থানান্তর হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বক্রেশ্বরের আমলে পঞ্চকোট রাজের সাথে রাজ্যটির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৮৪টি মৌজার জমিদারী দেওয়া হয় বেগুনকোদরকে, নির্দিষ্ট খাজনাও নির্ধারিত হয়। রাজপরিবারটি এ সময় চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের পুরোহিত হিসাবে নিয়ে আসেন বাঁকুড়া থেকে।

বক্রেশ্বরের পরবর্তী রাজা উদয়নারায়ণ। এর আমলে রাজধানীটি পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত হয়।

বিভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট পাড়া/মহল্লা নির্দ্ধারিত হয়। প্রজাদের দেওয়া হয় চাষাবাদ করার জন্য, বসতি করার জন্য জমি। রাজবাড়ি তৈরি হয় এসময়—রাজবাড়ির চতুর্দিকে পরিখা—গড়ের অভ্যন্তরে পুকুর খনিত হয়।

উদয়নারায়ণের পরবর্তী রাজা রতন সিং (১৭৭৩-১৮০৩)-এর আমলে রাজপরিবার বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। শাক্ত থেকে বৈষ্ণব মতে রূপান্তরীত হয় পরিবার টি। একই সময়ে জয়পুর রাজপরিবারও বৈষ্ণব ধর্মমত গ্রহণ করে। ধারণা করা হয় বেগুনকোদরের রাজকন্যা বিদ্যাধরী যিনি জয়পুরের রানি হিসাবে পরম খ্যাতি পেয়েছিলেন, রতন সিং-এর কন্যা অথবা ভগিনী ছিলেন। বীরভূমের জলন্দি থেকে গোস্বামী ব্রাহ্মণদের গুরু হিসাবে আনা হয়। তৈরি হয় গোপীনাথ জিউর মন্দির।

রতন সিং-এর পুত্র দিগম্বর সিং বেগুনকোদরের বিখ্যাত রাসমেলা নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

দিগম্বরের সাত পুত্র। জ্যেষ্ঠ জগন্নাথের নামকরণ হয় পুরীর জগন্নাথের নামানুসারে। এক মেয়ে মুণী। এরই নামানুসারে তৈরি হয় বৃহৎ পুষ্করিণী মুণীবাঁধ। সাত পুত্রের জন্য পৃথক পৃথক স্থানে জমিদারীর ব্যবস্থা করে ভবিষ্যৎ গৃহবিবাদের পথ রোধ করেছিলেন রাজা। এরই চতুর্থ সন্তান জঙ্গরামের সাথে বিবাহ হয়েছিল বরাবাজারের সতেরখানি তরফের একমাত্র কন্যা চিন্তামণী দেবীর।[১] জগন্নাথ সিং-এর সময় রাসমেলার কাজ সমাপ্ত হয়। রাস উৎসব জনপ্রিয় হয়।

জগন্নাথের দুই পুত্র—বংশীবদন ও ভীষম্বর। বংশীবদনের বিবাহ হয় জয়পুর রাজপরিবারে। পিতা জীবিত থাকাকালীনই বংশীবদনের মৃত্যু হয়। ভীষম্বর রাজ্যের দাবীদার হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাজা জগন্নাথ ভীষম্বরের দাবি নস্যাৎ করে বংশীবদনের নাবালকপুত্র শম্ভুনাথকে রাজতিলক দান করেন। শম্ভুনাথের দুই স্ত্রী— হেসলার রাজকন্যা রাধারাণী ১মা স্ত্রী, ২য়া স্ত্রী বুণ্ডুর রাজকন্যা লোচনকুমারী। বিবাহ হওয়ার পর শম্ভুনাথ রাজা হন। খুল্লতাত শম্ভুনাথের সহায়কশক্তি হিসাবে পাশেপাশে থাকতেন। কালের গতি কুটিল, পশুকুলের চেয়েও হিংস্রতায় মানুষ অনেক বেশি পারঙ্গম। সম্পদ ও রাজ্যলোভে ভারতের রাজপরিবারগুলির বহু সর্বনাশ হয়েছে। বেগুনকোদরের শেষ রাজা শম্ভুনাথ মাত্র ৮ বৎসরকাল সিংহাসনারূঢ় থেকে পারিবারিক চক্রান্তে নিহত হয়েছিলেন (১৮৯৫)। জাবর পাহাড়ে শিকারে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় শম্ভুনাথের। সেই শিকার যাত্রায় তাঁর সাথীদের অন্যতম ছিলেন তার খুল্লতাত ভীষম্বর। শম্ভুনাথের দুই স্ত্রী রাধারাণী ও লোচনকুমারী পরবর্তীকালে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন। রাধারাণী ১২ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করে বৃন্দাবন চলে যান। ঝালদাগামী রাস্তার পাশে তিনি জোড়া শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। রাণী লোচনকুমারীর উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব আসে। ভীষম্বর সিং নিজেকে রাজা হিসেবে দাবি করেন— কোর্টেও মামলা দায়ের করেন। লোচনকুমারী রাজকার্যে রাজকর্মচারী, পুরোহিত, গুরুকুল, বুণ্ডু ও জয়পুরের রাজপরিবারের সহযোগিতা পান। পুরাতন রাজবাড়ি পরিত্যাগ করে নতুন রাজবাটী তৈরি করান। গোপালজির মন্দির, রাণীসায়ের, নতুন বাঁধ, রাণীবাঁধ তার আমলে তৈরি। ১৯৫৬ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে রাণী লোচনকুমারী সর্বাগ্রে তাঁর জমিদারি সরকারকে দান করেন। সম্পত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত স্বামীহারা, নিঃসন্তান রমনীর শান্তি হল এতেই।

(৪) **মানবাজার রাজপরিবার** : মানভূমের একটি প্রাচীন রাজবংশ মানবাজার রাজবংশ। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ এই পাঁচ বছর মানবাজারে মানভূম জেলার সদর শহর ছিল। 'মান' রাজাদের নামানুসারে মানভূম জেলার নাম হয়েছে একথা অনেকে বলেন, কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন তথ্য নেই।

মানবাজার রাজপরিবারের কুর্শিনামায় ২৩ জন রাজার নামোল্লেখ আছে, প্রথম রাজা শ্রীশ্রী

পরিমল সিংহ দেব ঠাকুর দ্বাদশ শতাব্দীতে বাজস্থানের "মোহব্বায়" গড় নির্মাণ করেন। এদের গোত্র চন্দ্রঋষি, কুলদেবতা দাউজী—শ্রীশ্রী রেবতী বলরামচন্দ্র ঠাকুর জীউ—কুলদেবী কংকালী, হাতিয়ার ভোগ্যা, পাগ-ঢেঁড়া, ঘোড়া-সুবং নদী-নর্ম্মদা।

এই বংশের চতুর্থ রাজা অনন্তনারায়ণ ওরফে জয়মান প্রথমে বর্ধমান জেলার কটা মানকরে রাজ্য স্থাপন করেন। সেখান থেকে বর্তমান পুরুলিয়া জেলার শিখরভূম এলাকার ক্রোশজুড়িতে (কাশীপুর থানা) রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে গড় ও মন্দির নির্মিত হয়। ক্রোশজুড়িতে তিনি মানেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন (ক্রোশজুড়ির শিব সিদ্ধেশ্বর বলে পরিচিত)। মানকর থেকে আসার সময় তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় বীরভদ্র রায় নামক এক ব্রাহ্মণকে স্বপুত্র-পত্নী সহযোগে নিয়ে আসেন। এই বীরভদ্র রায় জয়মানের শিশু সন্তানকে পালন করেছিলেন বলে মানবংশের লোকেরা বীরভদ্রের গোত্র 'ভরদ্বাজ' গোত্র গ্রহণ করেন। জয়মানের পুত্র স্বরূপ নারায়ণের পালক-পিতা বলে বীরভদ্রের পরিবারের সহিত রাজপরিবারের সম্পর্ক এখনও অটুট আছে। এখনও ইন্দ পরবের দিন ও বিজয়া দশমীর দিন রায়বংশের মানুষেরা রাজাকে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন—রাজাও সম্মানার্থ পান দান করেন ও প্রণাম করেন।

এই সময় কংসাবতী নদীতীরস্থ বুধপুর গ্রামে সরাক জাতির মানুষরা বসবাস করতেন। তারা ছিলেন ব্যবসায়ী—কৃষিজীবীও। কিন্তু এতদ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ভূমিজ জাতির লোকেরা তাদের নিরন্তর উৎপীড়ন করত। সরাকজাতির লোকেরা অনন্তনারায়ণকে রাজ্য স্থাপনার্থে বুধপুরে আহ্বান করেন—ফলত অনন্তনারায়ণের বাজধানী বুধপুরে স্থানান্তরিত হয়। নতুন রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয। স্বরূপনারায়ণসহ পরবর্তী কালের সমস্ত রাজাদের নাম-পরিচয় পাওয়া গেলেও কোন রাজা কখন বুধপুর থেকে মানবাজারে রাজধানী স্থানান্তর করেন সে বিবরণ পাওয়া যায়নি।

তবে মানবাজার রাজধানীর শেষ রাজা হলেন হরিনারায়ণ—তিনি ১৭৬৭ সালের প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের দেওয়ানি পেয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মানবাজারের খাজনা ৪৪১ টাকা, বরাভূমের ৩১৬ টাকা ধার্য করেন। বরাভুম-মানভূম-সুপুর-অম্বিকানগর-কুইলাপাল-ঘাটশিলা গোটা এলাকায় ১৭৬৭ থেকে ১৮৩২ এই ৬৬ বৎসর ধরে পরপর তিনবার দুর্ধর্ষ চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। মানবাজারের রাজা হরিনারায়ণ, বরাভূমের বিবেকনারায়ণ এই বিদ্রোহের প্রথম সারির নেতা। "মেদিনিপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট ছিলেন জন গ্রাহাম। তিন চার কোম্পানি সিপাহিও কয়েকজন ইউরোপীয় সার্জেন্টসহ তিনি এনসাইন জন ফার্গুসনকে অভিযান পরিচালনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঝাড়গ্রাম ও বলরামপুর হয়ে ফার্গুসন মানভূমে পৌছেছিলেন ৬ই মার্চ, ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে।"

"অষ্টাদশ শতকের শেষে ফার্গুসন সাহেবের অতর্কিত পল্টন বাহিনির তোপের মুখে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি রাজা হরিনারায়ণের সর্দার পাইক বাহিনি। হরিনারায়ণ যুদ্ধে পরাস্ত হন। ইংরেজরা তাকে বন্দী করে মেদিনীপুর জেলে নিয়ে যান। বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। পুরাতন রাজবাড়িটি ইংরেজদের ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

মানবাজার রাজবাড়িটি ছিল হাটতলার পিছন দিকে। হরিনারায়ণ মানবাজারের শেষ রাজা। এরপর রাজধানী স্থানান্তরিত হল পাথরমহড়ায়। হরিনারায়ণের পুত্র 'কুশধ্বজ' পিতার জীবিতকালেই মারা যাওয়ায় তাঁর রাজা হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। মুকুন্দ নারায়ণ পাথরমহড়ার গড় তৈরি করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সমসময়ে তিনি রাজা ছিলেন। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহে তিনি অংশ নিয়েছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। মুকুন্দ নারায়ণের ৪র্থ/কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রিপুরাচরনের সাথে জমি সংক্রান্ত

বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ সূত্রে ডেপুটি কমিশনারের নিকট মুকুন্দনারায়ণ বিচার প্রার্থনা করেন। সম্ভবত মুকুন্দনারায়ণ সিপাহি বিদ্রোহের অগ্নিময় দিনগুলিতে কোম্পানির পক্ষ নিয়েছিলেন। কারণ রাজপরিবারের হস্তলিখিত পুস্তকে লিখিত আছে— "তিনি (ডেপুটি কমিশনার) মুকুন্দনারায়ণের সাহায্যে ট্রেজারি ও আদালত সংক্রান্ত কাগজপত্র রক্ষার ভার দিয়া ও মুকুন্দনারায়ণ দেবকে প্রকৃত জমিদারীর হকদার জানিয়া রাজা হইবার হুকুম দেন" (১৮৫৯ সালে ১৩১৩ নং রোজনামচার হুকুম)। "১৮৫৯/১৮ই জুলাই শ্রীল শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেবের পরওয়ানার আদেশমতো মানাবনীনাথ রাজা শ্রীশ্রী মুকুন্দনারায়ণ দেব যে কুরশিনামা দাখিল করেন তাহার নকল দৃষ্টে লিখিত হইল" (রাজবাড়ির হস্তলিখিত ইতিহাস)। মুকুন্দনারায়ণ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ই বৈশাখ দেহত্যাগ করেন। মুকুন্দনারায়ণ দেব ছিলেন অতীব সুন্দর দেহের অধিকারী, সাহিত্যানুরাগী ও ভক্তকবি। তার সহযোগিতায় রাজপরিবার থেকে গ্রন্থও প্রকাশিত হত।

সভাকবি শ্রীরামসুন্দর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সাহায্যে "শ্লোকার্থবোধিকা" নামের একটি গ্রন্থ 'মানাবনীনাথ রাজা' ১৭৯২ শকাব্দায় প্রকাশ করেন, গ্রন্থটি রাজপরিবারে রক্ষিত আছে।

উল্লেখ্য মানবাজার রাজপরিবার শ্যামদামোদর (৫ম) নারায়ণদেবের সময় থেকে "মানাবনীনাথ রাজা' হিসাবে পরিচয় দেন। অর্থ সম্ভবত "মানভূমের অবনীনাথ"। মুকুন্দনারায়ণ দেব থেকে বর্তমান জমিদার দেবাশিস নারায়ণ দেব (জন্ম ১৯৫৩) পর্যন্ত ৭ জন রাজা এই পরিবারে রাজ্য পরিচালনা করেন।

(১) মুকুন্দনারায়ণ দেব (২) কিশোরী প্রসাদ নারায়ণ দেব (৩) রাধাগোবিন্দ নারায়ণদেব (অপুত্রক) (৪) রাণী শ্রীমত্যা কালীকুমারী দেব্যা (৫) ভবতারণ নারায়ণ দেব (৬) ভক্তনারায়ণ দেব (৭) দেবাশিষ নারায়ণ দেব।

এদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ নারায়ণ দেব ছিলেন অপুত্রক। তাঁর রাণী কালীকুমারী দেব্যা রাজ্যাধিকারিণী হন। তিনি অপুত্রক থাকায় হিকিম রাধামাধব নারায়ণ দেবের পুত্র ভবতারণ রাজা হন।

রাণী কালীকুমারী দেব্যার আমলে প্রথম L.S.Record তৈরি হয়। রাজ্যের খাজনা হয় ১৭০২ টাকা, সেস্ ৬৫৯৬ টাকা। মানবাজার রাজ্যের মৌজা ছিল ৩৮০টি, আয়তন ছিল ৪০৮ বর্গমাইল। বর্তমান রাজবাড়িটি ও তৎসংলগ্ন দেবস্থানটি অতীব সুন্দর—পরিবেশ নান্দনিক। রাজপরিবারের মানুষজন শোভন সুন্দর ও সুজন।

বরাহভূম রাজ্য : দক্ষিণ মানভূমের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য বরাহভূম। পঞ্চকোট ও পাতকূমের পরই প্রাচীনত্বে বরাহভূমের স্থান। রাজস্থান-জয়পুরের এক রাজপুত্র নাথ বরাহ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় কাল ২১০ সম্বত। সম্বতের সাথে ৫৭ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ হয়। অতএব ২৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধরা হয়। যদিও সময়কালটি সম্পর্কে বিতর্ক আছে।

রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে, তা নিম্নরূপ — "বিরাট প্রদেশগত এক ক্ষত্রিয় রাজা সপরিবারে শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যাইতেছিলেন। এক সন্ধ্যায় রাজা সতের খানি তরফের সন্নিহিত 'রূপসান' নামক গ্রামে তাবু সন্নিবেশ করিলেন। সেই স্থানে রানি দুই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। ....রানি সদ্যোজাত শিশু যুগলকে পর্বতের উপর ফেলিয়া দিলেন। ক্বচিৎ বন্য বরাহী কুমার যুগলের সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া স্তন্য দানে তাহাদিগকে রক্ষা করেন। বরাহ-দুগ্ধে বালকদ্বয়ের দেহ রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের নাম শ্বেত বরাহ ও নাথবরাহ হয়। পরন্তু রাজপুত্র থাকা হেতু

তাহাদের মস্তক কিছুতেই অবনত হইত না। ক্রমশ বালকদ্বয়ের সৌন্দর্য ও বীরত্ব দেখিয়া পাতকুমপতি তাহাদের সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মাদিগের অভিযোগে তোরণদ্বারে জ্যেষ্ঠের শিরচ্ছেদ ও দানসূত্রে কনিষ্ঠভ্রাতা দ্বারা বরাহভূমরাজ্য স্থাপন।"[১]

বরাহভুম রাজ্যটির এলাকা ছিল ৬৪২ বর্গমাইল। রাজ্যটির অধিকাংশ স্থান ছিল পর্বত ও গভীর জঙ্গলময়। যাতায়াতে দুর্গম। রাজা ও সর্দারগণ দুর্গম পর্বত পরিখাবেষ্টিত উপত্যকায় বাস করতেন।

বরাহভূম রাজ্যটির অধীনে চারটি প্রধান 'তরফ' বা বিভাগ আছে।

১) সতের খানি ২) পঞ্চসর্দারী ৩) ধাদকা ৪) তিনসওয়া। তরফ সর্দারগণ সকলেই স্বাধীনভাবে রাজ্য চালনা করতেন। সর্দাররা সকলেই বরাহ রাজার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন—যুদ্ধকালীন সময়ে রাজাকে সৈন্য/সর্দার দিয়ে সহায়তা করতেন।

রিজলী (রিসলে) সাহেবের মতে বরাহভূম রাজ পরিবার ভূমিজ জাতি সম্ভূত। যদিও রাজপরিবারের লোকেরা নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবি করেন। "বরাহভুম রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ও তৎঅগ্রজ ছিলেন বৈরাট (বয়বাট) নগরের ক্ষত্রিয় রাজকুমার।"[২]

রাজ্যপ্রতিষ্ঠা থেকে শেষ জমিদার হরিশ্চন্দ্র দেব পর্যন্ত ৪৯টি রাজার নাম, তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু সন তারিখ সহ পাওয়া যায়।[৩] বরাভূম রাজ্যটির ইতিহাস গৌরবজনক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পরিবারের অবদান অপরিসীম। তবে এই পরিবারের লড়াই-সংগ্রামের যথাযথ মূল্যায়ন হয় নি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভের সাথে সাথে সমগ্র এলাকায় নতুনভাবে খাজনা ধার্য করলেন। বরাভূমের খাজনা হল ৩৬১ টাকা। স্বাধীনচেতা বরাভূমবাসী বাইরের রাজশক্তিকে কোনদিন খাজনা দেয় নি। খাজনা সম্পর্কে এদের কোন ধারণা (conception) ছিল না। কারণ দুর্গম অঞ্চলের রাজারা মনুষ্যবসতির জন্য বাইরের মানুষকে ডেকে এনে বসাতেন—জঙ্গলকেটে যাতে কিছুটা বসতি তৈরি হয়। খাজনা দেওয়ার চেতনা তখনি সমৃদ্ধ হবে যখন জমির উৎপাদন লাভজনক হবে। এ-জমিতে কখনো লাঙল পড়ে নি।

১৭৬৭ সালে বরাভূমের ৪০ তম রাজা ছিলেন বিবেকনারায়ণ (৩য়)। ইনি প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা—বরাভূমের শেষ স্বাধীন রাজা। চুয়াড় বিদ্রোহের বিস্মৃত বর্ণনা অন্যত্র আছে — এখানে শুধু ঘটনাক্রমটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

১৭৬৭ থেকে ১৮৩২ — ৬৬ বৎসরে পর পর তিনবার বিদ্রোহ হল। যেগুলির নেতা বরাভূম রাজবংশ। এদের বীরত্বের আর পরাজয় বরণের মর্মস্পর্শী ইতিহাসের বেশির ভাগই অজানা। গভীরতর গবেষণায় সেসব কাহিনি উন্মোচিত হলে মানভূমের ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে। ৯ বৎসরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর বিবেক নারায়ণ পরাজিত হলেন। স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিলেন। বিবেক নারায়ণের দুই ছেলে। (১) রঘুনাথ নারায়ণ ২) লছমন সিং। লছমন পাটরানীর ছেলে — আইনত তারই রাজ্য পাওয়ার কথা। কোম্পানি কিন্তু অন্যায়ভাবে রঘুনাথ নারায়ণকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিল। লছমন বিদ্রোহ করলেন। বন্দী হলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল। এরই সন্তান গঙ্গা নারায়ণ। — পরবর্তী কালে যিনি চুয়াড় বিদ্রোহের ভিসুভিয়স। গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহে তার স্বাধীনচেতা পিতামহর আত্মা হয়ত শান্তি পেয়েছিল। সে কাহিনি পরে বলছি। রঘুনাথনারায়ণ মারা যান ১৭৯৬

[১] লালসিংহ বা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসেব এক অধ্যায়—হবিনাথ ঘোষ ,পৃঃ ১১-১২

[২] মহাভারতীয় যুগের বিরাট বাজ্য ও তাহাব পরিণতি—শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেব পৃঃ- ১৭

[৩] ঐ। পৃঃ ২৪, ২৫, ২৬।

অথবা ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ। মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকারীর প্রশ্নে মেদিনীপুর কোর্টে মামলা হল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কোর্টের আদেশে গঙ্গা গোবিন্দ রাজা হলেন। মাধব সিং হিকিম হলেন দেওয়ান। দেওয়ান হয়ে মাধব সিং অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। ওদিকে পঞ্চসর্দারী তরফে থাকতেন গঙ্গানারায়ণ। তাঁর পিতা রাজ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায়, বন্দী হওয়ায়, বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ক্ষোভ ছিলই। কিন্তু এই ক্ষোভ অনেকগুন বেড়ে গেল নানাকারণে। মাধব সিং গঙ্গা নারায়ণের ন্যায্য প্রাপ্য পঞ্চসর্দারী তরফও কেড়ে নিলেন। গঙ্গা নারায়ণ স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের মাধব সিং-এর কাছে রেখে তীর্থদর্শনে বেড়িয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন মাধব সিং তাঁর স্ত্রী পুত্রদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। আগুনে ঘৃতাহুতি। এরপর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেখলেন গঙ্গা নারায়ণের রুদ্ররূপ। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ২রা এপ্রিল মাধব সিং জমিদারী দেখতে বেরিয়েছিলেন। গঙ্গানারায়ণ এক কোপে তার ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিলেন। বিদ্রোহের সূচনা হল। ১৭৬৭-এ যে বিদ্রোহের সূচনা বিবেক নারায়ণের নেতৃত্বে ১৮৩২-এ তার সমাপ্তি 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামায়'। ৬৬ বৎসর ধরে চলছিল বরাভূমের স্বাধীনতার যুদ্ধ। চোয়াড়দের যুদ্ধ। বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র আছে। গঙ্গানারায়ণ ৯ মাস যুদ্ধ করে পরাজিত ও হত হয়েছিলেন। তাঁর মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য বহু আত্মীয়-স্বজনকে ডাকা হয়েছিল। এরপরই ১৮৩৩-এ নতুন জেলা 'মানভূম' গঠিত হল। গঙ্গা নারায়ণের বিদ্রোহই জেলা তৈরির মূলে একথা অনেকে বলেন।

চুয়াড় বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল ভূমিজ, কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতির মানুষরা। তাঁদের দিনযাপনে —প্রাণধারণে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করেছিল। তারাও কোম্পানির এই বেয়াদপি রেয়াৎ করেনি।

বরাভূমের আরেক বীর সন্তান লাল সিংহ। তিনি সতেরখানি তরফের জমিদার ছিলেন। এঁর বীরত্বে কাহিনিও রোমহর্ষক। এর বীরত্বের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র আছে।

গঙ্গানারায়ণের দুই ছেলে—বলরাম ও গোপীনাথ। বাগালবাঁধ গ্রামে গঙ্গা নারায়ণের বংশের লোকেরা থাকতেন। পাতকুমে গঙ্গা নারায়ণকে 'সিংহাসুর' বলা হত।

"জীও জীও বীর গঙ্গানারায়ণ সিংহাসুর
কলিতে কে উঠালো রণেরই অঙ্কুর
জয়তু বীর গঙ্গানারায়ণ"।

বরাভূম জমিদারীর বর্তমান জমিদার রামকৃষ্ণ সিংহদেব—সুভদ্র, সুজন। প্রাসাদ জরাজীর্ণ। দেবস্থল যথাযথ আছে। সমস্ত কিছুই রক্ষণাবেক্ষণ করা ইতিহাসের প্রয়োজনে জরুরি।

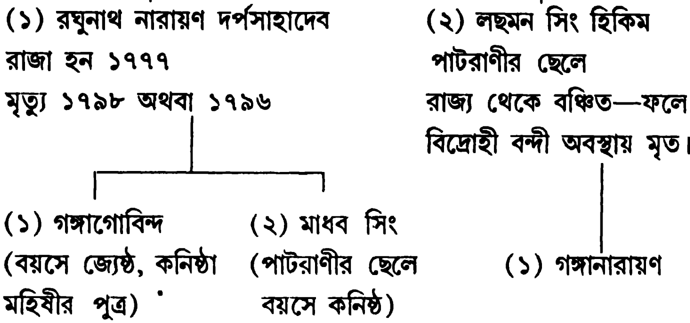
একটি গল্প বলে শেষ করা যাক প্রবন্ধটি।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। রাজপ্রাসাদের দেবস্থলে এলেন এক সন্ন্যাসী। জটাজুটধারী। বৃদ্ধ তবে শালপ্রাংশু মহাভূজ। দেবতার প্রসাদ প্রার্থনা করলেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব কিছু। প্রসাদ পেয়ে বিদায় নিলেন সন্ন্যাসী।

লেখককে একজন বলেছেন, ওই সন্ন্যাসী ছিলেন গঙ্গা নারায়ণ। ১৮৩২ সালে যাঁর মৃত্যুতে স্বস্তি পেয়েছিল শাসকশ্রেণী।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবে কল্পনা করতে ভাল লাগে।

এমনটা যদি সত্যি হত!



বাঘমুণ্ডি রাজপরিবার

অযোধ্যাপাহাড়ের দক্ষিণাংশে বর্তমান বাঘমুণ্ডি গ্রামটিকে কেন্দ্র করে একটি রাজপরিবার অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ৮৪টি মৌজাবিশিষ্ট ১৫৫ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে রাজ্যটির বিস্তার। পূর্বে সাঁকা নদী— পশ্চিমে দুয়াসিনী (কালিমাটি) — উত্তর পশ্চিমে মামুড়ি (বেগুনকোদর-সংলগ্ন)। উত্তরে মুদালি, সাকারমবেড়্যা, বঙ্গাদা গ্রাম। রাজ্যটির মৌজাগুলি ৫ ভাগে বিভক্ত ছিল— মূল অংশীদার ছিলেন রাজা। বাকি মৌজাগুলি ৪ জন মানকির অধীনে ছিল। (১) কালিমাটি (২) সুইসা (৩) সারজুমাহাত (৪) শশ - এই চারজন মানকি ছিলেন রাজার অধীনে — প্রত্যেক মানকির অধীন ছিল ১২টি করে মৌজা। এলাকায় সামন্ত ব্যবস্থা ছিল আদিম। ভূমিব্যবস্থায় ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা চালু ছিল। বরাভূম রাজ্যটির সংলগ্ন হওয়ায় ভূমিব্যবস্থা ও রাজ্যশাসন প্রণালীও ছিল ঐ রাজ্যটির অনুরূপ।

অনেকের মতে, রাজবংশটি ভূমিজ বংশসম্ভূত যদিও রাজপরিবার তাঁদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। এলাকার আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে রাজপরিবারটির গভীর সংযোগ ছিল। কুলদেবতাও আদিবাসী দেবতা — মারাংবুরু, বুঢ়ালাল, সিঁদুরপেটা। যদিও সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে রাজপরিবারটি হিন্দু ও বৈষ্ণব ভাবাদর্শে দীক্ষিত হন — রাধাগোবিন্দ ও কুল দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি পান।

রাজবাটীর অবস্থান বাঘমুণ্ডি গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে—প্রায় পাহাড়ের পাদদেশে। গড়টি বর্ত্তমানে জীর্ণ ও দৈন্যদশা প্রাপ্ত হয়েছে। তবে অতীত যে উজ্জ্বল ও গৌরবের ছিল তা গভীর গভীর পর্যবেক্ষনে স্পষ্ট হয়। গড়ের চতুঃস্পার্শে ছিল অসংখ্য পুষ্করিণী—পূর্বদিকে কমলাবাঁধ, রানীবাঁধ, নতুন বাঁধ—পশ্চিমদিকে সায়ের—পুষ্করিণীগুলি পরিখার কাজ করত। রাজবাটীর উত্তরে ছিল রাধাগোবিন্দের টেরাকোটা মন্দির। মন্দিরটি বর্ত্তমানে জীর্ণ, পরিত্যক্ত। বৃহৎ বনস্পতিকূল মন্দিরের উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছে। রাজবাটীর দক্ষিণাংশে উন্মুক্ত ও বিস্তৃত প্রাঙ্গন একদা পুষ্পশোভিত থাকত। একটি টেরাকোটার নবরত্ন-রাসমন্দির এখানে আছে। দুর্গামেলাটি পশ্চিমমুখী, বামপার্শ্বে জ্যোতিপ্রসাদ সিংহদেবের আবক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। একটি ছায়াপ্রসন্ন কদম্ববৃক্ষ সমুন্নত মহিমায় দণ্ডায়মান। অতিথিবৃন্দের শ্রান্তি দূর করার দায়িত্ব নিয়েছে বৃক্ষটি। মুসলমান পাড়ায় একটি ধ্বংসম্মুখ পঞ্চরত্ন শিবমন্দির। এটিও টেরাকোটার। অষ্টাদশ শতকের তৈরী।

রাজবংশের স্বীকৃত কোন কুর্শিনামা নেই। কিছু সুধীবৃন্দের স্মৃতিচারণায় নিম্নোদ্ধৃত বংশলতিকাটি তৈরী করা গেছে। বর্তমান জমিদার ভবানীপ্রসাদ সিংহদেব থাকে বাঘমুণ্ডিতে। এঁর এক অগ্রজ সমরেন্দ্রনাথ থাকেন ভবানীপুরে। ভবানীবাবুর নামানুসারে ভবানীপুর গ্রাম। রাজ পরিবারের একটি শাখা থাকেন তুম্ভুডি গ্রামে। মদনমোহন সিংহদেবের সমসময়ে বাঘমুণ্ডি ছৌ নৃত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ছৌ-উৎসব সমাজের প্রধান উৎসব হয়ে ওঠে। বহু ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেলে রাজ্যটি এ-সময় encombered State ঘোষিত হয়। বর্গীদের দ্বারা রাজবাটী আক্রান্ত হওয়ার একটি কল্প কাহিনী এলাকায় প্রচলিত আছে। এই এলাকায় কোন বর্গী আক্রমণ হয়নি এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

ভূপনাথ সিংহদেব
হৃদয়নাথ সিংহদেব
ব্রজগোপাল সিংহদেব
মদনমোহন সিংহদেব

ক্ষেত্রমোহন	রবীন্দ্রনাথ	গোরাচাঁদ	রামচন্দ্রসিংহদেব	
জ্যোতিপ্রসাদ	নগেন্দ্রনাথ	ব্রজেন্দ্রনাথ	সমরেন্দ্রনাথ	ভবানীপ্রসাদ
(মৃত)	(মৃত)			

এই প্রবন্ধটি লিখতে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি—

১) বলবাম কৈবর্ত
তুষার চক্রবর্তী
কালিপদ কর্মকার
—বেগুনকোদর
} বেগুনকোদর

(২) শঙ্কব নাবাযণ সিং দেও — জয়পুর বাজবাটী
(৩) দেবাশিস নারায়ণ দেব — মানবাজার রাজবাটী
(৪) রামকৃষ্ণ সিংহ দেব - বরাবাজার রাজবাটি।

কোম্পানির আমলে মানভূমে ঘাটোয়ালি পুলিশ ব্যবস্থা

ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু

১৭৫৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধে বিজয়ী হল। ১৭৬৫ সালে মীরকাশিমের কাছ থেকে দেওয়া বাংলা, বিহাব ও ওড়িশার দেওয়ানিকে স্বীকৃতি দিলেন ভারতের মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আলম। এব সঙ্গে যুক্ত হল কোম্পানির ছোটনাগপুর এবং তার অধীনস্থ পরগনাগুলি এবং অন্যান্য উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল রামগড়, পালামৌ এবং পাচেট। যেগুলি পূর্বে মুঘল 'সুবা' বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৭ সালে শুরু হয়েছিল পাহাড়িয়া অঞ্চলে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশ। মেদিনীপুরের পশ্চিমে জঙ্গল মহালের (দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং মানভূম, যার মধ্যে বর্তমান পুরুলিয়া অন্তর্ভুক্ত) জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফার্গুসন। তাঁকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হযেছিল তিনি যেন এলাকার রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে আদায় করার ব্যবস্থা করেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিয়েছিল ১৭৯৮-৯৯ সালে উপজাতি বিদ্রোহ, যা ইংরাজদের ইতিহাস বইতে লেখা হয়েছে "চুয়াড় বিদ্রোহ" বলে। "চুয়াড" অথবা "দস্যু" শব্দটি ইংরাজরা উপজাতিদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করত।

১৭৯৩ সালে ২২নং রেগুলেশন অনুযায়ী একটি নতুন কর বসানো হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল ওই করের আদায়িকৃত অর্থ দিয়ে জঙ্গল মহালে নতুন দারোগা ব্যবস্থার খরচ মেটানো। ভূমিজ সরদাররা একে তাঁদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়েছিল বর্তমান পুরুলিয়ার পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত বরাভূম পরগনায়। ১৭৯৮ সালে এই অঞ্চলের সতেরোখানি তরফের সরদার লাল সিং এর বিদ্রোহের সাফল্য কোম্পানির পক্ষে খাজনা আদায় প্রায় অসম্ভব করে তুলল।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের দশ-সালা বন্দোবস্তের সময়ে স্থানীয় 'রাজা' (প্রকৃত অর্থে 'চীফ' বা সামন্ত)-র অধীনস্থ এক একটি স্থান 'পরগনা' বলে বিবেচিত হত। পরগনাগুলি আবার 'তরফ' এ বিভক্ত ছিল। বরাভূম (বরাইভূম) পরগনা চারটি তরফে বিভক্ত ছিল। যেমন, সতেরোখানি, তিনসওয়া, বাটালুকা এবং পঞ্চসরদার। এই চারটি 'তরফ' এর প্রধানরা তরফদার, জমিদার বা তালুকদার বা সরদার বলে অভিহিত হতেন।

সরদারগণ বরাভূমের রাজার প্রতি নামেমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করে নিজ নিজ এলাকায় প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বরাভূম পরগনা ও পুরুলিয়ার দক্ষিণে সতেরোখানি তরফের অবস্থান। একশো বর্গমাইল স্থান জুড়ে এই সতেরোখানি তরফের অবস্থান।

এটি পুরোপুরি পাহাড়ি অঞ্চল। নীচ দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী বয়ে গেছে। প্রাকৃতিক দিক থেকে স্থানটি বন্ধুর, অনুর্বর এবং পাথুরে।

লাল সিং সতেরোখানি তরফের সরদার ছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে তাঁর পূর্বপুরুষেরা বাটালুকা গ্রামে বাস করতেন। এই গ্রামের উত্তরে খাঁড়ি পাহাড়ি নামে অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। লাল সিং এর বংশের প্রথম পুরুষের যে নাম পাওয়া যায় তার সাথে খাঁড়ি পাহাড়ি নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। এর নাম ছিল খাঁড়ি পাথর।

লাল সিং এর যে বংশলতিকা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় তিনি ওই বংশের পঞ্চম পুরুষ। এঁদের মধ্যে খাঁড়ে পাথর ভূমিজ সরদার হিসেবে হয়ত কিছু খ্যাতি অর্জন করে থাকবেন, কারণ ওই অঞ্চলের লোকমুখে শোনা যায় যে তিনি প্রতিবেশী পাতকুম রাজ্যের জনৈক রাজা বিক্রমাদিত্যের সাথে সাফল্যের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে প্রতিবেশীদের সাথে লড়াই কোনো নতুন ঘটনাও নয়।

এই বংশের অন্যান্য সরদারদের সম্পর্কে ইতিহাস প্রায় নীরব। কেবল লাল সিং-এর পিতা ত্রিভন সিং-এর সাথে বরাভূম রাজার লড়াই সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ত্রিভন সিং ছিলেন এক শক্তিশালী সরদার। তিনি তাঁর বিশাল 'চুয়াড়' বাহিনী নিয়ে নিকটস্থ শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, সুপুর, ধলভূম এমনকী বরাভূম রাজ্য মাঝে মাঝে আর্থিক লাভের আশায় আক্রমণ করতেন। এককভাবে ত্রিভন সিং-এর সঙ্গে কিছুতেই যুঝে উঠতে না পেরে বরাভূমের রাজার নেতৃত্বে অন্যান্য পরগনার প্রধানদের নিয়ে এক সম্মিলিত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হল। যার শেষ পরিণতিতে ত্রিভন সিং পরাস্ত ও নিহত হলেন বাটালুকার প্রান্তভাগে কাটারনঞ্জা পাহাড়ের নীচে।

ত্রিভন সিং-এর নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁর বিধবা স্ত্রী শিশু পুত্র লাল সিংকে নিয়ে কিছুকালের জন্য পাহাড়ের গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করলেন। তারপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে তিনি পুত্রকে নিয়ে সতেরোখানির অন্তর্গত সারিগ্রামে ফিরে আসেন। সেখানে প্রজারা অর্থাৎ হো, ভূমিজ, সাঁওতালরা লাল সিংকে সরদার বলে ঘোষণা করলেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে লাল সিং তাঁর প্রতিবেশী অন্যান্য সরদারদের রাজ্য (তরফ) আক্রমণ করে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে শুরু করেন। অবশ্য একই সাথে বরাভূমের রাজা রঘুনাথ নারায়ণ (প্রকৃত অর্থে বৃহৎ জমিদার) কে নিয়মমাফিক বাৎসরিক দু'শো পঞ্চাশ টাকা কর প্রদান করে আনুগত্য জানাতেও কোনো ত্রুটি রাখেন নি। এ সম্পর্কে ইংরাজদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। "লাল সিং নিজের এলাকা থেকে বহুদূরে অন্যান্য জমিদারির বহু অঞ্চল দখল করেছেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ওইসব অঞ্চল অধিকার করেছেন।" কিন্তু লাল সিং-এর এই সাফল্য ছিল স্বল্পস্থায়ী। অতি উৎসাহে পাঁচ সরদারের মধ্যে চারজন তাঁর হাতে নিহত হলে রাজা তাঁকে বাধ্য করেন বরাভূম ছেড়ে নির্বাসনে যেতে। (বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল জুডিসিয়াল কনসালটেনস, ইং ১১ জুলাই, ১৮০৫ (১২৯/১৪) ; উদ্ধৃতির জন্য, ভূমিজ রিভোল্ট ; জে সি. ঝা, পৃঃ ১১৯)

ঘাটশিলার রাজা (ধলভূম) যিনি একদা লাল সিংয়ের পিতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণকারী বাহিনীর অন্যতম নেতা ছিলেন, তাঁর রাজ্য লাল সিং আক্রমণ করে কুড়িটি গ্রাম দখল করে নেন। ফলে রাজা জগন্নাথ ধলের সাথে লাল সিংয়ের এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। এই লড়াইয়ের ফলাফল সম্পর্কে জঙ্গল মহালের ম্যাজিস্ট্রেট হেনরী স্ট্রাচি লিখেছেন যে, শেষ পর্যন্ত লাল সিং পরাস্ত হয়ে বিজিত গ্রামগুলি ফেরত দিতে বাধ্য হল।

স্ট্রাচির রিপোর্ট ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল লেখা হয়েছিল। কিন্তু মনে হয় এরপরও লাল সিং হতোদ্যম না হয়ে আবার আক্রমণ করে ঘাটশিলা জমিদারির বেশ কয়েকটি গ্রাম পুনরায় দখল করেছিলেন। এর প্রমাণ সরকার থেকে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে যে "ইসামনবিশী" (নামের তালিকা) তৈরি করা হয়েছিল ঘাটোয়ালি জমি সম্পর্কে তার মধ্যে ঘাটশিলার বেশ কয়েকটি গ্রামকে দেখানো হয়েছিল লাল সিং-এর পুত্র পঞ্চানন সিং-এর নামে। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে রঘুনাথ নারায়ণের মৃত্যুর পর যখন উত্তরাধিকারীর প্রশ্নে বংশধরদের মধ্যে বিবাদ লাগল তখন জমিদারির এক দাবিদার গঙ্গাগোবিন্দ লাল সিংকে ডেকে পাঠান সিংভূম থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য। ইংরাজ নথি থেকে দেখা যাচ্ছে বছরটা ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ (বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল জুডিসিয়াল কনসালটেনস-২: ১৮০৫ ; ১১ই জুলাই)। অর্থাৎ স্ট্রাচির রিপোর্টে লাল সিংয়ের পরাস্ত হওয়ার সংবাদের পরও তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনভাবে সিংভূমে অবস্থান করতে।

এদিকে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ নারায়ণ মারা গেলে সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর দুই পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিং এবং মাধব সিং-এর মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত দেখা দিল। এই সংঘাতের এক পূর্ব ইতিহাস ছিল।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশে দেওয়ানি লাভ করল, তখন বরাভূমের জমিদার রাজা বিবেক নারায়ণ তাঁদের দেওয়ান হিসেবে স্বীকার করেন নি। ফলে ইংরাজরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। প্রায় সাত বছর যুদ্ধ চলার পর ইংরাজরা জয়ী হয়ে বিবেকনারায়ণকে বাধ্য করল তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্রের অনুকূলে ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে। যাঁর নাম ছিল রঘুনাথ নারায়ণ। ওদিকে প্রথমা স্ত্রীর পুত্র লছমন সিং তখন বয়ঃকনিষ্ঠ থাকায় ইংরাজদের গৃহীত এই ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু জঙ্গল মহালের নিয়ম অনুযায়ী সিংহাসন করায়ত্ব বা জমিদারি পাবেন প্রথমা স্ত্রীর পুত্র—তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও। তাই লছমন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েই জমিদারির ক্ষমতা লাভের জন্য ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন তাঁর সমর্থক ভূমিজদের নিয়ে। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর কোম্পানির সেনার হাতে লছমন পরাস্ত হয়ে বন্দি হলেন। মেদিনীপুর জেলে ইংরাজরা তাঁকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল এবং বন্দি অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এঁরই পুত্র বিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ। তিনি ইংরাজদের এই অন্যায়কে কখনো ভুলতে পারেন নি এবং প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহকে ইংরাজরা লঘু করে দেখানোর জন্য আখ্যা দিয়েছিল 'হাঙ্গামা' বলে (ইচ্ছাকৃত ভাবে 'বিদ্রোহ' শব্দটি ব্যবহার করে নি)।

গঙ্গাগোবিন্দ সিং এবং মাধব সিং-এর পারস্পরিক বিরোধের কারণ হল রঘুনাথ নারায়ণের মতো গঙ্গাগোবিন্দ বয়সে বড় হলেও কনিষ্ঠা স্ত্রীর পুত্র ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ষোলো। আর মাধব সিং বয়সে ছোট হলেও (১৫) রঘুনাথ নারায়ণের জ্যেষ্ঠ স্ত্রীর পুত্র ছিলেন। দুই জমিদার বা রাজার বিরোধে উপজাতি সরদাররা কোনো ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা নিতে পারেন নি। পঞ্চসরদারির সরদার কিষাণ পাথর, ধাদকা তরফের গুঞ্জন সিং মাধব সিংকে সমর্থন করেন। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ লাল সিং এর সমর্থন পাওয়ার জন্য তাঁকে ডেকে আনেন সিংভূম থেকে। গুমান গুঞ্জন সিং সঠিক কোন পক্ষ নিয়েছিলেন বলা মুশকিল। সরকারি রেকর্ডস্ (বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল জুডিসিয়াল কনসালটেন্সি ; ১১ই জুলাই, ১৮০৫) থেকে জানা যাচ্ছে তাঁরই মাধ্যমে গঙ্গাগোবিন্দ লাল সিংকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

এদিকে এই বিরোধে ইংরাজদের ভূমিকা ছিল খুবই সুবিধাবাদীর। তাদের কাছে প্রধান উদ্দেশ্য

ছিল রাজস্ব আদায়। অর্থাৎ যাকে জমিদার বলে স্বীকৃতি প্রদান করলে শান্তিপূর্ণভাবে রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে। তাই তারা এই বিরোধে তৎক্ষণাৎ কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাই উচিত বলে মনে করল। ("The British authorities whose primary interest was revenue, played a game of expediency." দি ভূমিজ রিভোল্ট ; জে.সি. ঝা.; পৃ : ১১৭)

কিন্তু দুই ভ্রাতার বিরোধ এবং বিশেষ করে সাধারণ প্রজাদের উপর মাধব সিং-এর অত্যাচার ইংরাজদের শেষমেশ চিন্তায় ফেলে দিল বরাভূমের খাজনার ভবিষ্যত আদায় সম্পর্কে। তাই জমিদারির কাজকর্ম দেখার জন্য কোম্পানির সরদার বংশী মাইতি নামে এক ব্যক্তিকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে বরাভূমে পাঠাল। কিন্তু বংশী আসার পর পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে উঠল। ম্যানেজারের নানা প্ররোচনা মূলক কাজকর্ম সত্য সত্যই খাজনা আদায় অসম্ভব করে তুলল।

গঙ্গাগোবিন্দকে সাহায্য করার জন্য বরাভূমে ফিরে এলেও লাল সিং তাঁর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করেন নি। তিনি রাজার কাছ থেকে "সুখ নিদি" (শান্তিতে নিদ্রার প্রতিশ্রুতি) বাবদ একশো বিঘা জমি লাভ করেন। ("ইন্ডিয়া গেজেট" ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৩) অন্যদিকে অপর ভ্রাতা মাধব সিং এর চ্যালেঞ্জ ও কোম্পানির নিযুক্ত ম্যানেজারের অত্যাচার দেশে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার পুরো সুযোগ লাল সিং বা লাল সরদার গ্রহণ করলেন। অত্যাচারিত ভূমিজদের সঙ্গে নিয়ে বরাভূমের কোম্পানির প্রধান কেন্দ্র বরাবাজার শহর সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করে নিজের এলাকায় বিজয় গর্ব নিয়ে ফিরে গেলেন। আক্রমণের সংবাদ পেয়েই বংশী মাইতি পূর্বেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন।

স্ট্রাচি পবে এ সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে লিখেছেন, "লাল সিং কি পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যান্য সরদারদের সাথে মিলে বরাবাজার শহর বা গ্রামের (যেহেতু সমগ্র জমিদারিতে একটিও পাকা বাড়ি নেই) অধিকাংশ লুণ্ঠন করে এবং স্থানীয় একশ সিপাহী সঙ্গে নিয়ে সারি দুর্গে ফিরে গেছেন—আমার পক্ষে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়নি।"

বিস্ময়ের ব্যাপার জঙ্গল মহালের প্রধান হয়েও হেনরী স্ট্রাচি ইংরাজদের উপর লাল সিং-এর আক্রমণের কারণ বুঝতে পারেননি। অথচ এটা সুস্পষ্ট বরাভূমের জমিদারির উপর গঙ্গাগোবিন্দের দাবিকে ইংরাজদের স্বীকার করতে দোমনা ভাবই প্ররোচিত করেছিল লাল সিংকে চাপ সৃষ্টির জন্য ইংরাজদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে। স্ট্রাচি ও যে বুঝতে পারেন নি, তা নয়। কারণ এক বছরের মধ্যে তাঁরই সুপারিশের ভিত্তিতে গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে জমিদারির বন্দোবস্ত করে কোম্পানি লাল সিং-এর সঙ্গে এক আপোষ নামায় আসার চেষ্টা করেছিলেন। আসলে প্রথমের দিকে কোম্পানি চেয়েছিল বলপ্রয়োগে লাল সিংকে বাগে আনতে। এর প্রমাণ এরহার্স্টের প্রদত্ত সরকারি রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। "তিনি (বংশী মাইতি) গুপ্তচর মারফত সংবাদ পান যে বিখ্যাত সরদার পাইক অথবা চোয়াড় লাল সিং যাঁর অধিকারে বরাহভূমের পশ্চিমে বিস্তৃত অঞ্চল রয়েছে তিনি ছ'শো অথবা সাতশো সঙ্গী নিয়ে তাঁর বাসস্থান (বরাবাজার শহর) ও কাছারি বাড়ি আক্রমণ করতে আসছেন। যতদিন না একদল সশস্ত্র সিপাহী তাঁর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে ততদিন তিনি আর ফেরেন নি। কিছুদিন পরে বরাভূমের সংবাদ পেয়ে এবং সেখানের প্রচুর রাজস্ব আদায় পড়ে থাকায় আমি ম্যানেজারকে তলব করি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য জমিদারিতে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকায় সমস্ত আদায় পড়ে থাকায় আমি ম্যানেজারকে তলব করি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য জমিদারিতে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকায় সমস্ত আদায় একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে এবং যেদিন তিনি (বংশী মাইতি) চলে

গেছ্লেন (বরাবাজার থেকে) তার পরের দিনই লাল সিং ও তাঁর অনুচরেরা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে।"

শেষ পর্যন্ত বরাভূমের বিদ্রোহ ইংরাজদের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। বহুচিন্তা ভাবনার পর শক্তিশালী একদল সামরিক বাহিনীকে বরাভূমে পাঠানো হল। কিন্তু ফল হল আরও মারাত্মক। বিদ্রোহীরা গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে পাহাড়ের দুর্ভেদ্য কোলে আত্মগোপন করল এবং সেখান থেকে সুবিধামতো সময়ে বেরিয়ে জমিদারির বিভিন্ন অংশে কোম্পানির সিপাইদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল।

ফলে অশান্তির মূল নায়ক লাল সিংকে গ্রেপ্তারের জন্য ইংরাজেরা উঠে পড়ে লাগল। বারবার দারোগাদের কাছে আদেশ পাঠানো হল তারা যেন অবিলম্বে লাল সিং এবং তার সঙ্গী সাথীদের গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুরে চালান দেন। কিন্তু দারোগাদের পক্ষে গ্রেপ্তার করা দূরে থাকুক বরাভূমে তাদের উপস্থিতিই ছিল একান্ত পক্ষে লাল সিং-এর অনুগ্রহের উপর। ইতিমধ্যে লাল সিংয়ের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আরও একটি ঘটনা ঘটল, যা প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি সরকারের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ যদি বা দৈবাৎ দু'একজন ধরা পড়ত উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে আদালত থেকে তারা রেহাই পেয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে বরাভূমে একজনও ইংরাজদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজী ছিল না।

দুই

বরাভূমের বিদ্রোহ যে সাধারণভাবে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা দমন করা যাবে না, এই সরল অথচ রূঢ় সত্য মেদিনীপুরের এবং জঙ্গল মহালের ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট হেনরী স্ট্রাচি অচিরেই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন প্রয়োজনে স্বাধীনচেতা সরদাররা ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারেন। ভৌগোলিক দিক থেকে দুর্গম অবস্থানের জন্য তাঁদেব বন্দি অথবা উৎখাত করা কোনোটাই সহজসাধ্য নয়। সামরিক অভিযানে সাময়িক সাফল্য এলেও তা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। সাময়িকভাবে তারা পিছু হটে গোপন স্থানে আশ্রয় নেবে। তারপর উপযুক্ত সময়ে বেরিয়ে এসে পুনরায় আক্রমণ চালাবে। এখানকার পথঘাট প্রায় অজানা থাকায় সহজেই কোম্পানির সৈন্যকে ফাঁকি দিতেও পারবে। স্ট্রাচির অসহায় মন্তব্য, "সামরিক সাহায্যে পুষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা (সরদাররা) কেবল ভয় দেখিয়ে রাজ্যের এক বিরাট এলাকার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে।"

বরাভূমের উপরিউক্ত জটিল পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করে হেনরী স্ট্রাচি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল ভারতের গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব ওয়েলেশলির কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করলেন। ওই রিপোর্টে বিদ্রোহের আনুপূর্বিক বিবরণের সাথে সাথে সম্ভাব্য সমাধানের পথ সম্পর্কেও তিনি পরামর্শ দিলেন।

স্ট্রাচি প্রথমে বরাভূমের বিরূপ জলহাওয়ার কথা বলেন। এই আবহাওয়ায় এক ধরনের জঙ্গুলে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর সিপাহী মারা গেছে। এই জ্বরে মারা না গেলেও সারাজীবন পঙ্গু হয়ে যাওয়ার একটা আশংকা থেকে যায়। পুলিশ সম্পর্কে স্ট্রাচি স্পষ্টতই হতাশাগ্রস্ত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতে জঙ্গল মহালের কোনো অংশে সক্রিয় পুলিশি ব্যবস্থা নেই। শান্তিরক্ষার জন্য যা আছে তা কেবল জমিদার এবং সরদার পাইক যাদের নিযুক্ত করেছে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য। সরকারি দারোগা কোনো সরদার পাইক বা তার কোনো অনুচরকে তলব করার সাহস

পায় না। দারোগারাই এখন সরদারদের (স্ট্রাচি যাদের 'চুয়াড়' বলেছেন) কৃপাপ্রার্থী নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

পুলিশ কর্মচারীদের যেখানে এই হাল সেখানে খাজনা আদায়কারীদের যে শোচনীয় অবস্থা হবে তা বলা বাহুল্য। খাজনা আদায়কারীরা আবার সরদারদের চোখে ছিল ইংরাজ শোষকদের প্রতিনিধি। স্ট্রাচি স্বীকার করেছেন, রাজস্ব আদায়কারীরা 'চুয়াড়'দের কাছে পুলিশ দারোগাদের চেয়েও ঘৃণ্য ছিল। বরাভূমের সদর জমা ছিল বাৎসরিক আটশো উনত্রিশ টাকা। যদিও এই টাকা মোটামুটি নিয়মিত আদায় হত কিন্তু স্ট্রাচির উপরিউক্ত স্বীকৃতি প্রমাণ করে ওই টাকা আদায় করতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। বরাভূম আন্দোলনের মূল কারণ ছিল ইংরাজদের ধার্য বাড়তি খাজনা। প্রচুর খাজনা যে অনাদায়ী ছিল তারও স্বীকৃতি বিদ্রোহের সময়ে জঙ্গল মহালের কালেক্টারের বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কাছে পাঠানো রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

যাই হোক, এই সংকটের একটা সমাধানের প্রস্তাব রাখালেন স্ট্রাচি। তাঁর ভাষায় "একমাত্র প্রয়োজনের তাগিদ থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব পেশ করছি তা আমার মতে শুধু এ অঞ্চলের জীবন রক্ষায় সাহায্য করবে তাই নয় সম্ভবত অশান্তিরও অবসান ঘটাবে। আমার প্রস্তাব বরাভূমের সরদার পাইকদের ক্ষমা করা হোক অথবা বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হোক। তাদের বোঝানো হোক জমিদারের সঙ্গে মীমাংসায় আসতে। যে অঞ্চলকে তারা এতদিন অশান্ত করে রেখেছিল এখন সেই অঞ্চলকে শান্ত করে রাখার জন্য তাদেরই হাতে দায়িত্ব দেওয়া হোক।" (হেনরী স্ট্রাচিস নোটস অন বরাভূম ; ১৩-৪-১৮০০)

কিন্তু এই প্রস্তাব রাখার সাথে সাথে স্ট্রাচি জানতেন লাল সিং-এর মতো প্রভাবশালী বিদ্রোহী সরদার পাইকের সঙ্গে একটা মীমাংসায় না এলে কোনো প্রস্তাবই বাস্তবে কার্যকরী হবে না। তাঁর কথায় "অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য জমিদারির মধ্য থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ পাইক নিযুক্ত করতে হবে। আমার ধারণা চার হাজারের বেশি লাগবে। কিন্তু এটা লাল সিং অথবা জমিদারির অন্য সরদার পাইকদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।" কারণ স্ট্রাচির মতে লাল সিং অন্য সমস্ত সরদারদের চেয়ে পরাক্রমশালী।

কিন্তু লাল সিং ও তাঁর অনুগামীরা ইংরাজদের চোখে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। গ্রেপ্তার করলে আইন মাফিক শাস্তি দিতে হবে অথচ বাস্তবে এতজন লোককে সাজা দেওয়া কতদূর সম্ভব? শুধু তাই নয়, স্ট্রাচি মনে করেন, "এতগুলি লোকের জড়িয়ে থাকার ব্যাপারটি ছাড়াও আরও কিছু বাধা আছে যার থেকে আমার মনে হয় নিয়মমাফিক আইন বরাভূমের চুয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।" স্ট্রাচি তাই সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, সরকার যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছতে পারেন তাহলে "আমার ধারণা লাল সিংয়ের সঙ্গে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে।"

স্ট্রাচির রিপোর্টস-পরিষদ গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব ওয়েলেশলি বিবেচনা করে অনুমোদন দিলেন। রাজস্ব ও বিচার বিভাগের টাকার (Tucker) সাহেব ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে এক পত্রে স্ট্রাচিকে একথা জানালেন। এই পত্রের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁকে তাঁর বিবেচনামতো প্রায় স্বাধীন ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। ফলে বরাভূমের বিদ্রোহী জমিদার ও সরদার পাইকদের সাধারণভাবে মার্জনা করা হল। অবশ্য একই সাথে ইংরেজরা নিজেদের মুখ রক্ষা করার জন্য সতর্ক করে দিল ভবিষ্যতে আইন ভাঙলে তার শাস্তি পেতে হবে।

গভর্ণর জেনারেলের অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দকে জমিদারি প্রদান

করা হল। তিনি "রাজা" আখ্যায় ভূষিত হয়ে বরাভূমের জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সিং এর বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতে যে মামলা করলেন তার রায়ও গঙ্গাগোবিন্দের অনুকূলে গেল। মাধব সিং অবশ্য এই রায় মেনে নিয়ে তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত ভ্রাতার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখেছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের সাথে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় কোম্পানির লাল সিংয়ের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে দেরী হল না।

লাল সিং বিদ্রোহ করেছিলেন মোটামুটি তিনটি বিষয়কে উপলক্ষ করে। দুই ভ্রাতার বিরোধের সময়ে মাধব সিং যে অত্যাচার উপজাতিদের উপর শুরু করেছিলেন তার বিরুদ্ধে লাল সিং উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সমর্থন ছিল ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি। সবশেষে তিনি চেয়েছিলেন ইংরাজরা তাদের সুবিধাবাদী নীতি পরিত্যাগ করে তাঁরই (লাল সিং) পছন্দসই গঙ্গাগোবিন্দকে "রাজা" হিসেবে স্বীকৃতি দিক। গঙ্গাগোবিন্দের জমিদারির প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে লাল সিংয়ের সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণ হল। বরং প্রাপ্তির দিক থেকে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন। বরাভূমে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব এখন থেকে লাল সিং এবং তাঁর অনুচরদের হাতেই ইংরাজরা তুলে দিতে বাধ্য হল।

তিন

বরাভূমে শান্তিরক্ষার জন্য স্ট্রাচি যে ব্যবস্থা নিলেন তা একদিকে যেমন ঘাটোয়ালি ব্যবস্থার জন্ম দিল, তেমনি অন্যদিকে এক নতুন ধরণের পুলিশি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটলো।

"ঘাট" বলতে কী বুঝায় তার একটি সংজ্ঞা ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ছোটনাগপুরের বিভাগীয় কমিশনার (জয়েন্ট) উইলিয়াম ডেন্ট দিয়েছিলেন। ঘাটোয়ালদের "ইসামনবিশী" (নামের তালিকা) প্রস্তুত করে কোম্পানির দরবারে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে এই সংজ্ঞাটি রেখেছিলেন। জমিদারের অধিকৃত এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চল। বরাভূমে দশটি ঘাট ছিল গোটা জমিদারিকে ঘিরে। প্রতিটি ঘাট তত্ত্বাবধানের জন্য সরদারদের জায়গির দেওয়া হত নামমাত্র খাজনায় যাকে 'পঞ্চক' বা Quit Rent বলা হত। সরদার ছিলেন সীমান্ত প্রহরী, যিনি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকতেন। সাধারণত তিনি এবং তাঁর অনুচরেরা ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ঘাটের রক্ষক হিসাবে এঁরা ঘাটোয়াল নামে অভিহিত হতেন। লুণ্ঠন ও প্রতিবেশীদের আক্রমণ থেকে জমিদারিকে রক্ষা করাই ছিল এঁদের প্রধান কাজ। বরাভূমে এই ঘাটগুলোর অন্যতম ছিল ধাদকা (কুইলাপাল এবং ধলভূমের (ঘাটশিলা) ডোমপাড়ার নিকটবর্তী স্থান) ; পশ্চিম ধাদকার কাছাকাছি সতেরোখানি (ধলভূম রাজ্যের হাত থেকে জমিদারিকে রক্ষা করা) ; সতেরোখানির পশ্চিমে পঞ্চসরদারি (সিংভূম এবং পাতকুমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া) এবং অন্যগুলি মানভূমের (বরাভূমের পূর্বে অবস্থিত) দিকের ছোট ছোট ঘাট।

বরাভূমের ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—তা' হল ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের "ইসামনবিশী" (নামের তালিকা) প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে "ঘাটওয়াল" শব্দটির উল্লেখ কোনো দলিলে পাওয়া যায় না। যদিও কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে বরাভূমে সরদার এবং পাইকদের অস্তিত্ব দলিল খুঁজলে পাওয়া যাবে। নীলমণি সিং বনাম বীর সিং-এর মামলায় রায় প্রদান কালে তৎকালীন বিচারপতি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে গ্রাম্য শান্তিরক্ষা বাহিনীকে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন জেলায় পৃথক পৃথক নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ঘাট বা গিরিপথগুলির অভিভাবক হিসেবে পরবর্তী সময়ে তাঁরা 'ঘাটোয়াল' নামেই অধিকতর পরিচিত হয়েছেন। সেটেলমেণ্ট

অফিসার হিসেবে জে.ডি. সিফটন মানভুম জেলার বরাভূম এবং পাতকুম সংক্রান্ত যে রিপোর্ট (১৯০৭-১২) ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেন, তার তৃতীয় অধ্যায়ের পঁচিশ পৃষ্ঠায় তিনি ঘাটোয়ালি পুলিশ বাহিনীর উদ্ভাবনের পূর্ণ কৃতিত্ব মেদিনীপুর ও জঙ্গল মহালের ম্যাজিস্ট্রেট হেনরী স্ট্রাচিকে দিয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ভূমিজ উপজাতিদের পুলিশের কাজে নিযুক্ত করার পরিকল্পনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে হেনরী স্ট্রাচির। ("The originatory of the scheme for employing Bhumij tribal organisation for Police purpose was Mr. Henry Strachey') তিনি লক্ষ করেছিলেন সরকারের নিযুক্ত পুলিশ জঙ্গলমহালের অশান্তি দূর করতে অক্ষম। অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে "চুয়াড়"দের প্রধানকে "সুখনিদি" (সুখে নিদ্রা যাওয়ার জন্য কর) না দিলে কেউ নিরাপত্তা ভোগ করতে পারত না। ফলে তিনি এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন যাদের দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে তাদের হাতেই শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোক।

বরাভূমের জমিদারির উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে "চুয়াড়" অথবা পাইকদের মধ্যে (যারা বর্তমানে ঘাটোয়াল বলে পরিচিত) যে আভ্যন্তরীণ লড়াই চলে তার একটি বিবরণ সিফ্‌টন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সরকারের কাছে পেশ করেন। তাতে তিনি লেখেন, পাইক সরদারদের অনেকে বেশি কিছু লাভজনক জমি দখল করে আছেন। লাভের পরিমাণ অনেক সময়ে স্বয়ং জমিদার তাঁর জমিদারি থেকে যে লাভ করেন তার সম পরিমাণ। এইসব সরদারকে বরাভূমের তালুকদার বলা যেতে পারে যারা জমিদারকে সাধারণভাবে তাদের প্রধান বা Chief বলে মানেন। বহু বছর ধরে তাঁরা বংশানুক্রমিক ভাবে জমির দখলীস্বত্ব ভোগ করে আসছেন।

যেহেতু সতেরোখানির সরদার লাল সিং ছোটো খাটো উপজাতিদের প্রধান এবং বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ("Head of the Revolutionary party") আছেন তাই তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ট্রাচি লাল সিংকে সাধারণভাবে মার্জনা দেখানোর সুপারিশ করলেন। "যাতে করে তিনি (লাল সিং) এবং তাঁর অনুচরেরা জমিদারের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি করে জমিদারি নিরাপদ রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।" (স্ট্রাচির রিপোর্টের উদ্ধৃতি ; ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অব বরাভূম এন্ড পাতকুম এস্টেটস ইন মানভূম ডিস্ট্রিকটস, ১৯০৭-১২ ; জে. ডি. সিফটন ; তৃতীয় অধ্যায় ; ২৮-২৯ অনুচ্ছেদ)।

এর ফলে জমিদারি পুলিশের কাজের দায়িত্ব জমিদারের উপর বর্তালো। জমিদার এই কাজটি সম্পাদন করেন তাঁর প্রধান সামন্ত "তরফ সরদার'দের মাধ্যমে। কতগুলি জায়গায় তরফ সরদারদের নীচে ছিলেন সাদিয়াল যার অধীনে ছিল দশ থেকে বারোটি গ্রাম। আর সাদিয়ালের নীচে ছিলেন গ্রাম্য ঘাটোয়াল, যাকে গ্রাম্য সরদারও বলা হত। আবার অনেক অঞ্চলে তরফ সরদার এবং ঘাটোয়ালের মধ্যে সাদিয়ালের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আর সর্বশেষ অবস্থান ছিল গ্রাম্য ঘাটোয়ালের নীচে তাবেদারদের। প্রকৃতপক্ষে সাদিয়াল, ঘাটোয়াল এবং দিগওয়ার প্রায় সমার্থক এবং তরফ সরদার ও তাবেদারদের মাঝখানে তাঁদের অবস্থান।

সরকারের জ্ঞাতার্থে মাঝে মাঝে জমিদারদের তালিকা তৈরি হত যাদের মধ্যে পুলিশের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এঁদের জমির পরিমাণ কত এবং প্রয়োজনে কত সংখ্যক তাবেদার হাজির করতে পারবে এ ধরনের ইসাম নবিশী বা নামের তালিকা ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হলেও পাকাপাকি রূপ পায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে।

ঘাটোয়ালরা পুলিশের দায়িত্ব বহন করলেও তাঁদের পূর্ব থেকে ভোগ করে আসা জমিতে

কোনো হাত দেওয়া হল না। অবশ্য একই সঙ্গে নতুন দায়িত্বের জন্য অতিরিক্ত কোনো জমিও তাঁদের মধ্যে বন্টন করা হল না। একমাত্র Quit Rent বা মুক্তি খাজনা ছাড়া তাঁরা অন্য সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পেলেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২২ নং রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গলমহালে দারোগা নিযুক্ত করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু বরাভূমের অশান্তি বুঝিয়ে দিল বাইরে থেকে দারোগা এনে কোনো লাভ নেই। স্ট্রাচির প্রস্তাব মতো সরদারদের শুধু মার্জনা করা হল না, তাঁদের যে সব জমি-জোত বিদ্রোহের জন্য বাজেয়াপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাও বাতিল করা হল। তাঁরা শুধু জমিদারদের পক্ষে পুলিশের কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে রাজী হলেন।

ঘাটোয়ালি পুলিশি ব্যবস্থার নানা স্তর ছিল। সবচেয়ে উঁচু স্তরে ছিলেন "তরফ সরদার"। তাঁদের মধ্যে বড়, ছোট আছেন। তারপর "সাদিয়াল" এর অবস্থান। আর সাদিয়াল-এর নীচে থাকেন "ঘাটোয়াল" অথবা গ্রাম্য সরদার এবং সবচেয়ে নীচে যাঁর অবস্থান, তিনি হলেন "তাবেদার"।

যদিও বরাভূম পরগনার ঘাটোয়ালি ভূমি স্বত্বের সংখ্যা জেলার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল তথাপি অল্প বিস্তর ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। ঘাটোয়ালদের অধিকাংশ মুণ্ডা বা ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও অন্য সম্প্রদায়ের লোকও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন, মানভূম জমিদারিতে বাউরিদের দেখা পাই। আবার কুরকুক্তা, বারমেসিয়া, ঢুলিয়াবাড়া, বেনাঘাড়িয়া ও ধাদকার ঘাটোয়ালরা ছিলেন ছত্রি রাজপুত। পঞ্চকোটের রাজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এঁদের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। পঞ্চকোটের জমিদারির ঘাটোয়ালদের অধিকাংশ ছিলেন মূল পত্তনকারী। এঁরা "দিগওয়ার" (দিগার) নামে পরিচিত ছিলেন।

ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা প্রবর্তনের কৃতিত্ব বরাভূমে হেনরী স্ট্রাচির হলেও এ ধরনের চিন্তা প্রথম করেছিলেন মেদিনীপুরের কালেকটার ইমহফ (Imhoff) । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোম্পানি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২২নং রেগুলেশনের ভিত্তিতে ঘাটোয়ালদের (পাইকান) এতদিনের ভোগ করা জমির দখল নিয়ে তার উপর কর বসাতে শুরু করল। পরে স্বাভাবিক ভাবে ঘাটোয়ালদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটল কোম্পানির বাইরে থেকে আনা দারোগার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে। বর্ধমানে তাঁরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ইমহফ কোম্পানির সরকারকে সুস্পষ্ট পরামর্শ দিলেন তাঁরা যেন পাইক বা ঘাটোয়ালদের দখলে করা জমি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এমনও পরামর্শ দিয়েছিলেন এইসব পাইকদেব দিয়ে সামান্য খরচে ভাগলপুরের মতো একদল রেঞ্জার্স (Rangers) তৈরি করা হোক।

বোর্ড অব রেভিনিউ ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে জঙ্গল মহালকে ২২ নং রেগুলেশনের বাইরে রেখে জঙ্গল জমিদারদের নিজ নিজ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হোক। প্রকৃতপক্ষে এই সিদ্ধান্তকে কাজেও প্রয়োগ করা হত যদি না ইতিমধ্যে লাল সিং-এর বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেত।

ঘাটোয়ালি ভূমি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, আইনের দিক থেকে ঘাটোয়ালি গ্রামগুলি কোনো জমিদারি (estates) নয়। রাজস্ব-মুক্ত কোনো সম্পত্তি নয়। আবার সাধারণ পত্তনি (tenure)ও নয়। ঘাটোয়ালদের অবস্থান জমিদার ও প্রকৃত উৎপাদনকারীদের মাঝামাঝি। বলা যেতে পারে এক ধরনের মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা চালু হল।

চার

ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে কোম্পানির সরকার সুস্পষ্টভাবে একটা জিনিস স্বীকার করে নিল, তা' হল জঙ্গল মহালে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন— যেখানে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হস্তক্ষেপ করবে না। কোম্পানিকে শান্তি বজায় রাখার জন্য তার নিজের তৈরি দারোগা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হল। কিন্তু বরাভূমে ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা প্রবর্তনে তারা কিছুটা দেরি করেছিল এই কারণে যে বিদ্রোহ চলাকালীন যদি পুলিশ কাজকর্মের দায়িত্ব সরদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে তারা ভাববেন এটা তাদের বিজয়। ("It would create a sense of victory in the Chuars") ; বোর্ডের কাছে ইমহফের পত্র (১৬ই এপ্রিল, ১৭৯৯)।

কোম্পানি লাল সিং-এর সাথে একটা আপোসে এলেও সব সময়ে আশংকা ছিল তাদের (ইংরাজদের) তরফে কোনো প্ররোচনায় পড়ে পাহাড়ি জমিদাররা না আবার বিদ্রোহ আরম্ভ করে দেয়।

কোম্পানীর নিয়মিত পুলিশি ব্যবস্থায় জঙ্গল মহালকে কেন আনা সম্ভব নয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বোর্ড অব রেভিনিউ মূলত দু'টি কারণ দেখিয়েছিল। প্রথমত এই সব পাহাড়ি জমিদারদের কৃষকের উপর অসাধারণ প্রভাব আর দ্বিতীয়ত এক ধরনের জঙ্গলে জ্বর যাতে বাইরে আসা লোকেরা অতি সহজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ("Victims to the fever which generally seizes such persons as are no constant inhabitants of the jungles"; বোর্ডের কাছে ইমহফের পত্র ; ৪ঠা মার্চ, ১৭৯৯)

এ কারণে কোনো রকম প্ররোচনার হেতু যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ রেখে কোম্পানি কর্মচারীদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিল। যদি কোনো পাহাড়ি জমিদার খাজনা বাকি ফেলে তাহলে তাকে অন্তত দু'বার সুযোগ দেওয়া হবে। তারপরও যদি না দেন এবং তাঁর যদি কোনো বিদ্রোহের মতলব থাকে তাহলে খুব গোপনে কোনো ইউরোপীয়ানের নেতৃত্বে সিপাহী নিয়ে তাঁর বাসস্থান ঘিরে ফেলতে হবে এবং তাঁকে খাজনা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে হবে। অন্য কোনো রকম জবরদস্তি দেখালে জমিদার হয়ত মরিয়া হয়ে উঠতে পারেন ;(বোর্ডের কাছে ইমহফের পত্র, ১৬ই এপ্রিল, ১৭৯৯) ;একথাও বলা হল, সাধারণভাবে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারের জমি কখনো বিক্রি করা চলবে না।

ইংরাজদের ইতিহাসে দেখা গেছে সব সময়ে তাদের একটা চেষ্টা থাকে অশান্তি বা বিদ্রোহ দমন না করতে পারলে শেষমেশ বিদ্রোহীদের সঙ্গেই একটা মীমাংসায় আসতে। এ রকম ঘটনা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে আইরিশ সমস্যা পর্যন্ত বহুবার ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে ভারতেই তারা *১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে শিখদের সঙ্গে এঁটে* না উঠতে পেরে রনজিত সিং-এর সাথে অমৃতসরের সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। জঙ্গল মহালেও কোম্পানি অনুরূপ ভাবে পাহাড়ি জমিদারদের কর্তৃত্ব আপোষ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মেনে নিল।

পাঁচ

আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা এবং ইংরাজ শাসনের বিরোধিতা হ্রাস করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোম্পানির সরদার জঙ্গল মহালে ঘাটোয়ালি পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা পরবর্তী ইতিহাস বলছে পুরোপুরি সফল হয়নি। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বরাভূম রাজ্যের (প্রকৃত অর্থে জমিদারি)

উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে এক বিরাট ভূ-খণ্ড জুড়েই ইংরাজ বিরোধী সশস্ত্র লড়াইতে পরিণত হয়েছিল তাতে দেখা যায় শত শত ঘাটোয়াল গঙ্গানারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, কোল বিদ্রোহের পর মানভূমে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। গঙ্গানারায়ণ ছিলেন বরাভূমের জমিদারির ব্যর্থ দাবীদার। তাঁর পিতা লছমন সিং ইংরাজের কারাগারে বন্দি অবস্থায় মারা যান। বরাভূমের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদে গঙ্গানারায়ণ মাধব সিংকে সমর্থন করেন নি। তিনি করেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদকে।

গঙ্গাপ্রসাদ 'রাজা' হয়ে আপোষ করার জন্য মাধব সিংকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কিন্তু গঙ্গানারায়ণ পারিবারিক কারণে মাধবকে দেওয়ান হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। তাছাড়া মাধব সিং দেওয়ান হয়ে গঙ্গানারায়ণকে নানাভাবে তাঁর ন্যায্য জমি জায়গা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। এছাড়াও সাধারণ কৃষকদের উপর মাধব সিং খাজনা আদায়ের নামে নানা অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিলেন, যা' গঙ্গানারায়ণ সহ্য করতে পারেন নি। গঙ্গানারায়ণের ধারণা হয়েছিল এর পেছনে ইংরাজদের গোপন মদত আছে।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল গঙ্গানারায়ণ একদল সঙ্গী-সাথী নিয়ে মাধব সিংকে অতর্কিতে ঘিরে ফেলে হত্যা করেন। ইতিপূর্বে গঙ্গানারায়ণ বহুসংখ্যক ঘাটোয়ালের সক্রিয় সমর্থনে নিজের ক্ষমতা অনেকটাই বাড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং মাধব সিং-এর হত্যা সেই ক্ষমতা এবং আত্মপ্রত্যয় দুটোকেই আরো বাড়িয়ে দিল। সরাসরি এবার তিনি ইংরাজ বিরোধিতায় নেমে পড়লেন। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে বরাবাজার পুলিশ ফাঁড়ি এবং অফিস-কাছারি আক্রমণ করলেন।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রায় দু'তিন হাজারের মতো সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গঙ্গানারায়ণ বরাভূমে অবস্থিত ইংরাজ সৈন্যদলকে আক্রমণ করলেন। অপ্রস্তুত কোম্পানির সৈন্যরা এই আক্রমণ সহ্য না করতে পেরে প্রাণ নিয়ে কোনোরকমে পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়ায় পালাল। গঙ্গানারায়ণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করলেন এবং ইংরাজ অধিকৃত বরাভূমের সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে কর আদায় করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে বরাভূমের পূর্বাঞ্চলও তাঁর সক্রিয় দখলে এল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় জেলার অধিকাংশ ভূমিজ জমিদারের এই বিদ্রোহ গঙ্গানারায়ণের পক্ষে যোগদান।

জঙ্গল মহালের পূর্ব দিকে পুঞ্চা (Puncha) থেকে ফুলকুশমা পর্যন্ত যেখান দিয়েই গঙ্গানারায়ণের সাহসী বিদ্রোহ সৈন্যরা গেছে সেখানেই তারা স্থানীয় জন সমর্থন লাভ করেছিল। তবে শেষমেশ গঙ্গানারায়ণের সাহসী বিদ্রোহ অবশ্য সফল হয়নি। বাহিব থেকে তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য এনে ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করল। লারকা কোল জনগোষ্ঠীর সাহায্যের আশায় গঙ্গানারায়ণ ইংরাজদের চোখে ধুলো দিয়ে সিংভূমে চলে গেলে সেখাকে অকস্মাৎ পুরোন শত্রু খরসোয়ানের ঠাকুর চেতন সিং এর দলবদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন। ইংরাজরা চেতন সিং-এর মারফত গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু সংবাদ পায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি।

গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ২রা এপ্রিল, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মাধব সিংকে হত্যার মধ্যে দিয়ে (জগদীশ চন্দ্র ঝা মনে করেন ২৬শে এপ্রিল, ১৮৩২) আর তার সমাপ্তি ঘটেছিল সিংভূমে গঙ্গানারায়ণ যখন মারা গেলেন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। যদিও এই বিদ্রোহ এরপর আরো দু'মাস চলেছিল বিক্ষিপ্তভাবে।

এই বিদ্রোহে ঘাটোয়ালদের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ঘাটোয়ালি বন্দোবস্ত স্ট্রাচি যাঁর

সাথে একদা করেছিলেন সেই লাল সিং ওরফে লাল সরদার এবং তাঁর পুত্র গঙ্গানারায়ণের অন্যতম সহযোগী হয়ে বিদ্রোহের খাতায় নাম লিখিয়াছিলেন। গঙ্গানারায়ণের মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যে ১৯শে ফেব্রুয়ারি (১৮৩৩) তাঁরা ইংরাজদের হাতে ধৃত হন। অন্যদিকে সতেরোখানি 'তরফ' যার সরদার এক সময়ে লাল সিং ছিলেন, পরে সিংভূমে চলে গেলে যার দখল নেন কিষাণ সিং তিনিও কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ঘাটোয়ালি পুলিশি ব্যবস্থা মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হেনরী স্ট্রাচি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির সরকারের তরফে ঘাটোয়ালরা যেন জঙ্গল মহালের মতো দুর্গম পাহাড়ে ও জঙ্গলে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এর জন্য তাঁদের জমির বন্দোবস্তও দেওয়া হল। কিন্তু কর্তব্যক্রমে যোগ দিয়েই ঘাটোয়ালরা বুঝতে পারলেন ইংরাজরা তাঁদের কীভাবে প্রতারিত করেছে অর্থাৎ বংশপরম্পরাগত উৎকৃষ্ট জমির ভোগ থেকে উৎখাত করে নিম্নমানের জমির বন্দোবস্ত তাঁদের সাথে করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজা, জমিদার, ইজারদার এবং মহাজনের অত্যাচার থেকেও তাঁরা কোনো নিশ্চয়তা পান নি। বাস্তবিকই বরাভূমের ঘাটোয়ালদের অনেকে বেআইনি অর্থের আদায় সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী, কন্যার আংটি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (বরাবাজার ক্যাম্প থেকে সরকারি পত্র, ২৪শে মে ; ১৮৩২)

ঘাটোয়ালি পুলিশি ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও ইংরাজরা পুরোপুরি ঘাটোয়ালদের বিশ্বাস যে করে না সেটা বুঝতে ঘাটোয়ালদের বিশেষ দেরী হয়নি। পাতকুম (জঙ্গল মহালের পশ্চিম দিকে, বর্তমানে সিংভূম জেলায়) জমিদারিতে ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও কোম্পানির সরকার সেখানে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাহির থেকে পুলিশ (বরকন্দাজ) এনে পুলিশ থানা প্রতিষ্ঠা করেন। অজুহাত দেখানো হল পুলিশি চৌকি জোরদার করার। বিভিন্ন সময়ে ঘাটোয়ালরা তাঁদের নানা অভিযোগ পিটিশনের আকারে কোম্পানির সামনে নিয়ে এলেও কোনো উপযুক্ত প্রতিকার হয়নি। কোম্পানির নিযুক্ত মুনসেফের কাছেও কোনো সুবিচার মিলত না। ঘাটোয়ালদের হয়রানিতে ফেলার জন্য বরাবাজারের মুনসেফ অধিকাংশ অভিযোগের কোনো বিচার না করে জেলার বাইরে বাঁকুড়ায় সদর আমিনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বেশিরভাগ অভিযোগ ছিল বরাভূমের 'রাজা' এবং দেওয়ান মাধব সিং-এর বিরুদ্ধে বেআইনি অর্থ আদায়ের। এর মধ্যে আবার যেগুলির বিচারও করতেন সেগুলির রায় দেওয়ান মাধব সিং-এর অনুকূলেই যেত। জয়েন্ট কমিশনার ডেন্ট (Dent) নিজেও এই কথা পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। ("It is extremely probable that the munsif favoured Madhab Singh")

এটা সত্য, ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইংরাজরা সরদারদের হাতে কিছু ক্ষমতা দিলেও তা' ছিল নিতান্ত বহিরঙ্গের। এর কোনো আভ্যন্তরীণ ভিত্তি ছিল না। কারণটি আর কিছুই নয় স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি কোম্পানির সরকারের অবিশ্বাস। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি 'দারোগা' প্রথা প্রথম চালু করে জঙ্গল মহালে। স্ট্রাচির নেওয়া ঘাটোয়ালি পুলিশি ব্যবস্থা সত্ত্বেও পুরোনো দারোগা ব্যবস্থা কোম্পানি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করেনি। ঘাটোয়ালিদের পাশাপাশি তারাও রইল এবং পুলিশি অত্যাচারেরও কোনো অবসান ঘটল না। এই কারণেই দেখা গেছে গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহের সময়ে স্থানীয় পুলিশ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ঘাটোয়াল সরদারদের বা সাধারণ মানুষের উপর মাধব সিং যে শোষণ চালিয়েছিল তা' কখনও সম্ভব হত না যদি না তাতে কোম্পানির সরকারের পরোক্ষ মদত থাকত।

শুধু জঙ্গল মহাল কেন, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টেকাতে গেলে নিছক পুলিশি ব্যবস্থার

উপরই যে নির্ভর করা চলে না তা ইংরাজরা ভালো করেই জানতেন। পুলিশের চেয়েও বড় কোনো শক্তির প্রয়োজন—আর তা হল সামরিক বাহিনী। জঙ্গল মহালের পুলিশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অর্থাৎ সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ উইলিয়াম ব্লান্ট (Blunt) তাঁর রিপোর্টে (৬ই অগাস্ট, ১৮৩২) সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছে "আমাদের সামরিক বাহিনীর বিশ্বস্ততা ও শক্তির উপর।" আর এর অনুপস্থিতিতে দুর্দান্ত এবং অসন্তুষ্ট ভারতীয়রা সব সময়ে বিদ্রোহ এবং অশান্তির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

এই কারণে যে ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা (১৮০০) কে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নং রেগুলেশন দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং যার সাফল্যে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সরকার প্রচণ্ড আনন্দিত হয়ে পড়েছিলেন, সেই ঘাটোয়াল সরদার এবং জমিদারদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সরকারি পুলিশি ব্যবস্থাও জোর কদমে চালু হল, একথা মনে রাখতে হবে। বরাভূমের জমিদারির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে বরাবাজারে তৈরি করা হল পুলিশ থানা। যার মাসিক খরচ ধরা হল ছিয়ানব্বই টাকা। (বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল জুডিসিয়াল কনসালটেশনস ; ৪৮ ; ১৮১৪)

ঘাটোয়ালি পুলিশের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে ইংরাজরা যেমন একদিকে প্রশংসা করেছে তেমনি অন্যদিকে তারা প্রায় সমগ্র জেলাটিকে সামরিক ঘাঁটি অথবা পুলিশ চৌকি দিয়ে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাচেট বা পঞ্চকোট জমিদারিতে চারটি পুলিশ থানা তৈরি হয়েছিল। অজুহাত দেখানো হল জমিদারির আয়তনের বিস্তারকে। কিন্তু কথাটি যে সত্য নয় তার প্রমাণ ঝালদা এবং রঘুনাথপুর পাচেটের চেয়ে অনেক ছোট আকারের জমিদারি হলেও সেখানে বসানো হয়েছিল ছোট ছোট সামরিক ছাউনি। পাচেটে ঘাটোয়ালরা এই অবিশ্বাস আর অসম্মান সহ্য করতে পারেন নি। একে তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করে আসা ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। তাই সুযোগ আসা মাত্রই গঙ্গানারায়ণের আহ্বানে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দেরী করেন নি।

কোম্পানির সরকারের উপর ঘাটোয়ালদের অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বিদ্রোহ চলাকালীন যখন সরকার থেকে সাধারণভাবে মার্জনার কথা বলা হল তখন তাঁরা তাতে আদৌ কর্ণপাত করেন নি। সরকার শর্ত দিয়েছিল বিদ্রোহের পথ পরিত্যাগ করলে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। বিদ্রোহের আরম্ভে জঙ্গল মহালের ম্যাজিস্ট্রেট রাসেল একদল সৈন্য নিয়ে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে বরাবাজার পৌঁছালেন। ১৩ই মে তিনি ঘাটোয়ালের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন তাঁরা যেন গঙ্গানারায়ণকে বন্দি করার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এর বিনিময়ে আটশো টাকার পুরস্কার পাবেন এবং তাঁদের জায়গির জমিতেও সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু এর ফল হল ঠিক উলটো। রাসেলই বরং ঘাটোয়ালদের দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত হলেন এবং কোনোরকমে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন। (ইন্ডিয়া গেজেট, ১৯শে মে, ১৮৩২)। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মে সরকার থেকে রাসেলকে জানানো হয়েছিল ঘাটোয়ালরা যদি তাঁদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহলে তাঁদের মার্জনা করা হবে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য। অন্যদিকে ঘাটোয়ালদের প্রধানকে বলা হয়েছিল আত্মসমর্পণ করলে জমি থেকে উৎখাত করা হবে না। কিন্তু এতে ইংরাজদের উদ্দেশ্য আদৌ পূরণ হয় নি।

গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ প্রমাণ করল ঘাটোয়ালদের হাতে পরগনা বা গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া ইংরাজদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কোম্পানিকে যদি জঙ্গল মহালে ক্ষমতা

বজায় রাখতে হয় তাহলে প্রয়োজন ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে সাধারণ আইন বহির্ভূত ক্ষমতা আরো বেশি করে দিতে হবে।

কোম্পানি অধিকৃত ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে আদালত কর্তৃক স্বীকৃত আইন চালু ছিল অর্থাৎ যাকে বলা হয় রেগুলেশন সিস্টেম (Regulation System) বা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার বাইরে জঙ্গল মহালের সেই সব এলাকাকে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হল যেগুলি প্রায়শই কোম্পানির দুঃশ্চিন্তা কারণ ঘটাচ্ছে। এইভাবে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি গঠিত হল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি (South-west Frontier Agency) এই এজেন্সির শাসনাধীন অন্যান্য স্থানের সঙ্গে জঙ্গল মহালের সাইপাহাড়ি, শেরছাড় এবং বিষ্ণুপুর ছাড়া সমস্ত মহালকে আনা হল। পুলিশি ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হল। যার মূল কথা পুরানো ব্যবস্থা বজায় রেখে আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পুলিশ থানা বা ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হল। জমিদারি পুলিশি ব্যবস্থা একেবারে তুলে দেওয়া হল না। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা হ্রাস করা হল এবং শেষ পর্যন্ত যাবতীয় ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ধলভূমের (ঘাটশিলা) জমিদারদের পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগ করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ভাষা-আন্দোলন ও টুসুগান

ড. শান্তি সিংহ

১

ভারতের পাশে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে যেখানে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে তীব্র মাত্রায় ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল। সেই আবেগমথিত, রক্তাক্ত ভাষা-আন্দোলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'-র আন্দোলন নামে বিখ্যাত। এখনও ফি-বছর একুশে ফেব্রুয়ারির দিন, দু'পার বাংলার বহু নরনারী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা ঐতিহাসিক গানটি—

আমার ভাইয়ের রক্তে-রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি? (ইত্যাদি)

একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি ওপার বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য ভাব-বলয় গড়ে তুলেছে, তার নাম—'একুশের সংস্কৃতি'। বদরউদ্দিন উমর তাঁর 'পূর্ব বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন, '১৯৪৮, বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনই পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ। এর মাধ্যমে যে প্রতিরোধ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সেই আন্দোলন ক্রমশ বিকশিত হয় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬৪-৬৫ সালের আইয়ুবী-নির্বাচন, ১৯৬৮-৬৯ সালের ডিসেম্বর-মার্চ আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২৫ মার্চ পরবর্তী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ব বাঙলার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিকাশের ইতিহাসে ভাষা-আন্দোলন এজন্যই এত তাৎপর্যপূর্ণ।'[১]

পাকিস্তানী আমলে, একুশে ফেব্রুয়ারির বিশেষ দিনে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা শপথ গ্রহণ করতেন, কীভাবে মুসলিম লীগের কর্তৃত্বকে হ্রাস করা যায়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামি লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি এবং ১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবি-সম্বলিত প্রাক স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল অগ্নিঝরা শপথের কাল। ১৯৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল আইয়ুব শাসন-অবসানের দুর্জয় শপথে দৃপ্ত। ১৯৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে জঙ্গী ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকি, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং সাজাহান সিরাজ ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে স্বাধীন বাংলা-গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। ওই দিন বাঙালি, পাকিস্তানী-নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার শপথ নেন ওই শহিদ মিনারের পাদদেশে।

অসমীয়া ভাষাকেই একমাত্র সরকারি ভাষার রূপ দেওয়ার জন্যই ১৯৬০ সালের ২৪ অক্টোবর অসম ভাষা-বিল আইনে রূপান্তরিত হয়। তখন অসমের বাঙালিরা বাংলাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেই

আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মর্যাদা দিয়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। সেই ভাষা-*আন্দোলন* তদানীন্তন কাছাড় জেলায় (বর্তমান বরাক উপত্যকা) কেন্দ্রীভূত হয়। ১৯৬১ সালের ১৯ মে এগারো জন ভাষা-আন্দোলনে শহিদ হন। ফলে, ভাষা-আন্দোলন তীব্রতর হয়। তার জন্য অসম সরকার ১৯৬০ সালের ভাষা-আইন সংশোধন করে ১৯৬১ সালে বরাকের জন্য বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে মান্য করেন। তার ফলে, বরাকের অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আজও আইনসম্মত ব্যাপার।

২

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর। তার আগে পুরুলিয়া ছিল বিহারের মানভূম জেলার সদর মহকুমা। অথচ ভাষা-সংস্কৃতির দিক থেকে এ অঞ্চলের জনগণ 'পশ্চিমা-সংস্কৃতি'র অনুবর্তী না-হয়ে বাংলা-সংস্কৃতির মাঝে সহজভাবে প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন। তার জন্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা-ভাষী অধিকাংশ নরনারী নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত বাঙালি হিসাবে দেখার বাসনা পোষণ করতেন। স্থানীয় জনমানসে এ ধরনের বিশেষ মনোভাবের ইঙ্গিত অনুভব করে তৎকালীন বিহারের নেতৃবৃন্দ মানভূম জেলায় বাংলা-ভাষার প্রভাব হ্রাস করার নানা রকমের চেষ্টা ১৯৩৫ সাল থেকেই শুরু করেন। অথচ ১৯৩১-এর আদমসুমারি থেকে জানা যায়—মানভূমের সদর মহকুমা পুরুলিয়ায় শতকরা ৮৭ জন বাংলাভাষী নরনারী। তারই প্রেক্ষিতে মানভূমের জনমানসে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবিতে ক্রমশ বাঙালি-বিহারি সম্প্রদায়িক মনোভাব চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে 'মানভূম-বিহারী সমিতি' গড়ে ওঠে। তখন ব্যারিস্টার পি. আর. দাসের সভাপতিত্বে তার পাল্টা 'মানভূম-বাঙালি সমিতি' গঠিত হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিহার সরকারের রাজনৈতিক প্ররোচনায় মানভূমের সর্বত্র হিন্দি-প্রচার অভিযান চলে। ১৯৪৮ সালে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়[২] মানভূম জেলার কোন বিদ্যালয়ে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো চলবে না; তা দেবনগরী হরফে অর্থাৎ হিন্দিভাষায় লিখতে হবে। স্কুল শুরুর আগে যে প্রার্থনাসভা হয়, সেখানে বাংলা-গানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'রামধুন্' গাইতে হবে। শুধু তাই নয়, জেলা স্কুল পরিদর্শক সহকারী স্কুল পরিদর্শকের কাছে বিজ্ঞপ্তিতে জানান—গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যে-সব বিদ্যালয় সরকারি অনুদান পায়, সেখানে বাংলা-ভাষা চলবে না, হিন্দিভাষাতেই শিক্ষা দিতে হবে।[৩] সরকারি বিভাগেও বাংলা ভাষা ক্রমশ অচল হয়। 'মুক্তি'-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘটনা : ১৯৪৯ সালের ২৫ মে, বরাবাজার থানার হেরবনা গ্রামে সরকারি ধান্যগোলা থেকে অনুদান দেওয়ার সময় বাংলাভাষায় দরখাস্ত বাতিল করা হয়। আবেদনকারীদের বাংলাভাষার পরিবর্তে হিন্দিভাষায় দরখাস্ত লিখতে বাধ্য করা হয়। ঝরিয়া দেশবন্ধু সিনেমা হলে বিজ্ঞাপন-পর্বে দেখানো হত— Hindi is the mother language of Manbhum. মানভূম শহর ও গ্রামাঞ্চলে বাংলা সমর্থনকারীদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য যত্রতত্র ঘোষণা করা হল—'মানভূম বঙ্গাল মেঁ নহীঁ জায়েঙ্গে, জানে পর খুন কে নদী বহা দেঙ্গে।'

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবিতে মানভূম, সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ার আন্দোলনকে বিহার সরকার নির্মমভাবে দমন করার প্রতিবাদে ১৯৫৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সুচেতা কৃপালিনী, এন. সি. চ্যাটার্জী প্রমুখ পাঁচজন লোকসভার সদস্য প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিশেষ হস্তক্ষেপ প্রার্থনার জন্য আবেদন জানান। সেই সময় 'মানভূম-কেশরী' হিসাবে খ্যাত জননেতা অতুলচন্দ্র

ঘোষ লোকসেবকসংঘের মাধ্যমে মানভূমের বঙ্গভুক্তির জন্য বিশাল গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শুরু হয় টুসুগানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। লোকসভার সদস্য ভজহরি মাহাত তখন কয়েকটি রাজনৈতিক ভাবনা পুষ্ট টুসুগান বাঁধেন। তার মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ঐতিহাসিক গানটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

শুন বিহারি ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা-ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই।। (ইত্যাদি)

লোকসেবক সংঘের কর্ণধার অতুলচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণচন্দ্র ঘোষ সমকালীন ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কয়েকটি টুসুগান রচনা করেন। তাব একটির কিছু অংশ—

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে।।
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাত পুরুষের আমলে
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা ব'লে।। (ইত্যাদি)

'হরিদাস' ছদ্মনামে চাষ থানার সতনপুর গ্রামের জগবন্ধু ভট্টাচার্য ও মানভূমের ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি টুসুগান রচনা করেন। বিহার-কংগ্রেসি সরকারের ছলনাপূর্ণ মনোভাব তাঁর গানে বিধৃত—

প্রাণে আর সহে না
হিন্দি-কংগ্রেসিদের ছল না।
ইংরেজ আমলে যারা গো
কর তো মোসাহেবিয়ানা।
এখন তারা হিন্দি-কংগ্রেস
মানভূমে দেয় যাতনা।। (ইত্যাদি)

বিহারের কংগ্রেসি সরকার ছলে-বলে-কৌশলে মানভূমের ভাষা-আন্দোলনকে তথা টুসুসত্যাগ্রহীদের দমন করার জন্য তৎপর হওয়ায় জগবন্ধু ভট্টাচার্য মানভূমবাসী ও ধলভূমবাসীদের[৪] সতর্ক করে টুসুগান বাঁধেন—

মানভূমবাসী থাকবে সতরে
ধলভূমবাসী থাকবে সতরে।
(হিন্দির) ফন্দি এল জিপগাড়ি ভরে।। ধুঃ
যত টাকা কেবল ফাঁকা

বাঁধ-কুয়ারই খবরে।
(মিথ্যা) চালান কাটি নিচ্ছে লুটি
হিন্দি ভাষার প্রচারে।। (ইত্যাদি)

'মানভূম-কেশরী' অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং 'মানভূমগান্ধী' ঋষি নিবারুণচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় যুক্ত হয়। ১৯০৫ সালে বি. এ. পাস এবং ১৯০৮ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওই বছরই জুলাইমাসে পুরুলিয়া জজকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ওই বছরই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অঘোরচন্দ্র রায়ের চতুর্থ কন্যা লাবণ্যপ্রভাদেবীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে যুক্ত হন। অথচ ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে অতুলবাবু ওকালতি জীবনের খ্যাতি অকাতরে বিসর্জন দিয়ে ঋষি নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে অতুলচন্দ্র মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং ঋষি নিবারণচন্দ্র কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ঋষি নিবারণচন্দ্রের পরলোক গমনের পর, ১৯৩৫ সালে অতুলচন্দ্র জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। ১৯৪৮ সাল অবধি তিনি উক্ত পদে সম্মানজনক ভাবেই থাকেন। তখন মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে অতুলবাবু বহুবার স্বদেশী আন্দোলনের ব্রতে কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে, আগস্ট আন্দোলনের গোড়ায় তাঁকে নিরাপত্তা-আইন মোতাবেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অতুলচন্দ্র ১৯৪৬ সালে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তে মানভূমে প্রায় তিন হাজারের বেশি গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করেন। ১৯৪৭-৪৮ সাল অবধি সেই গ্রামপঞ্চায়েতগুলি দেশের স্বাধীন সরকারের সুষ্ঠু শাসনের সহায়তা করে। অথচ সেই সতত সজাগ জননেতা অতুলচন্দ্র ১৯৪৮ থেকে বিহার সরকারের বাংলা-ভাষা-দমননীতির প্রতিবাদে গণ-আন্দোলনের পথে ক্রমশ এগিয়ে যান। তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার হয় লোকসেবক সংঘ। তাঁর দেশব্রতী জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণচন্দ্র, তৎকালীন মানভূম বঙ্গভুক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যে-সব টুসুগান লেখা হয়েছিল, সে-সব গানের সময়োচিত একটি সুনির্বাচিত সংকলন—'টুসুর গানে মানভূম' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।[৫] 'ষোলো পাতার ছোট্ট গীতি সংকলনটির দাম ছিল তখন মাত্র এক আনা। প্রাপ্তিস্থানের নাম ছিল—লোকসাহিত্য ভবন, পুরুলিয়া (মানভূম)। অরুণবাবুর বয়স এখন নববইয়ের ঘরে। তাঁর জননী, যিনি 'পুরুলিয়ার মা' নামে সর্বজন পরিচিতা, তিনি কিছুদিন আগে, ১০৭ বছর বয়সে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবদ্দশায়, শেষ জন্মদিনে পুরুলিয়া জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান মাননীয় নকুলচন্দ্র মাহাত এবং আরও বহু গুণিজনের সঙ্গে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন পুরুলিয়া-জেলাশাসক দেবপ্রসাদ জানা মহোদয়।

অরুণচন্দ্র ঘোষের বিশেষ সাক্ষাৎকার একদা (৯/১০/১৯৮৭) নিয়েছি। তখন তিনি জানান : 'টুসুর গানে মানভূম' পুস্তিকাটি সে সময় এক লক্ষ কপি ছাপা হয়। অথচ বিশাল চাহিদায় পুস্তিকাটি অল্পদিনেই নিঃশেষিত হয়। তিনি আরও জানান—উক্ত সংকলনের ১নং, ২নং, ৩নং, ১৩নং, ১৫নং প্রভৃতি টুসুগান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ইংরেজ শাসনকালে দেশের স্বদেশীদের মুখে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটি গভীর আবেগে ধ্বনিত হত, তেমনই মানভূম-টুসুআন্দোলনে ভজহরি মাহাতর—'শুন বিহারী ভাই/তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই। ('টুসুগানে মানভূম' সংকলনে ২নং গান)। এবং অরুণচন্দ্র ঘোষের 'আমার বাংলা ভাষা, প্রাণের ভাষা রে'/(ও

ভাই) মারবি তোরা কে তারে...(সংকলনের ১৩নং গান)—এই গান দুটি গণসংগীতের মর্যাদা পেয়েছিল।

বিহারের তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী কে. বি. সহায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—লোকসেবক সংঘ সদর মানভূমকে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে শুরু করেছেন টুসু-আন্দোলন। অধিকন্তু 'টুসুর গান মানভূম' সংকলন আপত্তিকর। তার একমাত্র উদ্দেশ্য বিহার সরকার ও তার কর্মচারীদের নিন্দা করা এবং বিহারীদের তথা হিন্দিভাষীদের একতরফা গালি দেওয়া। তাঁর অভিযোগের সমর্থনে, প্রয়োজনমাফিক কিছু আপত্তিকর বক্তব্য উক্ত সংকলন থেকে তিনি ইংরেজিতে তর্জমার উদ্যোগ নেন। যথা—

'শুন বিহারী ভাই/তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই'—

(২নং গান। রচয়িতা ভজহরি মাহাত)

Hear Biharee brothers, you cannot keep us with Bihar by show of 'lathi' (force)

'প্রাণে আর সহে না/হিন্দি কংগ্রেসীদের ছলনা...'

(৮নং গান। রচয়িতা জগবন্ধু ভট্টাচার্য)

'Our souls can no long bear the tricks of
the Hindi speaking Congressman.'

মানভূমে বঙ্গভুক্তি-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে টুসু-সত্যাগ্রহীদের আন্দোলনকে বিহার সরকার কঠোরভাবে দমন করার জন্য ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে বিহারের জন-নিরাপত্তা আইনের পাঁচটি দলের ১৭ জন টুসু-সত্যাগ্রহীকে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় (সরকারি কাজে বাধা দান) লোকসেবক সংঘের কর্ণধার অতুলচন্দ্র ঘোষ, লোকসভা সদস্য ভজহরি মাহাত, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ অরুণচন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক অশোক চৌধুরি প্রমুখদের গ্রেপ্তার করা হয়। অতুলচন্দ্র ঘোষ তখন ৭৩ বছরের বৃদ্ধ এবং রক্তের নিম্নচাপ, ব্রঙ্কাইটিসের জন্য শীতের প্রকোপে সাবধানে থাকতেন। তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দির মতো জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর খোলা ট্রাকের ওপর চাপিয়ে পুরুলিয়া থেকে ১৩৫ মাইল দূরে, হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ভজহরি মাহাতকে (এম. পি.) সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে হাত-কড়া দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে আনা হয়। আদালতের বিচারে তাঁর এগারো মাস কারাদণ্ড হয়।

১৯৫৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, অতুলচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী লাবণ্যপ্রভা ঘোষকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর. বি. সিং একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস বিনাশ্রমে কারা দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মুক্তি' পত্রিকা (৮/৩/১৯৫৪) থেকে জানা যায়—টুসু-সত্যাগ্রহীদের আরও পাঁচটি দলের ২৩ জন সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড, লাবণ্যপ্রভা দেবীকে আরও এক দফা কারাদণ্ড ও জরিমানা, হেমচন্দ্র মাহাতর আরও দু-দফা কারাদণ্ড ও জরিমানা, লোকসভা সদস্য ভজহরি মাহাতর আরও একদফায় এক বছরের কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা, সমরেন্দ্র ওঝার (এম. এল. এ.) এক বছরের কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। বাবুলাল মাহাত নামে পনেরো বছরের এক জন্মান্ধ বালকের তিনমাস কারাদণ্ড ও দুশত টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও দুমাসের কারাদণ্ডের আদেশ জারি হয়।

অরুণচন্দ্র ঘোষসহ আরও চারজন কর্মীকে চোদ্দ মাসের কারাদণ্ড, সাংবাদিক অশোক চৌধুরী ও রামচন্দ্র অধিকারীকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে

আরও তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাছাড়া বিহার বিধানসভার সদস্য শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জীর এক বছর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

বান্দোয়ান থানার মধুপুর গ্রামের কুশধ্বজ মাহাতর নাবালক পুত্র সুধন্বা মাহাত (১৪ বছর বয়স) টুসু-সত্যাগ্রহে ন-মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা প্রাপ্ত হয়। তা অনাদায়ে আরও তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড জারি হয়। লক্ষণীয়, নাবালক সুধন্বা মাহাতর উক্ত এক হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের জন্য পুলিশ ২১/২/১৯৫৪ তাদের বাড়ি গিয়ে সম্পত্তি ক্রোক-করার নামে নানারকম জুলুম-উৎপাত চালায়।

১৯৫৪ সালের ২ মার্চ হাবিবুল্লা নামে এক ম্যাজিস্ট্রেট কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে মানবাজার থানার পিটিদরি গ্রামে টুসু-সত্যাগ্রহীদের জরিমানা আদায়ের নামে বাড়ির তালা ভেঙে সম্পত্তি ক্রোক এবং মহিলাদের প্রতি বর্বর নগ্ন আক্রমণ চালায়।

টুসু-সত্যাগ্রহীদের দণ্ডকৃত অর্থ আদায়ে পুঞ্চা ও বান্দোয়ান থানায় পুলিশি জুলুম অব্যাহত থাকে। ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ বান্দোয়ান থানার মধুপুর গ্রামের লোকসেবক সংঘের কার্যালয়ে পুলিশ দলবলে হামলা চালিয়ে এবং বেশ কিছু গৃহস্থালী জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে ২,২৫০ কপি 'টুসুর গানে মানভূম' পুস্তিকাও নিয়ে যায়।

১৯৫৪ সালের ১৬ মার্চ বিহার সরকার নতুন কৌশল দেখান। ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত অতুলচন্দ্র ঘোষকে মাত্র দেড়মাস কারাদণ্ডভোগের মাথায় হাজারিবাগ জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়; অথচ ওইদিনই তাঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ এবং ভাবিনী মাহাতকে পুরুলিয়া জেল থেকে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেইসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জী (এম. এল. এ.) সমরেন্দ্রনাথ ওঝা (এম. এল. এ.) এবং আরও একশোজন টুসু-সত্যাগ্রহীদের পুরুলিয়া থেকে খোলা ট্রাকে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়।[৬]

ঠিক এ সময়ই বিহার সরকার মানভূমে হিন্দিভাষা প্রচারের জন্য তিরিশ লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান দেন। হিন্দিভাষা প্রসারের নামে বিহার সরকারের অনুগৃহীত কিছু নেতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত কিছু সরকারি কর্মচারী সেই বিপুল পরিমাণ টাকা যেন-তেন প্রকারে আত্মসাৎ করায় উঠেপড়ে লাগেন। সেই অভিযোগ সারা মানভূমে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫৪ সালের ২৯ মার্চ লোকসভার শিক্ষাগত দাবি সম্পর্কে আলোচনাকালে ভাষার প্রশ্ন উঠল এন. সি. চ্যাটার্জী মানভূমে টুসু-সত্যাগ্রহীদের ওপর দমন-নীতির প্রতিবাদ করেন। তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি জানান—১৯৩১-এর আদমসুমারিতে মানভূম সদর মহকুমার শতকরা ৮৭ জন বাংলা ভাষাভাষী নরনারীর উল্লেখ আছে। তাই তিনি আবেদন জানান—এ অঞ্চলের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে দমন করা অনুচিত।

৩

১৯৫৪ সালের ৫ জুলাই পাটনায় এক বিশেষ আলোচনা সভায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণ সিংহ, বিহারের শিক্ষাসচিব বদ্রীনাথ শর্মা, রাজ্য সচিব কৃষ্ণবল্লভ সহায়, তথ্য দপ্তরের সচিব মহেশপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ। আক্ষেপের বিষয় বিহার মন্ত্রীসভার ধুরন্ধর রাজনৈতিক চাতুর্যের শিকার হন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাংবাদিকদের জানান,

(ক) বিহার রাজ্যে বাংলা ভাষা-সংরক্ষণের জন্য বিহারের মন্ত্রিসভা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

(খ) অতঃপর, আরও উন্নতি হবে।

(গ) বিহারে বাংলা-ভাষা অনুশীলনে বাধা সম্পর্কে ডা. রায় যেসব অভিযোগ আগে শুনেছিলেন, সেসব অভিযোগ কার্যত তিনি দেখেছেন সঠিক নয়। তিনি জানান—বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রদের পঠন-পাঠনে বিহার-সরকার যথেষ্ট সাহায্য করছেন।

(ঘ) তিনি (ডা. রায়) আরও বলেন, বিহার সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার দমননীতির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছিল, সেসব অভিযোগ সত্য নয়, তার সন্তোষজনক উত্তর বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

(ঙ) ডা. রায় আরও বলেন, অন্যান্য যেসব অভিযোগ উঠেছে, তার সম্পর্কে তদন্ত করা প্রয়োজন এবং বিহার সরকার সে-সম্পর্কে শিগগির সদুত্তর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অথচ সেই সময় কলকাতা আশুতোষ মেমোরিয়্যাল হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান—জাতীয় জীবনে শিক্ষায় ও মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের অগ্রাধিকার একান্ত প্রয়োজন। সেইসঙ্গে হিন্দিভাষা বিষয়ে অত্যুৎসাহ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

অথচ ১৯৫৪ সালের ৯ জুলাই বিহার কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা বিনোদানন্দ রায়ের নেতৃত্বে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে বান্দোয়ান-কল্যাণ-সমিতির সভায় বিহার সরকারের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচার চালানো হয়—'মানভূম বঙ্গাল মেঁ নহীঁ জায়েঙ্গে, জানে পর খুন কে নদী বহা দেঙ্গে।' মানবাজারেও হিন্দিতে প্রচার চালানো হয়—'মানবাজারবাসী বোল্ রহা বিহার মেঁ রহেঙ্গে।' অধিকাংশ সময় এই শ্লোগানগুলি লাল শালুর ওপর সাদা তুলোর ব্যানার বানিয়ে গ্রামে-শহরে পথ-পরিক্রমায় ব্যবহৃত হত।

১৯৫৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের কুর্নুলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ ফজল আলি জানান—কমিশন ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচার করার চেষ্টা করবে। কমিশনের কাছে যে-সব অভিযোগ পেশ করা হবে সেসব অভিযোগ পরিপূর্ণভাবে বিচার করা হবে।[৭] ইতিপূর্বে তেলেগু ভাষাভাষী অন্ধ্রপ্রদেশের গঠন সংক্রান্ত দাবি ওঠে। ১৯৫৩ সালের ১০ আগস্ট লোকসভায় বিল আসে এবং তারই প্রেক্ষিতে ওই বছর পয়লা অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়।

এই উত্তাল মুহূর্তে, পুরুলিয়া উকিল-বার-অ্যাসোসিয়েশন, মানভূম জেলা-বাঙালি-সমিতি প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পঞ্চাশ পাতার এক স্মারকলিপি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে পেশ করেন। সেই স্মারকলিপিতে মোগল সম্রাট আকবরের সময় থেকে ১৯১২ সাল অবধি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে কীভাবে মানভূমবাসী ও ধলভূমবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নতুন প্রদেশের সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া হয়, তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ঐ স্মারকলিপিতে নানা যুক্তিসহ দেখান হয়—মানভূম ও ধলভূমের সংস্কৃতিগত মিল। সেই সঙ্গে বলা হয়—বাংলা ভাষা এই দুই অঞ্চলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। তাই মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের ৫৩০০ বর্গ মাইল পরিমিত একই এলাকাভুক্ত অঞ্চল সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। বিহার-সরকার নানাভাবে যে-সব দমন-পীড়ন অত্যাচার চালাচ্ছেন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ওপর—তাও নানা

তথ্যসহ লিপিবদ্ধ হয় সেই স্মারকলিপিতে।

এ সময়, মুরারডি স্টেশনের অনতিদূরে রামচন্দ্রপুরে 'সংগঠন'-পত্রিকার সম্পাদক স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী—পূর্বাশ্রমের বিপ্লবী জীবনে যাঁর নাম ছিল অন্নদাকুমার চক্রবর্তী, তিনি হিন্দিভাষার আগ্রাসনের প্রতিবাদে মাতৃভাষা বাংলার স্বপক্ষে যুক্তিযুক্ত এক প্রবন্ধ লেখেন।

১৯৫৪ সালের ২৩ আগস্ট 'মুক্তি' পত্রিকা থেকে জানা যায়—বিহারের রাজস্ব ও বনবিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় এবং আরও অনেক নেতা মানভূমকে বিহারে রাখার চেষ্টায় পুরুলিয়ার নানা অঞ্চলে জনসভা করেন। বলরামপুরের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি জগন্নাথ সরাফের ধর্মশালার দোতলায় উক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় স্থানীয় বাংলা-ভাষাভাষী নেতাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালান। একই অভিসন্ধি নিয়ে চন্দনকেয়ারি থানার বারমাস্যা গ্রামের স্কুলেও তিনি বিশেষ জনসভা করেন। সেই সভায় গৌরীনাথ ওঝা, যশোদাদুলাল সিংহ, যুগল সাহানি প্রমুখ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ অঞ্চলের জননেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাত ও অজিতপ্রসাদ সিং দেও প্রমুখ হিন্দিভাষার প্রসারে বিহার-সরকারের সঙ্গে সুর মেলান। ১৯৫৪ সালের ১৪ নভেম্বর কৃষ্ণবল্লভ সহায় কাশীপুর থানার সোনাথলি আশ্রমে গিয়ে সাধক মনোহর খ্যাপার দৈবী অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

৪

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মুক্তি'-পত্রিকার ১৩ ডিসেম্বর (১৯৫৪) সংখ্যায় বড়-বড় হরফে খবরের শিরোনাম হয়—'সীমা কমিশন বিহার সরকার ও কংগ্রেসের অপকীর্তিসমূহ—'বিহারে থাকিব' ফরমে লোককে ভুল বুঝাইয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ : জাল স্বাক্ষরের হিড়িক, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রচারের জন্য পুলিশের জবরদস্তি, দারোগা ও পুলিশ কর্মচারীদের যথেচ্ছাচার, মানভূমে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার ও অরাজকতার নাদির শাহী শাসন চলিতেছে।'

'মুক্তি'-পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতে আর একটি খবর ছাপা হয়—'রক্ত দিয়াও সত্যের প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ, রঘুনাথপুরে নতুন ইতিহাস, সত্যাশ্রয়ীদের রক্তপাতের মধ্যে জেলায় দৃঢ়তর সংকল্প, যুক্তিহারা-বুদ্ধিহারা যাহারা—অন্যায় আঘাত তাহারাই করে, অন্যায় আঘাত যাহারা করে, ন্যায়ের পরাজয় তাহাদেরই ঘটে, সত্য ও অহিংসব্রতীর পরাজয় নাই।'

মানভূমে ভাষা-আন্দোলন যখন ক্রমশ প্রবলতর, তখন সমাজ সচেতন ও বাংলাভাষাপ্রিয় বহু অভিভাবক তাঁদের নিজ নিজ পুত্রকে বাংলা-ভাষায় পড়াশুনা করার জন্যই তথাকথিত নামকরা জেলা স্কুলের হিন্দি-নাগপাশ থেকে মুক্ত করে শহরের এম.ই. স্কুলে ভর্তি করেন। আশার কথা তখন এম.ই. স্কুলের প্রাতঃবিভাগে জওহরলাল বসু, জীমূতবাহন সেন প্রমুখ আদর্শবাদী এবং কৃতী শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নিতেন।

১৯৫৫ সালের ২০ ডিসেম্বর দিল্লির লোকসভায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত বিষয়ে চৈতন মাঝি (এম.পি.) ভাষণ দেন বস্তুনিষ্ঠ সততায়। চৈতনবাবু দক্ষিণ মানভূম ও ধলভূমের নির্বাচনক্ষেত্র থেকে আদিবাসী আসনে লোকসেবক সংঘের প্রতিনিধিরূপে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালের ২ জানুয়ারি, 'মুক্তি'-পত্রিকায় তাঁর ভাষণের কিছু অংশ মুদ্রিত হয়। তা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি—

'আমরা বিহারের বাংলা ভাষা-অঞ্চলগুলি চেয়েছি। সেই সকল অঞ্চলে আদিবাসীদের নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। তাঁরা একমাত্র বাংলাতেই কথা বলেন। যেমন— ভূমিজ, দেশওয়ালি মাঝি, কড়া, মুদি, মাহলি ইত্যাদি। এবং প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালরাই নিজেদের একমাত্র আদিবাসী বুলি বলেন এবং সঙ্গে বাংলা বলেন—যা তাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা।

'সাঁওতালরা বিহারে সংখ্যায় ১৭ লক্ষ। তাদের অধিকাংশ এইসব বাংলাভাষী অঞ্চলে বাস করে। যদি এই সমস্ত অঞ্চল বাংলায় যুক্ত হয়, তবে এই সকল অঞ্চলের ১২ লক্ষ সাঁওতাল বাংলায় সাড়ে ছয় লক্ষ সাঁওতালের সঙ্গে যুক্ত হবে।'

'বিহার সরকার দাবি করেছেন যে, আদিবাসীদের সামাজিক জীবনের সম্বন্ধ বিহারের সঙ্গে। সে-কথা ভিত্তিহীন। আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ পশ্চিমবাংলার সঙ্গে। আমাদের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক জীবন বাংলা-সংস্কৃতির অনুযায়ী।'

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি ভাবনার প্রেক্ষিতে যে টুসু-সত্যাগ্রহ চলছিল, জেলার বিচার বিভাগের চোখে তার স্বরূপ কীভাবে ধরা পড়েছিল, তার দৃষ্টান্ত ১৯৫৬ সালের ২ জানুয়ারি 'মুক্তি' পত্রিকায় বিধৃত। পুরুলিয়া জজকোর্টে দীর্ঘ দু-বছর পর টুসু-সত্যাগ্রহীদের প্রতি রায় (১ম দফা) নিম্নরূপ—

'অনধিক প্রায় দুই বৎসর পরে টুসু-সত্যাগ্রহে দণ্ডিত সত্যাগ্রহীদের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জজকোর্টে আপীলের রায়ের প্রথম দফা গত ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হইল।

'টুসু-সত্যাগ্রহের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মোট ২৮টি আপীল জজকোর্টে দায়ের করা হয়। তাহার মধ্যে অ্যাডিশন্যাল জজ বর্তমানে ১৬টি আপীলে ৪৩ জন সত্যাগ্রহীর সম্বন্ধে রায় দেন।

'নিম্ন আদালতে বি.এম.পি.ও. (বিহার মেনটেনেন্স অব পাবলিক অর্ডার) অ্যাক্টের ৯ (৫) ধারায় উক্ত ৪৩ জনের ৬ মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ হইতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে ১ মাস হইতে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অনেক সত্যাগ্রহীর বিরুদ্ধে ওই একই ৯ (৫) ধারায় ২ দফা হইতে ৫ দফায় পৃথক পৃথক সাজা হইয়াছিল। এই সাজাপ্রাপ্ত সত্যাগ্রহীদের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ অন্ধ বালক ও দুইজন মহিলা আছেন। একজন শ্রীরাঘব চর্মকার ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন।

'আপীলের রায়ে—শ্রী অশোক চৌধুরী ও শ্রী অরবিন্দ ওঝাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে। আরও চারজন সত্যাগ্রহীকে—যাহাদের বিরুদ্ধে ওই একই ৯ (৫) ধারায় ৩ হইতে ৫ দফায় সাজা হইয়াছিল তাহাদের দু-একটি দফায় খালাস দিয়া বাকি দফায় সাজা দেওয়া হইয়াছে।

'সম্পূর্ণ অন্ধ বালক শ্রীবাবুলাল মাহাতকে দুই দফায় মোট ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৪ সপ্তাহের কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। শ্রীবাবুলাল ইতিমধ্যে ৮ মাস জেল খাটিয়া বাহির হইয়াছে।

'আপীলে সকলেরই নিম্ন কোর্টের দণ্ড কমাইয়া ২ মাস সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিন হইতে একমাস কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হইয়াছে।

'ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে—আপীলগুলি দায়ের করবার প্রায় দুই বৎসর পরে মাত্র ১৬টি মামলার রায় প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যে বেশিরভাগ সত্যাগ্রহীরাই ৬ মাস হইতে ১ বছর পর্যন্ত জেল খাটিয়া বাহির হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে কেহ ২১ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে। জরিমানা আদায়ের জন্য বহু অমানুষিক ব্যাপারও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আপীলে দণ্ডাদেশ যাহা কমিয়াছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাহার অনেক অনেককাল জেল খাটা হইয়া গিয়াছে।

'এই আপীলের শুনানির সময় আসামি পক্ষের উকিল শ্রী জ্যোতির্ময় দাসগুপ্ত একটি বিশেষ

ব্যাপারের প্রতি অ্যাডিশন্যাল জজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে—সম্প্রতি 'বাংলায় যাইব না' বলিয়া পুরুলিয়াতে যে তথাকথিত সত্যাগ্রহের অভিনয় করান হইল, তাহাতে ওই একই বি.এম.পি.ও-র ৯ (৫) ধারায় একই ম্যাজিস্ট্রেট তথাকথিত আসামিদের 'আদালতে উঠা পর্যন্ত' সাজা দেওয়াই পর্যাপ্ত মনে করিয়াছিলেন। অথচ এদিকে টুসু-সত্যাগ্রহীদের ওই একই ধারায় ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশও পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। অ্যাডিশন্যাল জজ মহোদয় জানান যে—ইহা বিচার-ম্যাজিস্ট্রেটের অভিরুচি।

'আপীলের বিচারে এক দফায় শ্রী অটল মাহাত ও হেম মাহাতকে রেহাই দিয়ে অ্যাডিশন্যাল জজ মন্তব্য করেন যে—রেহাই দেওয়া হইল; কর্তৃপক্ষ ইহাদের বিরুদ্ধে আবার নতুন করিয়া মোকদ্দমা আনিতে পারেন।

'উকিল সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় দাসগুপ্ত, জগদীশ চ্যাটার্জী, সতীশচন্দ্র সাহা, প্রমোদকুমার ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হরকালী মুখার্জী প্রভৃতি আসামিপক্ষ সমর্থন করেন।'

বিহার সরকার পুরুলিয়ার বঙ্গভক্তির বিরুদ্ধে জনমত সমর্থনের চেষ্টায় বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে হরতালের ডাক দেন। ১৯৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি 'মুক্তি' পত্রিকা থেকে জানা যায়, হরতাল জন-সমর্থন না-পাওয়ায় ব্যর্থ হয়। ফলে, সরকারের গোপন নির্দেশে পুলিশ জেলার সব বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং জনগণের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দুষ্কৃতি দমনে নীরব থাকে। বিশেষ মদতে গুণ্ডারা ঝালদা ও চান্ডিলে বাঙালিদের সম্পত্তি লুঠ করে। প্রশাসনিক অরাজকতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রতিবাদে মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্র ঘোষ ১৯৫৬ সালের ১৮ জানুয়ারি, তার বার্তা যোগে মানভূমের দুঃসহ পরিস্থিতির কথা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে জানান। সেইসঙ্গে বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণের প্রতিবাদে ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারি পুরুলিয়ায় সর্বাত্মক হরতাল পালন হয়। জেলার সর্বত্র দোকানপাট, যানবাহন বন্ধ থাকে। জেলার অধিকাংশ পরিবার অভাবনীয়ভাবে সন্ধ্যা অবধি অরন্ধন দিবস পালন করেন। বিকেল পাঁচটায়, পুরুলিয়া শহরের রাসমেলা ময়দানে বিশাল জনসভা হয়। সেইসভার পরিচালক ছিলেন জনপ্রিয় নেতা অতুলচন্দ্র ঘোষ।

সেই উত্তাল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ১৯৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি যুক্তভাবে বিবৃতি দেন —

'পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একত্র করে 'পূর্বপ্রদেশ' নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হবে।' তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দসহ বিরোধীদলগুলি ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।[৮]

পুরুলিয়াকে বিহারে যুক্তির প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সারা বাংলা ঐতিহাসিক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতি বসু, গোপাল হালদার, কাজি আবদুল ওদুদ প্রমুখ বক্তাগণ ভাষণ দেন।

ভাষার দাবি নিয়ে, মানভূম-বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদে জামতাড়া গ্রামে দশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। লোকসেবক সংঘের কর্মিবৃন্দ জেলা সম্মেলনে বাংলায় সত্যাগ্রহ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল। বাংলা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ৭ বৈশাখ। শুক্রবার। সকাল। পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাকবিড়র‍্যা গ্রাম থেকে শুরু হয় ঐতিহাসিক বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান। লোকসেবক সংঘের অতুলচন্দ্র ঘোষ এর তাঁর সহধর্মিণী-নেত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে ১,০০৫ জন নরনারী পদব্রজে কলকাতা অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। বৃদ্ধ দলনেতা অতুলচন্দ্র গোরুর গাড়িতে থাকেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি উচ্চারণ করে পদযাত্রার শুরু।[৯] শোভাযাত্রার মধ্যস্থলে উদীয়মান সূর্য ও চরকা চিহ্ন শোভিত লোকসেবক সংঘের সাদা পতাকা। বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, ভজহরি মাহাত, চৈতন মাঝি, অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের পরিচালনায় মাদল, খোল, করতালসহ পর্যায়ক্রমে টুসু গান গাওয়া হয়—

(১) শুন বিহারী ভাই—
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই। (ইত্যাদি)

(২) আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে। (ইত্যাদি)

এইসব টুসুগানের সঙ্গে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' রবীন্দ্রসংগীতটি দরদীকণ্ঠে উদাত্ত সুরে সমবেতভাবে গাওয়া চলতে থাকে।

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে (৯/১০/১৯৮৭), তেজস্বিনী লাবণ্যপ্রভা দেবী জানান—'পদযাত্রার সময় বিভিন্ন মানুষের এত ভালবাসা পেয়েছি, সে কথা ভাবলে আজ চোখে জল আসে। চলার পথে কত পুরনারী গরদের শাড়ি, বেনারসি শাড়ি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তোরণ বানিয়েছেন। পায়ে আলতা মাথায় সিঁদুর দিয়ে বরণ করেছেন।'[১০]

পদব্রজে যাত্রাপথে সব জেলার মানুষ পদযাত্রীদের শরবত, শশা, আখকুচি দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন। বঙ্গ-সত্যাগ্রহ অভিযানের পদযাত্রার কর্মসূচি এবং পথসংকেত আগাম জনসাধারণের কাছে যথারীতি প্রচার করা হয়েছিল। তাই প্রতিদিন দুপুরে হাজারের উপর সত্যাগ্রহী কোথায় খাবেন, সেইসব দিন বিকেলে কোথায়-কোথায় জনসভা এবং রাতে আবার কোন্-কোন্ জায়গায় বিশ্রামস্থল হবে—তার আগাম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। দেশের অসংখ্য মানুষ উৎসাহের সঙ্গে পদযাত্রীদের সত্যাগ্রহকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন। তা ছাড়া অত্যন্ত খুশি মনে হাজারের বেশি নরনারীদের দুপুর ও রাতের খাওয়ার সুব্যবস্থা করতে দ্বিধা করেননি।

পুরুলিয়া থেকে কলকাতা পৌঁছোতে সত্যাগ্রহীদের পদযাত্রা একটানা যোলো দিন অব্যাহত ছিল। সত্যাগ্রহী দল পদব্রজে বাঁকুড়া শহর, বেলেতোড়, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান শহর, রসুলপুর, মেমারি, পাণ্ডুয়া, মগরা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, গোঁদলপাড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, হাওড়া পেরিয়ে ১৯৫৬-র ৬ মে, রবিবার বিকেলে কলকাতায় পৌঁছোন এবং কলকাতা-ময়দানে জনসভা করেন।[১১]

পরদিন ৭মে, বিকেলবেলায় সত্যাগ্রহীরা অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ডালহৌসি-স্কোয়ার অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন নেতাজি সুভাষ রোডে।[১২] কলকাতা-প্রেসিডেন্সি জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও আলিপুর স্পেশ্যাল জেলে সত্যাগ্রহীদের রাখা হয়।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৬ সালের ৩ মে, দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে মন্ত্রিসভায় আলোচনায় বসেন এবং বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল করেন। ওই বছরই, ১৬ আগস্ট লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ-বিহার ভূমি-হস্তান্তর বিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পুরুলিয়া সদরের ষোলোটি থানা এবং আরও কিছু অংশ ১ নভেম্বর, ১৯৫৬ থেকে পশ্চিম বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করার কার্যকরী সিদ্ধান্ত হয়।[১৩]

১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। সেদিনই 'মুক্তি'-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কবি নরেন্দ্র দেব ও কবিজায়া রাধারানী দেবী এই জেলার শুভ জন্মলগ্নে যে অভিনন্দন-কবিতা পাঠান, সে-কবিতাটি 'মুক্তি'-পত্রিকায় (১৭শ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, সম্পাদক, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত) অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি যথাযথভাবে উদ্ধৃত করছি—

সুস্বাগতম্

বহু মানে আজ মানভূমে মোরা
এই শুভদিনে নিলাম বরি,
ধন্য হলেন জননী আবার
হারানো তনয় বক্ষে ধরি।
জয় গৌরবে এসেছে ফিরিয়া
সন্তান তার আপন গেহে,
ছিন্ন অঙ্গ দেশমাতৃকা
দেখা দিল পুনঃ পূর্ণ দেহে।
জানি, জানি যাহা রয়ে গেল বাকি
মাতৃভাষার ঐক্যতীরে
তোমাদের দৃঢ় সাধনার বলে
একদা তাহাও আসিবে ফিরে।

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, স্মৃতিপ্রিয়তায় ভাষা-আন্দোলনের কথা ফিরে দেখা—যা ভালোবাসার নামান্তর।

উৎস-সূত্র

১। বদরুদ্দীন উমর পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১।

২। Circular No. 701/5R-6-48, dt. 18th March, 1948.

৩। Circular of District Inspector of Schools, Manbhum under No.700, IIG-5-48, Purulia, 8th March, 1948.

৪। ধলভূমের বঙ্গভুক্তি ভাবনায় গঠিত হয়েছিল 'মুক্তি পরিষদ'। হিন্দি, ওড়িয়া, সাঁওতালি ভাষাভাষীর মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা সেখানে বেশি ছিল। তবু রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ধলভূমের বঙ্গভুক্তির দাবি মানেননি। দ্রষ্টব্য—Report of the States Reorganisation Commission, Para, 667।

৫। 'টুসুর গানে মানভূম' নামে তদানীন্তন জনপ্রিয় পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

৬। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ভাষা-আন্দোলন ও টুসু-সত্যাগ্রহ দমনে বিহার সরকারের নানাবিধ নিপীড়ন চিত্র এবং টুসু-সত্যাগ্রহীদের সুপরিকল্পিত কর্মধারার দিগ্‌দর্শনকারী এগারোটি বুলেটিন মদীয় 'টুসু'-গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠা থেকে ২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ড. শান্তি সিংহ, টুসু লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯ প্রকাশিত।

৭। Govt. of India, Home Affairs-এর Resolution No. 53/69/53-Public, dated 29th December, 1953 গঠিত হয়েছিল The States Reorganisation Commission, চেয়ারম্যান—সৈয়দ ফজল আলি। অন্যতম সদস্য হৃদয়নাথ কুন্‌জ্‌রু। কমিশনের রিপোর্ট জমা দেবার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫।

৮। ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাব ছিল—সংযুক্ত 'পূর্বপ্রদেশ'-এ বাংলা ও হিন্দি দুটিই সরকারি ভাষা থাকবে। বিধানসভা, ক্যাবিনেট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি করে থাকবে। হাইকোর্ট থাকবে দুটি। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিমলচন্দ্র সিংহ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেসিরা 'পূর্বপ্রদেশ' প্রস্তাব সমর্থন করেননি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) এবং অন্যান্য বামপন্থী দল উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল জনমত গঠন করেন।

৯। সত্যাগ্রহীরা দশটি বাহিনী গড়েছিলেন। নয়টি দল নিয়ে গঠিত প্রতি বাহিনীতে ১০০ জন সত্যাগ্রহী। প্রতি বাহিনীতে ছিলেন একজন দলপতি।

১০। মহিলা দলনেত্রীদের প্রধানা ছিলেন ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের মেয়ে বাসন্তী রায় ও বর্ষীয়সী নেত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবী। তাছাড়া ভামিনী, দামিনী, সারদা, পূর্ণিমা, যশোদা, লক্ষ্মী, চাঁপা প্রমুখ বেশ কয়েকজন অভিযাত্রিণী সত্যাগ্রহীদের দলে ছিলেন।

১১। কলকাতার অসংখ্য নরনারী সত্যাগ্রহীদের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান। তাঁদের মধ্যে হেমন্ত কুমার বসু, জ্যোতি বসু, মোহিত মৈত্র, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বৈকালি জনসভায় সভাপতিত্ব করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধলভূমের বঙ্গভুক্তির দাবিতে বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী ও কিশোরীমোহন উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'মুক্তি পরিষদ'-এর ১৭৫ জনের একটি পদযাত্রীদল ধলভূম থেকে কলকাতায় পৌঁছোন ৫ মে, ১৯৫৬। তাঁরা হাজরা পার্কে একটি জনসভা করেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সাতকড়ি রায় প্রমুখ সমাজমনস্ক বুদ্ধিজীবী উক্ত জনসভায় ভাষণ দেন।

১২। ৯৬৫ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করেন। সেই সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করেন।

১৩। ১৯১১ সালে মানভূম জেলার আয়তন ছিল ৪১৪৭ বর্গ মাইল। সদর মহকুমায় দশটি থানা এবং ছয়টি ফাঁড়ি ছিল। সদর এবং ধানবাদ মহকুমার আয়তন ছিল যথাক্রমে ৩৩৪৪ বর্গ মাইল এবং ৮০৩ বর্গ মাইল।

১৯৫১ সালে মানভূম জেলার আয়তন ছিল ৪১১২ বর্গ মাইল। অথচ ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির সময় তার আয়তন দাঁড়ায় মাত্র ২৪০৭ বর্গ মাইল।

চাষ, চন্দনকিয়ারি যুক্ত হয় ধানবাদের সঙ্গে। অন্যদিকে পটমদা, চাণ্ডিল, ইচাগড় থানা যায় সিংভূমে।

প্রসঙ্গ সমবায়—মানভূম তথা পুরুলিয়া

শ্যামাচাঁদ ব্যানার্জী

সমবায় সমিতি বিভিন্ন ব্যক্তির ঐচ্ছিক মিলনের দ্বারা গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। মূলতঃ আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে গঠিত হয়। যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৮৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর গ্রেট্ ব্রিটেনেরঃ ম্যাঞ্চেস্টারের কাছে '৯৮ডেলের' চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট ২৮জন তন্তুবায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহুমৃত সমবায় সমিতির কঙ্কালের ওপর ইংল্যান্ডে জন্ম নেয় "দি রচডেল সোসাইটি অফ্ ইক্যুইটেবল পাইওনিয়ার্স"। ১৮৫২ সাল থেকে পৃথিবীতে সমবায় আইনের যাত্রা শুরু। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের কেন্দ্রীয় মানুষ ছিলেন ফ্রেডারিক অগাস্টাস নিকলসন। ১৯০৪ সালে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ্ অ্যাক্ট লর্ড কার্জনের আগ্রহেই আইন তৈরি করে ভারতবর্ষে পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন চালু হয় ১৯৪২ সালের ২রা জুলাই। মানভূম জেলা কৃষক প্রধান জেলা ছিল। কৃষকের আর্থিক দশা ভয়ঙ্কর খারাপ ছিল। কৃষকরা ঋণ নিয়ে জন্মাত, জীবোদ্দশায় ঋণের পরিমাণ বাড়াতো এবং মৃত্যুর সময় ঋণের বোঝা আরো বাড়িয়ে মরত। ১৯২৯-৩০ সালে বিহারও উড়িষ্যা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের গঠিত তথ্যানুযায়ী কমিটির পাওয়া রিপোর্টে জানা যায় যে কৃষকরা ঋণ পেত গ্রামের মহাজনদের থেকে। যাদের বেনিয়া বলা হত। ক্ষুদ্র মহাজনরা আবার বড় মহাজনদের থেকে ঋণ নিয়েও দাদন করত। ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল। সুদের হার ছিল কৃষক ইত্যাদির জন্য ৫০% থেকে ১০০% একটি চাষের মরশুমের জন্য বিশেষতঃ ধান চাষ, মানে চার মাসের জন্য। আবার শস্য ঋণও দেওয়া হত, যা মেটাতে হতো দ্বিগুণ হারে একটি চাষের মরশুমের মধ্যে মানে ছয় মাসের মধ্যে। সমবায় সংস্থা মোট ঋণ চাহিদার ২% পর্যন্ত ঋণ দিতে অক্ষম ছিল।

১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসীল জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে বরাবাজারের ৭টি গ্রামে ও বলরারামপুরের ২টি গ্রামের ৮৩০টি পরিবারের মোট শস্য ঋণ ও টাকা লোনের তথ্য। বরাবাজারের ৪৪১টি পরিবারের মধ্যে ২৩৩টি পরিবারের ঋণ ছিল ৬৮ টাকা গড় টাকার হিসাবে আবার শস্য ঋণ ১২৫ কেজি হারে। বলরামপুরের ৩৮৯টি পরিবারের মধ্যে ২৩৩টি পরিবার ঋণগ্রস্থ ছিল গড় ৩০টাকা ও ২১৪ কেজি গড় শস্য ঋণ ছিল। আমরা এই তথ্য থেকে কোন সম্প্রদায়ের কত ঋণ ছিল তা জানতে পারি। পুরুলিয়া শহর এলাকায় কয়েকটি বেসরকারী ব্যাঙ্ক বা তার শাখা ছিল যেমন—ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক, সোনার বাংলা ব্যাঙ্ক, মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, বিষ্ণুপুর ব্যাঙ্ক ইত্যাদি, এই ব্যাঙ্কগুলি কিছুকাল পরে পরেই অনেক লোকের টাকা জমা নিয়ে ভরাডুবি হয় বা শাখা বন্ধ করে।

স্বাভাবিক কারণেই গ্রামীণ মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ গ্রামীণ এলাকায় যুবরা সমবায় সমিতি স্থাপনে আগ্রহ নেয় ১৯১৪ সালের পর থেকেই বিহার আমলে। গ্রামীণ সমবায়গুলি বিহার সমবায় আইন মেনেই রেজিস্ট্রি হতো। পুরুলিয়া শহরে সর্ব প্রথম যে সমবায় সমিতিটি জন্ম নেয় তা হল একটি ক্রেডিট সোসাইটি। পুরুলিয়া গর্ভনমেন্ট অফিসারস কোঃ অপঃ এস্যোসিয়েশন লিমিটেড। রেজিস্ট্রি নং ৪৫৫ অফ্ ১৯১৮-এর পরই আমরা গ্রামীণ সমবায়গুলি পাই, এক্ষণে বলা দরকার যে ১৯১৮ সালে জয়পুরের শাল গ্রামে স্থানীয় যুবক শ্রী জয়সিং মাহাত, শ্রী দন্ডীরাম মাহাত, নিজ নিজ গ্রামের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে এবং নিজেরা অগ্রিম টাকা দিয়ে কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋনের ব্যবস্থা করে যদিও সমবায়টি ১৯২৪ সালের ১০ই এপ্রিল রেজিস্ট্রি হয়। আবার জয়পুরের নারায়ণপুর গ্রামেই এই বৎসরেই (১৯১৮) একটি সমবায় সমিতি তৈরি হয় ও রেজিস্ট্রি করান হয়। নারায়ণপুর সমবায় সমিতিটি পরবর্তী পর্য্যায়ে বিস্তার লাভ করে বর্তমানে যাহা চাঁপাই টড় কৃষি উন্নয়ন ও সমবায় সমিতির সাথে সংযুক্ত হয়। পাড়া ব্লকে আমরা দেখতে পাই রামপুর কোঃ অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি নং ৬১৪/সি, ১.৯.১৯২০, বেলমা মাল্টিপারপাস কোঃ সোসাইটি ৫১২/৭.৩.১৯২১, হববহাল মাল্টিপারপস কোঃ সোসাইটি ১৬সি/৯.৯ ১৯২১, পিঁড়ড় গোড়িয়া এম. পি. সি. এস. ২৩সি ২০.১১.১৯২১, প্রতাপপুর ১ নং কোঃ সোসাইটি ৪৮৫ অফ্ ১৯২১ রঘুনাথপুর ২নং ছিল বামররা কোঃ সোসাইটি ১০০/সি ১৯২১। নিম্নের সারণি থেকে সমবায় তৈরির আভাষ আমবা পাবো ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল।

সমবায় সমিতির নাম	রেজিস্ট্রেশন নং	তারিখ
১। পুরুলিয়া গর্ভ অফিসার্স ক্রেডিট	455	1918
২। নারায়ণপুর কৃষি উন্নয়ন	48K	20.2.1921
৩। রামপুর কোঃ ক্রেডিট	614C	1.9.1920
৪। বেলমা মাল্টিপারপস	512	7.3.1921
৫। হিয়ার বহাল ,,	16C	9.9.1921
৬। পিড়র গোড়িয়া ,,	23C	20.11.1921
৭। প্রতাপপুর ১নং কোঃ সোসাইটি	485	1921
৮। বহড়া মাল্টিপারপস	21C	19.2.23
৯। সিধার বাড়ী ১ নং	105C	1.5.23
১০। বামারহা কোঃ সোসাইটি	100C	1921
১১। গুড়রুবাসা মাল্টিপারপাস (হুড়া)	44	14.1.23
১২। চাকলতা (হুড়া) ,,	14	5.5.24
১৩। কাপাসগড়া ,,	25	20.2.23
১৪। জামবাইদ ,,	85	4.4.23
১৫। কাহান মাল্টিপারপাস	511	2.9.24
১৬। ডুমুরডি কোঃ সোসাইটি	49R	25.6.25
১৭। ডিমডিহা মাল্টিপারপস	606	5.2.26
১৮। সিরকাবাদ গুড় শিল্প সমবায়	10P	4.2.59
১৯। মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস স্টুডেন্ট কনজিউমারস্ স্টোর	7P	27.12.60

২০। পুরুলিয়া লোক্যাল ফান্ড এমপ্লয়িজ্	25M	26.7.36
২১। গাড়াফুসড়া মাল্টিপারপাস	55man	23.2.56
২২। কটরা	13man	9.9.51
২৩। আদরা কোঃঅপা স্টোরস	45R	1947
২৪। ধনুক টাঁড় কোঃ	52of	1947
২৫। মানভূম ট্রান্সপোর্ট	3 R	1948
২৬। পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কোঃ ব্যাঙ্ক	46(P)	19.9.47
২৭। পুরুলিয়া ডিঃ হোলসেল		1965
২৮। District of Co.ope Union		27.6.56
২৯। তুলিন লাক্ষা ও গালা কোঃ		28.3.1957
৩০। সিজুলী	WCS-19(man)	2.3.54

জেলায় গঠিত হয় পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কোঃ ব্যাঙ্ক। তখনকার আইন ও ব্যাঙ্কের উপবিধি অনুসারে ডেপুটী কমিশনার চেয়ারম্যান হন। ১৯৩২ সালে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও বৃটিশ শাসনে ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে যায়। দীর্ঘ ১৫ বছর ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বন্ধ হয়। ১৯৪৭ সালে পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন নামে আবার নিবন্ধীকরণ হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পর্যন্ত উপরোক্ত নামে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলে। ১৯৫৮ সালে সালে মানভূম তথা পুরুলিয়া বঙ্গীয় সরকারে ফিরে এলে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিঅর্গানাইজেশন স্কীমে আবার পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নাম ফিরে আসে। প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রী অশোক চৌধুরী। ১৯৬০ সালে শ্রী সুধীর কুমার ব্যানার্জী (লধুড়কা) ১৯৬১-৬২ সালে শ্রী দিগেন্দ্রনাথ মিশ্র। ১৯৬৭ সালে ঋণ আদায়ের সঙ্কটে আবার লিক্যুইডেশনের কবলে পড়লেও শ্রী অশোক চৌধুরী শ্রী অরুণ ঘোষ ও মাননীয় মন্ত্রী বিভূতীভূষণ দাশগুপ্তের হস্তক্ষেপে রক্ষা পায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে ম্যানেজার ছিলেন বর্তমান প্রখ্যাত শিক্ষক (ভিক্টোরিয়া স্কুল) শ্রী প্রণব কুমার চ্যাটার্জী। ১৯৭০-৭১ সালে অবস্থা আবার সংকট হলেও উত্তরোত্তর ব্যাঙ্কের শ্রীবৃদ্ধি তথা টাকা জমা ও ঋণ দাদন ও আদায় বাড়তে থাকে। ১৯৮০-৮১ সালে শ্রীসৌম্যনাথ মল্লিক (.পিতা জেলার বিশিষ্ট সামাজসেবিকা তথা ডাক্তার শ্রী প্রভাত কুমার মল্লিক ও মাতা পুরুলিয়া জেলার নারী আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ও পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী রেখা মল্লিক) ব্যাঙ্কের সভাপতির দায়িত্ব পান শ্রী দিগেন্দ্র নাথ মিশ্রের কাছ থেকে। ১৯৭২-৭৭ জেলাশাসক মিস্টার জাকুমা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন।

পর্যালোচনা করে জানতে পারি যে সরকারী মদতে ও নির্দেশেই পুরুলিয়া জেলায় প্রথমে ক্রেডিট কোঃ সোসাইটি (CCS), কৃষি ও কৃষি ঋণদান সোসাইটি (KRS), লার্জসাজ সমবায় সোসাইটি (LSS) মাল্টি পারপাস কোঃ অপাঃ সোসাইটি (mpcs), সমবায় সংযুক্ত কৃষি সমিতি (SSKS) ও পরে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি (SKUS) গঠিত হয় গ্রামীণ কৃষকদের স্বার্থে। তপসীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ১৯৬০ সালের পর থেকেই গঠিত হয় আলাদাভাবে UGSS, BOKRS (উপজাতি গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডার ও কৃষি ঋণ দান সমিতি) Lamp ইত্যাদি। গ্রামের অভ্যন্তরে আদিবাসী এলাকায় তৈরি হয়।

গ্রেন গোলা বা শস্যভাণ্ডার। যা আজও কিছু কিছু গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়।

নিম্নের সারণী থেকে আমরা জানতে পারবো ১৯৭০ পর্যন্ত কত সমবায় সমিতি গঠিত ছিল

ব্লকের নাম		মোট সমিতি
১।	পুরুলিয়া সদর	৫১টি
২।	পুরুলিয়া ১নং	২৪ টি
৩।	পুরুলিয়া ২নং	৪৩ টি
৪।	ঝালদা ১নং	৩৭ টি
৫।	ঝালদা ২	২৬ টি
৬।	জয়পুর	২৫ টি
৭।	আড়ষা	৩১ টি
৮।	কাশীপুর	২৫ টি
৯।	পাড়া	২৮ টি
১০।	সাতুড়ি	১১ টি
১১।	নিতুড়িয়া	১২ টি
১২।	বলরামপুর	২৭ টি
১৩।	বরাবাজার	২৩ টি
১৪।	বান্দোয়ান	২০ টি
১৫।	পুঞ্চা	৪৫ টি
১৬।	মানবাজার-১	৪৫টি
১৭।	মানবাজার-২	২১ টি
১৮।	রঘুনাথপুর-১	৩৭ টি
১৯।	রঘুনাথপুর-২	৩৩ টি
২০।	বাঘমুন্ডি	৩০ টি
২১।	হুড়া	৫৭ টি
		৬৫১টি

এই সময়েব লিক্যুইডেশন সমিতি সংখ্যা-৪২৩টি, সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল—১০৭৪টি।

উপরোক্ত সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে

১।	কোঃ ব্যাঙ্ক	১টি
২।	ডিস্ট্রিক্ট ইউনিয়ন	১টি
৩।	ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল	১টি
৪।	হোলসেল	১টি
৫।	ক্রেডিট কোঃ	১১টি
৬।	SKUS	২৮৪টি
৭।	গ্রেন গোলা	৫৭টি
৮।	কর্মচারী ঋণদান	৩টি
৯।	কন্‌জিউমারস	৪৭টি
১০।	লার্জসাইজ মার্কেটিং	১৭টি

১১।	কেন্টিন	৪টি
১২।	উইভার্স	৪৩টি
১৩।	ফিশারম্যান	৮টি
১৪।	কাঁসা শিল্প	৪টি
১৫।	প্রেস	১টি
১৬।	সিনেমা	২টি
১৭।	চাল	২টি
১৮।	অন্যান্য	৩৪টি
১৯।	হাউসিং	২টি
২০।	MPCS	৫২টি
২১।	ট্রান্সপোর্ট	৮টি
২২।	লেবার	৪৩টি
২৩।	জয়েন্ট ফার্মিং	১১টি
২৪।	বেল ফার্মিং	৫টি
২৫।	লাইভ স্টক	৭টি
২৬।	নন এগ্রিকালচার	১টি
২৭।	লার্জ সাইজ ক্রেডিট	১টি
২৮।	ক্ষুদ্রশিল্প	১টি

১৯৭০ সালের পুরুলিয়া জেলার স্তর বিন্যস্ত জমির ১০% টাঁড় ৫০% বাইদ ৩০% কানালী এবং ১০% বহাল বা নিম্নজমি (সুফসলী জমি) ছিল। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০·৫৮% একর। জনসংখ্যার ঘনত্ব ২৫৬ জনপ্রতি বর্গ কিমিতে। বৃষ্টিপাত ১৩০০ মিলি, গড় ফলন ৫০০ কেজি একরে। জেলার আয়তন ২৪১০ বর্গমাইল অর্থাৎ ৬২৩৪ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা ১৬,০২৮৭৫ (১৯৭১)। সাধারণতঃ চাষ হতো ৫,৭০,০০০. এবং জমিতে (৪৮%) সেচযুক্ত জমি ৬০,০০০ একর ৮%। এই সময় পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ টাকা, ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১৯৭০-৭১ সালে প্রথম আত্মবিশ্বাস করে ঋণ দাদন শুরু করে কোলকাতা হেড অফিস থেকে (নিয়ন্ত্রিত হতো) ঋণ দাদনের পরিমাণ ছিল ৪১ লক্ষ টাকা। আমরা অনুধাবন করতে পারি যে জেলার কৃষিক্ষেত্রে ঋণের ও পরিবারগুলি আর্থিক দায়ের ক্ষেত্রে, ও ব্যবসা ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন তা মেটাতে সমবায় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অক্ষম ছিল। ফলতঃ গ্রামীণ মহাজনরাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের থাবা বাড়িয়েই রেখেছিল। সরকার থেকে আইন করে ১৯৪০ সালে লাইসেন্স প্রথা চালু করে যাতে গ্রামীণ মহাজনরা নির্দিষ্ট আইনের মধ্যে থাকতে পারে। ৮৬ জন মাত্র রেজিস্টার্ড মানিলেন্ডার ছিল। এর বাইরেও বহু মহাজন এই লাইসেন্স প্রথার বাইরে থেকে কাজ-কারবার করত।

TABLE—A

EXTENT AND INCIDENCE OF INDEBTEDNESS IN SEVEN VILLAGES OF BARABAZAR POLICE STATION

Tribe/Caste Community	Total No. of families	Indebted families	Percentage of indebted families to total familites (col. 3 to col. 2)	Average per family debt among indebted	
				Cash (in Rs)	Kind (Paddy in Kgs.)
Bhumij	47	27	57.45	47	66
Kharia	4	—	—	—	—
Kora	31	18	58.06	4	172
Santal	95	47	49.47	30	107
Total Scheduled Tribes	177	92	51.98	30	108
Bauri	94	36	38.30	40	85
Dhoba	5	4	80.00	45	97
Hari	10	—	—	—	—
Total Scheduled Castes	109	40	36.70	41	86
Bhuiya	18	7	38.89	36	107
Brahman	37	17	45.95	438	61
Goala	7	5	71.43	60	343
Kalhu	15	8	53.33	57	149
Karmakar	13	8	61.54	37	247
Kurmi Mahato	63	56	88.89	49	163
Napit	1	—	—	—	—
Sahis	1	—	—	—	—
Total of Other Communities	155	101	65.16	114	156
Total of All Communities	441	233	52.81	68	125

TABLE—B

EXTENT AND INCIDENCE OF INDEBTEDNESS IN TWO VILLAGES OF BALARAMPUR POLICE STATION

Tribe/Caste Community	Total No. of families	Indebted families	Percentage of indebted families to total familites (col. 3 to col. 2)	Average per family debt among indebted Cash (in Rs)	Kind (Paddy in Kgs.
Bhumij	79	44	55.70	24	255
Kharia	2	—	—	—	—
Santal	94	51	54.26	10	143
Total Scheduled Tribes	175	95	54.29	16	195
Dhoba	60	47	78.33	17	258
Dom	3	—	—	—	—
Muchi	36	13	36.11	20	49
Total Scheduled Caste	99	60	60.61	18	213
Bhuiya	1	1	100.00	—	75
Brahman	1	—	—	—	—
Goala	10	5	50.00	—	202
Kalhu	11	9	81.82	244	87
Kandu	1	1	100.00	—	75
Karmakar	10	6	60.00	50	194
Kurmi Mahata	48	31	64.58	38	195
Napit	19	17	89.47	30	501
Oriya	1	—	—	—	—
Subarnabanik	2	1	50.00	150	—
Tanti	6	6	100.00	23	168
Vaisnab	5	1	20.00	—	75
Total of Other Communities	115	78	67.83	57	240
Total of All Commuities	389	233	59.90	30	214

পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কোঃ ব্যাঙ্কের কাজকর্মের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল। শাখা সংখ্যা-২ বলরামপুর, ঝালদা।

	সদস্য সংখ্যা	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫
১।	সমিতি	৬৯৪	৫১৪	৫৩৯
২।	নামিক সদস্য	৫৮	৫৮	৬১
	কার্যকরী মূলধন	৫২·১১	৮১·৯৮	৯২·৭৫
	ঋণ দাদন	২০·২৪	৩৭·৩৯	৩৫·১৮
	ঋণ বকেয়া	৩১·৩১	৫·৭৬	৪০·৩৬
	জমা	২০·২১	২৩·৯৮	২৫·৭০
	লভ্যাংশ	০·৭৮	০·৮৪	০·৮৯

পুরুলিয়া ল্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাজকর্মের হিসাব ঃ

সদস্য সংখ্যা	২৫২১০	২৯১৮০	৩৪০০০
কার্যকরী মূলধন	২৩·২৮	৩০·৭৪	৩৬·২৩
লোন দাদন	১৩·৭৭	২০·৭৫	২৫·২০
লোন বকেয়া	১৫·৭৯	২০·৩৮	২৪·০০
জমা	০·৩৮	০·৭৫	—
লভ্যাংশ	·৩০	০·৪১	০·৫৪

১৭টি লার্জ সাইজ কোঃঅপারেটিভ মার্কেটিং তথ্য দেওয়া হল ঃ

১।	সমিতি	৩৩৮	৩৬৪	৩৭২
২।	নামিক	৩২,৩১০	৩২,৩১০	৩২,৯২৫
	কার্য্যকরী মূলধন	৬·৯৪	৬·৫৮	৬·৮৯
	জমা মূলধন	০·১৬	০·১১	০·১৭
	কাঁচামাল ক্রয়	১৩·৮৯	৯·৬১	১৬·৭৬
	বিক্রয়	০·৩৩	০·২৯	০·২৫
	লাভ	০·১৬	০·৩৮	০·৪৯
	ক্ষতি	০·০৪	০·০৩	০·০২

পুরুলিয়া হোলসেল কন্‌জুমারস কোঃ অপারেটিভ সোসাইটির কাজকর্ম ঃ

১।	সমিতি	৩৩	৪১	৪৬
২।	নামিক	৪৫২	১২৪১	২২২৪
	কার্য্যকরী মূলধন	৩·৮৫	৫·৪৬	৮·৭২
	জমা	·৬৮	·১০	·২১
	ক্রয় (Puchase)	১৮·০১	১৯·০৬	২৮·৬১
	বিক্রয় (Sale)	১৮·৪১	১৮·৪৫	৩০·১০
	লাভ/ক্ষতি	+০·৮৬	+ ·২৪	+·২৬

১৯৭০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে জেলাভিত্তিক, জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন পক্ষ থেকে ২ দিনের আলোচনাচক্র শুরু হয়। বিষয় ছিল "পশ্চাদপদ পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা" রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহ সভাপতি শ্রী হরিদাস

মুখার্জী অন্যতম ডিরেক্টর শ্রী সুনীল ধর ও সুনীল ঘোষ (বর্তমান রাজ্য সভাপতি), অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রী ডমন কুইরী জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী করালী চরণ পাল ও পরিচালক মন্ডলীর সকল সদস্য, অশোক চৌধুরী প্রমুখ ২৫০ জনের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী স্বপন ব্যানার্জী প্রধান অতিথি ছিলেন।

উক্ত ২ দিনে প্রতিনিধিদের ১২টি গ্রুপে ভাগ করে ১জন গ্রুপ লিডারের নেতৃত্বে নিজ নিজ গ্রুপের প্রতিবেদনের সুপারিশগুলি তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ও মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল সমাপ্তি ভাষণে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করে বলেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ভাবধারায় সমবায়ের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। সমবায়ের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় আবার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমবায়ের রূপ ও চরিত্র স্বতন্ত্র। বর্তমান পরিস্থিতেতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং প্রশাসক ব্যবস্থার মধ্যে তৃতীয় পন্থা হল সমবায়। তিনি বলেন যে সমবায় সমিতিগুলি স্বাবলম্বী ও সুপরিচালিত হোক বামফ্রন্ট সরকারের এই সুস্পষ্ট নীতি কিন্তু সমিতি পরিচালনায় দুর্ণীতি, অযোগ্যতা ও অনাচার দেখা দিলে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবেন।

গ্রুপগুলির যে সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

(১) সভ্যগণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার।

(২) সমিতিগুলিতে বেতনভুক ম্যানেজার নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৩) যাবতীয় ঋণ সমবায়ের মাধ্যমে প্রদান

(৪) শস্য বীমা প্রকল্প চালু করা

(৫) মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ ও আইনকে কাজে লাগানো।

(৬) সুদ অনুদান

(৭) সার্বজনীন সদস্যভুক্তি

(৮) স্বল্প সঞ্চয় অভিযান

(৯) ব্যাঙ্কিং শাখার প্রসার

(১০) লাক্ষা চাষে ঋণ দান

(১১) সদস্য পদের মেয়াদ বৃদ্ধি

(১২) কর্মকর্তাদের সম্মান দক্ষিণা

(১৩) সুদ আসল পরিশোধ সম্পর্কে

(১৪) ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করা

(১৫) মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি জেলার অনুকরণে সেচকুপ সহ পাম্পসেট যুগ্ম বা একক প্রকল্পে সরকারী অনুদান

(১৬) সমীক্ষার মাধ্যমে কোন মৌজায় কত পরিমাণ জমি সেচ কুপের সাহায্যে অর্থকরীভাবে চাষ করা সম্ভব তা নির্ধারণ

(১৭) নতুন পুকুর ইত্যাদিতে অনুদান

(১৮) ভূমি সংস্কার আইন এমনভাবে করা প্রয়োজন যাহাতে কৃষক তাহার সম্পূর্ণ কৃষি জমি একসঙ্গে বাসস্থানের নিকটে পায়

(১৯) গেহান প্রথা চালু করা

(২০) পাট্টা গ্রহীতাদের ঋণের ব্যবস্থা করা

(২১) ঋণের সদ্ব্যবহার তদারকি করা

(২২) প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগ করা

(২৩) অকৃষি ঋণ চালু করা

(২৪) এমপ্লয়িজ ক্রেডিটে মূলধনের অভাব দূর করা

(২৫) স্বল্প সংখ্যক কিস্তির বিধান সংশোধন করা ইত্যাদি, উপরোক্ত সুপারিশগুলি গ্রহণ করে ৮০ সালের পর নতুন রূপে সমবায়গুলি জেগে উঠে। সমিতিগুলিতে C.C.A. ম্যানেজার গঠন, বৃত্তি শিল্পীদের নিয়ে নতুন সমবায় স্থাপন ঋণ গ্রহণের সহজ পন্থা ও সঠিক সময়ে ঋণ শোধে পঃ বঙ্গ সরকারের সুদ ফেরত নীতি, রেশন, পশম, বেয়ন, বিড়ি শিল্পীদের সরকারী সাহায্য দান। মৎস্য চাষে প্রচুর সাবসিডি প্রদান ও IRDP স্কীমের নানান কাজ শুরু হয়। সমবায় সমিতিগুলি ধীরে ২ চাঙ্গা হতে শুরু করে।

১৯৮৬ সালের ১লা জুলাই বাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক পুরুলিয়া জেলাকে ৫ বছরের পাইলট প্রোজেক্টের অধীনে নিয়ে আসে। পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কোঃ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। সমবায় সমিতিগুলিতে FAN Programme, আমানত বিভাগ তথা মিনি ব্যাঙ্কিং শুরু হয়। কৃষি ঋণ আদায় ও প্রদান বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি সমিতির জন্য নির্দিষ্টভাবে Development Action Plan তৈরি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই জেলার সমবায় আন্দোলন নতুন রূপ পেতে শুরু করে।

সারণি

স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ (সমিতি)

ব্লক	আদায়যোগ্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ		পরিশোধের পরিমাণ		আদায়ের হার শতকরা	
	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭
পুরুলিয়া ১	২·৬৬	৩·১৬	১·৭২	১·৯০	৬৪·৮০	৬০·১০
পুরুলিয়া ২	৩·৪৭	৫·২৬	২·৩৮	৩·৬৩	৬৮·০৬	৭০.০০
জয়পুর	৩·৩৭	৪·১৭	২·৩৬	২·৭৫	৭০·০০	৬৬.০০
ঝালদা	২·৬১	২·৭৭	১·৬৯	২·০৪	৭৩.০০	৭৩·৬০
বাগমুণ্ডি	২·৪৮	২·৮৭	১·০৩	১·৬১	৪১·০৬	৫৬.০০
বলরামপুর	৮·৮৩	১৬·৬৩	৬·৬৩	১২·৪২	৭৫.০০	৭৪·৬০
বান্দোয়ান	২·০৮	৭·৯২	৪·১৫	৪·৯৩	৬৮·০৪	৬২·২০
বরাবাজার	৮·৯৪	১৬·৬৭	৬·৯১	১১·৮৮	৭৭·০৩	৭০·১০
পুঞ্চা	৬·২০	৭·০২	৪·৩০	৪·৮৭	৭৭·৩০	৬৯·৩০
হুড়া	৫·৫৩	৭·১২	১·১১	২·৫৯	২০·১০	৩৬·৩০
কাশীপুর	৭·৯৭	১১·১৫	৬·৭৮	৯·৭৬	৭৭.০০	৮৭·৫০
মানবাজার ২	২·৩৩	৪·৮২	·৭৪	২·৪২	৩১·০৮	৫০·২০
আড়ষা	৮·০৮	৭·৪৫	১·৫৭	২·৪২	১৯·০৩	৩২·৪০
সাতুড়ী/নিতুড়ী	০·৮৯	১·৬১	০·০৯	০·৩৭	২৪·০০	২৩.০০

মধ্যমেয়াদী ঋণ সমিতিগুলির আদায় সন্তোষজনক নয়। রবি চাষের জন্য ঋণ দান শুরু করে

সমবায় ব্যাঙ্ক, ১৯৮৬-৮৭ সালের পরিমাণ ২৬·১৪ লক্ষ টাকা। জল ও জলাভূমি সংরক্ষণে নতুন দিগন্ত শুরু হয়েছে নানান NGO ও সমবায় ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টায়, বাগিচা সজ্জি চাষ যা অর্থকরী অন্ততঃ চিরাচরিত ধান চাষের থেকে, ঔষধী গাছের সংরক্ষণ ও সংগ্রহ, পশুপালন, দুধ ও মাংসের জন্য। এক্ষেত্রে বলা দরকার যে সরকারী সহায়তায় নতুন ভাবে জেলাকে ২০টি ভাগে বিভক্ত করে ২০টি দুগ্ধ সমবায় গড়ে উঠেছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে একটি দুগ্ধ সমবায় গঠন হয়েছে, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে। এই সমবায়গুলি আগামী দিনে জেলার দুধের ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি সমবায়ে আন্দোলনে নতুন শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। জেলাতে কোল্ড স্টোরেজ বাস্তব রূপ পেতে চলেছে শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা (M.L.A.) ও শ্রী মণীন্দ্র গোপের (সহ সভাপতি CADC) নেতৃত্বে।

জেলার কোল্ডস্টোরেজের প্রয়োজনীয়তা অসীম। এই কারণে ১৯৮০ সালের পর জেলায় কোল্ড-স্টোরেজ সমবায় সমিতি গঠিত। বহু সমবায় সমিতি তাদের শেয়ার কিনে ওই সমবায়ের অংশীদার হন কিন্তু নানান কারণে কোল্ডস্টোরেজ গঠনে বিলম্ব হয় সম্প্রতি কোল্ডস্টোরেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে বান্দোয়ান এলাকায় টটকো নদীর সন্নিকটে একটি মিনি কোল্ডস্টোরেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়েছে (বান্দোয়ান LAMP)।

এক নজরে বর্তমান অবস্থা ঃ

পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ঃ— লক্ষ টাকায়

	কার্যকরী মূলধন	মোট জমা	মোট দাদন	লাভ	ক্ষতি
৩১।৩।১৯৯৮ -	২১৪০.৮৭	১৪৪৭.৬৫	৮৪২.৪২	+ ২.৫৫	×
৩১।৩।১৯৯৯ -	২৫৯১.০৩	১৭৯০.৬৯	১০৮৪.০৭	+ ৭.১১	×
৩১।৩।২০০০ -	৩০১৭.০৮	২১৪০.৩৫	১৪৯০.৬৮	×	– ১৬৪.৫৩
৩১।৩।২০০১ -	৩৩৬২.৭৫	২৪১৭.৬৬	১৬১৫.৯৩	×	– ৪০.৫৮
৩১।৩।২০০২ -	৪৮০৮.৭১	৩৯৩৯.৩৬	১৮১৭.০৯	+ ১৫.৭৮	×

সমবায় ব্যাঙ্কে নতুন বোর্ড গঠন হয়েছে ২৩শে জুন ২০০৩ থেকে। নতুন নেতৃত্বে সমবায় ব্যাঙ্ক আগামী দিনে পুরুলিয়া জেলায় সমবায়ের মধ্যে সমবায়, ফল সবজি সংরক্ষণ, ঔষধি গাছ উৎপাদন, দুগ্ধ, মৎস্য চাষ, যে যে ক্ষেত্রে এই জেলা অনেক পিছনে আছে সে সব ক্ষেত্রে উৎপাদনে গতি আনবে। সমবায় ব্যাঙ্কের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রী কাশীনাথ ব্যানার্জী ও ডিরেকটার শ্রী হারাধন ব্যানার্জী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সিং দেও ব্যক্তিগণ জেলার মহিলাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে ভাগ করে সমবায়ের মধ্যে সমবায় গঠনে সাহায্য করছেন। বহু পুরানো অনাদায়ী ঋণ আদায়ে নাবার্ড ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের নির্দেশানুযায়ী নানান পন্থা গ্রহণ করেছেন। ফলত আদায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। স্বয়ংম্ভর গোষ্ঠী সমবায় এলাকায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে আদায়ের হার প্রায় ৮৫ শতাংশ। কৃষি ঋণের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা। যার মধ্যে ২০০৩-২০০৪ সালে দশ হাজার কৃষককে কৃষিঋণ দাদন দেওয়া হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিলিতে কৃষকের ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বোর্ড কোঃ অপাঃ এগ্রিকালচার ও রুরাল ডেভঃ ব্যাঙ্ক লিঃ—

	সদস্য	কার্যকরী মূলধন	জমা	দাদন	লাভ	ক্ষতি
৩১।৩।১৯৯৮	২৫৪৮-	৫৬৪.৪৩	-১৮.৫৩	-১৮৯.৬৩	+ ১৪.৪৮	×
৩১।৩।১৯৯৯	২৬২৮-	৭৫৪.২৯	৫২.৯৭	২০৯.২৫	+ ২০.৫১	×
৩১।৩।২০০০	২৬৭০-	৯৭২.২০	১১৩.০০	২৬১.১১	+ ৩.৮৮	×
৩১।৩।২০০১	২৯৩৩-	১২১৪ ০৯	১৯২.৯৬	৩০০.১১	+ ৪২.৯২	×
৩১।৩।২০০২	৮৫৭৭-	১৩৩৯ ২৯	২৫৬.৭১	৩৪৮.৫৭	+ ১৭.০০	×

এই ব্যাঙ্ক ১৯৭০ সালের মে মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে মূলত Land Morgage ব্যাঙ্ক নামে, কলকাতায় হেড অফিস। ১৯৭০ সালে শ্রী সত্যনারায়ণ মিত্র বাঁকুড়ার পুরুলিয়া ইউনিটের চেয়ারম্যান হন। ১৯৭৭ সালে শ্রী ডমন কুইরী (M. L. A) চেয়ারম্যান হন পরে বাসুদেব খাওয়াস। ১৯৮৭-৮৮ সালে চেয়ারম্যান ছিলেন সত্যরঞ্জন মাহাত পর বছর ১৯৮৮-৮৯ থেকে চেয়ারম্যান হন শ্রী নিশিকান্ত মেহেতো। তার উদ্যোগে ব্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঙ্কে নিজ দ্বিতল বাড়িতে থেকে কাজকর্মের প্রচার গোটা জেলা জুড়ে শুরু করেছে। বর্তমানে প্রায় ১৭ কোটি টাকা মোট দাদন করেছে। বর্তমান নামকরণ ১৯৯০ সালে হযেছে। রঘুনাথ পুরের কয়লা শিল্পে ৬টি ইউনিট, ফ্রাই অ্যাসে ইট তৈরি ইত্যাদি নানান ছোটো বড়ো শিল্পে উদ্যোগ নিয়েছে এই ব্যাঙ্ক। পাশাপাশি কর্মচারীদের ও গ্রামীণ চাষীদের নিজস্ব বাড়ি তৈরির লোন দাদন শুরু করেছে।

পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট হোলসেল কন্‌জিউমারস কোঃ অপাঃ সোসাইটি লিঃ লক্ষ টাকায়

	কার্যকরী মূলধন	মোট ক্রয়	মোট বিক্রয়	+ লাভ	– ক্ষতি
৩১।৩।১৯৯৮	২০.৫৭	৮৪.৭৫	×	×	– ৬.১২
৩১।৩।১৯৯৯	N.A	১১৩.১৫	১২৭.২৪	+ ৩.৬৫	
৩১।৩।১৯৯৮	N.A	১৪৭.৩০	১৬৫.২৩	+ ৭.৫৬	
৩১।৩।১৯৯৮	N.A	৩০৬.৭৩	৩১৮.৮৪	+ ৮.৪১ (Tentative)	

পুরুলিয়া জেলা হোলসেল স্থাপন হয় ১৯৬৫ সালের ২০শে জানুয়ারী Regd No–47 (P) 1967. প্রথম চেয়ারম্যান হল শ্রী অশোক চৌধুরী নানান ঘাত প্রতিঘাত হোলসেল এক সময় পুরুলিয়া জেলার বুকে স্থান করে নিয়েছিল। বর্তমানে আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। শ্রী শিশির গুপ্ত চেয়ারম্যান থাকাকালীন জ্বালানী গ্যাসের লাইসেন্স পায়। এই গ্যাস সাপ্লাই করেই বর্তমানে মুনাফা ও অস্তিত্ব রক্ষা করছে। বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রী বিমল কুমার মহান্তি নতুনভাবে চেষ্টা করছেন।

জেলার বর্তমান ১১টি উইভার্স সোসাইটি কার্য্যকর আছে। তাদের সম্মিলিত মোট বিক্রয় ৬৩.৬১ লক্ষ টাকা ও ক্রয় ৩৯.৪১ লক্ষ টাকা। ৮টি সমিতি লাভে চলছে এবং ৩টি ক্ষতিতে চলছে।

পুরুলিয়া District কোঃ ইউনিয়ন 1956 সালে গঠিত হয়। প্রথম চেয়ারম্যান হন শ্রী অশোক চৌধুরী। অনেক পরে বাসুদেব হাওয়াস সহ অনেকে এক্ষেত্রে রামপদ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। রাজ্য কোঃ ইউনিয়ন থেকে নানান কর্মসূচী, আবৃত্তি, আলোচনা, প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা হয়। এদের মূল কাজ জনগণের মধ্যে সমবায়ের চিন্তা ও চেতনাকে বৃদ্ধি করা। অতীতে

জেলা কোঃ ইউনিয়ন পুরুলিয়া জেলাজুড়ে নানান কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহণ করত। সমবায় দিবস ৭দিন ধরে পালন করে। নতুন বছর এলেই রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন খুব সুন্দর ডাইরি প্রকাশ করে যাতে পশ্চিমবঙ্গের সমবায়ের ও সরকারী টেলিফোন, চিকিৎসা সংক্রান্ত, টেলিফোন নং ও ঠিকানা থাকে। প্রতি মাসে 'ভাণ্ডার' নামে ১টি বই প্রকাশ করে রাজ্য ইউনিয়ন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ— সর্ব্বশ্রী শিশির গুপ্ত
সর্ব্বশ্রী বিবেক সেন, ARCS/CEO PCCB LTD.

তথ্যসূত্র ঃ— ১। সমবায় আইন ও নিয়মাবলী-অসীম রায়
২। সমবায় কথা
৩। গেজেটিয়ার পুরুলিয়া (Calcutta 1985)

আমার পুরুলিয়া

হারাধন ব্যানার্জী

দীর্ঘ-আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর জন্ম নেয় আজকের পুরুলিয়া জেলা। এর আগে পুরুলিয়া জেলা ছিল বিহারের মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৩৩ সালের আগে মানভূম জেলা ছিল জঙ্গল মহল জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই জেলার স্বাধীনচেতা মানুষের সংগ্রামে ভীত ইংরেজ শাসককুল বার বার এই জেলাকে পরিবর্তন করেছে। জেলার সদর কার্যালয়েরও বার বার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ১৯৫৬ সালের আগে মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির জন্য এই জেলার মানুষ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার সমগ্র মানভূম জেলাকে এক না রেখে তিন টুকরো করেন। ২৪০৭ বর্গমাইল এলাকা, ১৬টি থানা নিয়ে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবাংলায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিভিন্ন বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই জেলার মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐতিহ্য দীর্ঘসময়ের। ব্রিটিশ শাসন বিরোধী চুয়াড় বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এই জেলায় সংগঠিত হয়। এই সব আন্দোলন ইংরেজ শাসককুলকে নাজেহাল করে ছাড়ে। ১৮৩৩-১৮৫৬ নানা স্থানে লড়াই, সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার আন্দোলনে এই জেলার মানুষের সংগ্রাম উল্লেখের দাবী রাখে। পরবর্তীকালে জেলাকে বঙ্গভুক্তির দাবীতে আন্দোলনও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এই জেলাতে আছেই।

নবগঠিত পুরুলিয়া জেলার পূর্ব দিকের কিছু অংশে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা। বাকী তিন দিকই পূর্বে বিহার বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর দিকে দামোদর নদী এবং তার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা। বিহারের ধানবাদ, হাজারিবাগ এবং বোকারো জেলা পুরুলিয়া জেলার উত্তর দিকে, দক্ষিণে বিহারের সিংভূম (পূর্ব ও পশ্চিম)। জেলা, পশ্চিমে রাঁচি ও হাজারীবাগ জেলার কিছু অংশ। মালভূমি এলাকায় অবস্থিত বলে এই জেলার মাটি অধিকাংশ স্থানেই উঁচু-নিচু। পাথুরে মাটি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাহাড়, উঁচু টিলা দেখতে পাওয়া যায়। জেলার আয়তন প্রায় ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার।

উত্তরদিক থেকে এই জেলায় প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাবে পঞ্চকোট পাহাড় বা পাঞ্চেৎ পাহাড় এবং পাঞ্চেৎ জলাধার। পাহাড় এবং জলাধার এলাকা দিয়ে এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

মনোরম। পাহাড়ের গায়ে পঞ্চকোট রাজাদের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পাহাড়, নদী, জলাধার নিয়ে এই এলাকায় একটি সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। এর পর রঘুনাথপুর শহর। রঘুনাথপুর শহরকে ঘিরেও আরেকটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। রঘুনাথপুর থেকে ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জয়চণ্ডী পাহাড়। তিনটি টিলা নিয়ে এই পাহাড়। এই পাহাড়ের উপরে একটি মন্দির ও একটি যাচান আছে। পাহাড়ের সংলগ্ন জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন। পাহাড়টির উচ্চতা প্রায় ৩১৮·৫১ মিটার। কাশীপুর রাজাদের আমলে এটি ফাঁসি পাহাড় নামে খ্যাত ছিল।

রঘুনাথপুর শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কাশীপুর। সেখানে রাজবাড়ি এখনও বর্তমান, সেটিও একটি দর্শনীয় স্থান। আশেপাশে আছে বেফো ড্যাম, বেড়ো পাহাড় প্রভৃতি। আদ্রা রেল স্টেশনও রঘুনাথপুরের কাছাকাছি। রঘুনাথপুর থেকে কিছু দূরেই অবস্থিত তেলকুপি। যেখানে পুরানো দিনের মন্দির এবং মূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

জেলার পূর্বদিকে অবস্থিত মানবাজার। মানবাজার একসময় মানভূম জেলার সদর শহর ছিল। মানবাজার থেকে ১০ কিমি. দূরে অবস্থিত হরিণ উদ্যান (ডিয়ার পার্ক) এবং তার পাশেই মুকুট মণিপুর ড্যাম। পর্যটনের জন্য উপযুক্ত। কিছুদিন আগে এর পাশেই দোলাডাঙ্গায় বেড়ানোর একটি ভালো জায়গা তৈরি হয়েছে। মানবাজার থেকে পুঞ্চার রাস্তায় পাকবিড়রা এবং বুদপুর। এই দুটি জায়গাতেই জৈন মন্দির এবং মূর্তি পাওয়া যায়। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে জায়গাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মানবাজার থেকে বান্দোয়ান যাওয়ার পথে পড়ে মানবাজার ২নং ব্লক। চারদিকে উঁচু উঁচু টিলা এবং জঙ্গল প্রাকৃতিক পরিবেশকে মনোরম রূপ দেয়। বান্দোয়ান থেকে কিছু পথ গেলেই কুইলাপাল যেখানে নদীর উপর ব্রীজ তৎসংলগ্ন পার্ক পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কুইলাপালের ঘন জঙ্গল দর্শনীয় স্থান।

বান্দোয়ান থেকেই যাওয়া যায় কুচিয়া হয়ে দুয়ারশিনি। নদী, পাহাড়, জঙ্গল মিলে প্রাকৃতিক পরিবেশ অপূর্ব সুন্দর।

বলরামপুর থেকে বেশি দূর নয়। উরমা স্টেশনের কাছাকাছি সি. এ. ডি. সি-র উদ্যোগে গড়ে উঠেছে কুমারী কানন। এই জায়গাটি গড়ে উঠে পর্যটনের জায়গা হিসাবে। বলরামপুরের বাঘমুণ্ডি যাওয়ার পথে রাস্তার দুধারে জঙ্গল। শাল সহ বিভিন্ন গাছে ভরপুর এই জঙ্গল, রাস্তায় মাঠাবুরু পাহাড়। সেখানে জঙ্গল আরো ঘন। প্রকৃতি এখানে যেন সমস্ত সৌন্দর্যকে উজাড় করে দিয়েছে।

বাঘমুণ্ডি ঢোকার আগে অযোধ্যা মোড় দিয়ে রাস্তা চলে গেছে অযোধ্য পাহাড়ের দিকে। এখানে তৈরি হচ্ছে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প। অযোধ্যা যাওয়ার পথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোরম। রাস্তায় পড়ে দুটি জলপ্রপাত টুরগা এবং বামনি। উপর থেকে ঝরনাকে দেখা, নীচে পাহাড় এবং বনানীর সৌন্দর্য যে কোনো মানুষকে আনন্দে মাতিয়ে তুলবে। অযোধ্যা পাহাড় জেলার আড়ষা, ঝালদা ২নং, বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর এই চারটি ব্লক দ্বারা বেষ্টিত এবং এর আয়তন প্রায় ৩২০ বর্গ কিমি.। অযোধ্যা পাহাড় এলাকায় প্রায় ৭০টি ছোট বড় বসতি আছে। এখানে বন ও পর্যটন বিভাগের আবাস, কটেজ, C. A. D. C.-র লজ প্রভৃতি অধুনা তৈরি হয়েছে। চা-বাগানও আছে অযোধ্যা পাহাড়ে। নানারকমের গাছ, পাখি, ফুলে ভরা অযোধ্যা পাহাড়। এই পাহাড়ের বিশেষত্ব এর উপরের অংশ পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য অংশের মতো। পাহাড়ের উপরে উঠে মনে হয়না যে পাহাড়ের ওপরে আছে।

এবারে আসা যাক ঝালদা শহরে। এক সময় গালাশিল্প ও বিড়িশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখনও

পুরানো গালা কুঠিগুলি দেখতে পাওয়া যায়। ঝালদা শহরের আশেপাশে অনেকগুলি পাহাড় আছে। কপিল পাহাড়, জাবড় পাহাড় উল্লেখযোগ্য। আরো পশ্চিমে গেলে তুলিন এবং তার পাশে সুবর্ণরেখা নদী যা পুরুলিয়া জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করে দেয়। জাবড় পাহাড়ের কাছেই কাসাই বা কংসাবতী নদীর উৎপত্তিস্থল। ঝালদা শহর থেকে কিছুদূরেই সুরগুমা ড্যাম। ঝালদা শহরের আশেপাশে পাহাড়, ড্যামগুলি ভ্রমনেচ্ছু মানুষদের আনন্দবন্ধন করবে।

পুরুলিয়া শহর পুরুলিয়া জেলার সদর শহর। এখানের সাহেব বাঁধ উল্লেখের দাবী রাখে। সাহেব বাঁধের একটি দ্বীপের উপর গড়ে উঠেছে সুন্দর সুভাষ উদ্যান। সাহেব বাঁধের পাহাড়েই অবস্থিত বিজ্ঞান কেন্দ্র, হরিপদ সাহিত্য মন্দির ও সংগ্রহশালা, রবীন্দ্র ভবন। দেশবন্ধু রোডের উপর অবস্থিত জেলার একমাত্র মহিলা মহাবিদ্যালয় নিস্তারিণী কলেজ। এছাড়াও পুরুলিয়া শহরে জেলাস্কুল, মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন পুরানো বিদ্যালয়।

এই জেলার হুড়া থানার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে অবস্থিত রাকাব জঙ্গল। বনানীর অপরূপ শোভা এখানে বিরাজমান। শাল, মহুয়া, পলাশে ভরে আছে এই জঙ্গল এলাকা।

গোটা পুরুলিয়া জেলা জুড়েই এইভাবে অনেকগুলি দর্শনীয় জায়গা আছে। পুরুলিয়া শহর, রঘুনাথপুর মানবাজার, বন্দোয়ান, অযোধ্যা, ঝালদা প্রভৃতি জায়গায় সঠিকভাবে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে আগামীদিনে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের আকর্ষণ করতে পারবে এই জেলা।

পুরুলিয়া জেলা নানাবিধ খনিজ সম্পদে ভরপুর। নিতুরিয়া ব্লকের পারবেলিয়া, ধুবেশ্বরী, ভাসুরিয়া, রাণীপুর প্রভৃতি এলাকাতে কয়লা আছে। ঝালদার পাহাড়ের এলাকাতেও আছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ। চুনাপাথর, ডলোমাইট, গ্রানাইট, রকফসফেট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এই জেলায় পাওয়া যায়। উন্নত মানের অভ্র, চায়নাক্লে পাওয়া যায় কোনো কোনো এলাকায়। মানবাজার ২নং ব্লকে টটকো নদীতে বালির সাথে সোনাও পাওয়া যায়। তামার সন্ধান পাওয়া গেছে মান বাজারের কোনো কোনো এলাকায়।

পুরুলিয়া জেলার সান্তালডিতে আছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, অযোধ্যায় গড়ে উঠেছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই জেলার গালা শিল্প যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, রঘুনাথপুরের তসর শিল্প বিখ্যাত। বেশ কয়েক হাজার মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ঝালদা, পুরুলিয়া, জয়পুর প্রভৃতি এলাকায় আগর তৈরি হয়। বান্দোয়ান এলাকায় অনেক মানুষ যুক্ত বাবুই শিল্পের সাথে। বাঘমুণ্ডির চড়িদা এলাকায় তৈরি হয় ছৌনাচের মুখোশ।

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই জেলার অবদান উল্লেখযোগ্য। ছৌনাচ, ঝুমুর গান, টুসু গান, ভাদু গান এই জেলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শাল, পলাশ মহুয়ার এই জেলায় লোকনৃত্য এবং লোকসংগীতের অপরূপ সমাহার।

বাংলার পৌষ মাসে এই জেলার গ্রামে, গ্রামান্তরে শোনা যায় টুসুগান। বিভিন্ন বাজারগুলিতেও বাজে টুসুগানের ক্যাসেট। টুসু গান পুরুলিয়া জেলার লোকসংগীতের ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ।

ঝুমুর গানের সুরও মাতাল করে দেয়। ভবপ্রীতানন্দ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের কুচিল মুখার্জী, কৃত্তিবাস কর্মকার সহ অসংখ্য ঝুমুর গান রচয়িতা এবং গাইয়ে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

ভাদ্রমাসে গাওয়া হয় ভাদুগান, ভাদ্রমাসের একাদশী তিথিতে পালিত হয় করম উৎসব। ছৌনাচ পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাটির তৈরি মুখোশ পরে এই নাচে অংশগ্রহণ করেন শিল্পীরা। আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যগুলি থেকে নেওয়া গল্প থেকে তৈরি হয় পালা।

অঙ্গভঙ্গী করে শিল্পীরা গল্পটিকে সুন্দরভাবে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করেন। গম্ভীর সিং মুড়া, ডি. সি. মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাত প্রভৃতি ছৌনাচে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। পুরুলিয়া জেলার অনেকগুলি ছৌনাচের দল বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের নাচের প্রদর্শনী করে যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছেন।

ঝুমুর নাচ ও একটি উল্লেখযোগ্য নাচ। ঝুমুর গানের সঙ্গে হয় এই নাচ। সিন্ধুবালা দেবী এই নৃত্যের একজন খ্যাত শিল্পী। এছাড়াও যে নাচগুলি উল্লেখের দাবী রাখে সেগুলি করম নাচ, কাঁঠি নাচ, বাঁধনা নাচ, পাইক নাচ, ঘোড়া নাচ, দাঁড় নাচ, নাটুয়া নাচ প্রভৃতি। সাঁওতাল সম্প্রদায়েরও বিভিন্ন নাচ দর্শকদের আনন্দ দেয়।

একদিকে ধামসা, মাদোল প্রভৃতি যন্ত্রের বাজনার তালেতালে নাচ, অপর দিকে ঝুমুর, টুসু, ভাদু প্রভৃতি গানে পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতির ধারা এখনও প্রবহমান।

এই জেলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছু পিছিয়ে। যদিও আসানসোল, দুর্গাপুর, জামশেদপুর, রাঁচি, ধানবাদ প্রভৃতি শিল্প ও খনি এলাকার শহরগুলি এই জেলা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। জেলার বনজ-সম্পদের প্রাচুর্য, মাটির নিচে আছে খনিজ সম্পদের সম্ভার। পর্যটনের ক্ষেত্রে একটু পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হলে জেলায় অনেকগুলি পর্যটন কেন্দ্রও গড়ে উঠতে পারে। আছে শক্ত সবল দৃঢ়চেতা জনসম্পদ। এই সমস্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার পুরুলিয়া জেলাকেও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক মানচিত্রে স্থান করে দিতে পারে।

শিল্প : পর্যটন : নদনদী : জলাধার

একনজরে সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

কল্যাণ ঘোষ

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা-গোমো সেকশনে সাঁওতালডি রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গেব পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত।

ভারত কোকিং কোল লিমিটেডেব ভোজুডি কোল ওয়াসারি এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রেব অতি নিকটে অবস্থিত।

পঃবঃ বাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই বিদ্যুৎকেন্দ্রব জন্য নিম্নবর্ণিত জমি অধিগ্রহণ করেছেন:

উপনগরী	➛	৩৫০ একর
কারখানা	➛	৮০০ একব
ছাই বাঁধ	➛	১০০ একর

বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৪টি ইউনিটের সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮০ মেগাওয়াট (৪ ১২০)। এই ইউনিটগুলির নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী উৎপাদনকার্য শুরু হয়েছে।

১ নং ইউনিট	➛	০১।০১।১৯৭৪
২নং ইউনিট	➛	১৬।০৭।১৯৭৫
৩নং ইউনিট	➛	০৬।১২।১৯৭৮
৪নং ইউনিট	➛	৩০।০৩।১৯৮১

৩১।৫।২০০৩ সাল পর্যন্ত ১নং ইউনিটটি ১৬১৭৮২ ঘঃ ৩৯মিঃ চলেছে। এইরূপ ভাবে ২ নং ৩নং ৪নং ইউনিটগুলো যথাক্রমে ৮৬,৪৮৪ ঘঃ ৪৫মিঃ, ১২১, ১৩২ ঘঃ ৩০মিঃ ও ১০৫৩৬২ ঘঃ ৫০ মিঃ অবধি চলেছে। ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ৩১।০৫।২০০৩ পর্যন্ত এই উৎপাদন কেন্দ্রর প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর দেখানো হল।

১৯৮৪-১৯৮৫	২৪.৭০
১৯৮৫-১৯৮৬	২৮.৫০
১৯৮৬-১৯৮৭	২০.০০
১৯৮৭-১৯৮৮	২৭.৬০
১৯৮৮-১৯৮৯	১৫.৯০
১৯৮৯-১৯৯০	১৯.৯০

১৯৯০-১৯৯১	২১.৬৭
১৯৯১-১৯৯২	১৬.৩০
১৯৯২-১৯৯৩	৩৫.৫৪
১৯৯৩-১৯৯৪	৩১.৮২
১৯৯৪-১৯৯৫	৩১.৩৩
১৯৯৫-১৯৯৬	৩১.৮০
১৯৯৬-১৯৯৭	২৯.৬১
১৯৯৭-১৯৯৮	৩৩.৮২
১৯৯৮-১৯৯৯	৩৫.০২
১৯৯৯-২০০০	৩২.০২
২০০০-২০০১	২৫.০৪
২০০১-২০০২	২৬.০৮
২০০২-২০০৩	৩১.০৬
২০০৩-২০০৪	২৮.৫২

(30.6.2003 পর্যন্ত)

এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৯২-৯৩ সালে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করেছে— ১.৪৯৩ মেগা ইউনিট। ওই আর্থিক বছরেই সবচেয়ে বেশি পি এল এফ অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, শতকরা হিসাবে ৩৫.৫৪। ওই একই বৎসরে সহায়ক বিদ্যুৎ প্রয়োজন ছিল। সর্বনিম্ন ১০.৯৩% যা সর্বকালীন রেকর্ড।

সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৯২-১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে নীচে বর্ণিত কারণগুলির জন্য উৎকর্ষতা ভিত্তিক/উৎপাদন ভিত্তিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

১। বেশি উৎপাদন।

২। উৎপাদনের জন্য অন্য খাতে যা খরচ হওয়ার দরকার তার থেকে কম খরচ হয়েছে।

৩। নির্দিষ্ট জ্বালানি এবং তেল যা খরচ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তার থেকে কম খরচ হয়েছে। তখন থেকেই নিয়মিত ভাবে সাঃ তাঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্দিষ্ট জ্বালানি এবং তেল যা খরচ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তার থেকে কম খরচ করার জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে উৎকর্ষতা ভিত্তিক/উৎপাদন ভিত্তিক পুরস্কার পেয়ে আসেছে। এ.সি.সি. ব্যাব্‌কক সংস্থা, দুর্গাপুর সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪টি ইউনিটের বাষ্প উৎপাদনের যন্ত্র এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্র সরবরাহ, নির্মাণ এবং কার্যভার এস টি পি এস কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করেছিল। ভেল কর্তৃপক্ষ টার্বো জেনারেটর এবং তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র তৈরি, সরবরাহ এবং নির্মাণ করেছিল। এলিকন ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা চারটি ইউনিটের জন্য কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট তৈরি, সরবরাহ এবং নির্মাণ করেছিল। পাহাড়পুর কুলিং টাওয়ার সংস্থা কুলিং টাওয়ার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও নির্মাণ করেছিল। উপরিউক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেনারেশন এবং পি এল এফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যে মানের হওয়া উচিত ছিল তা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কারণে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু ঘটনা হল এই পাওয়ার স্টেশনটি যখন সাধারণ ধারণায় নির্মিত হয়েছিল, তখন বিভিন্ন ভেতরের

যন্ত্রাংশের প্রতিবন্ধকতার জন্য আদর্শগত মানের অপারেশন করা সম্ভবপর হয়নি যেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে পুরোপুরি সংশোধন করা যায়নি। মেকানিক্যাল ডাস্ট কালেকটর এবং ই এস পি মেসার্স 'ভোল্টাস' কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্মিত এবং স্থাপিত হয়েছিল। এই মর্মে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৩ এবং ৪ নং ইউনিট দুটির সঙ্গে ই.এস.পি. তৈরি করা হয়েছিল। অন্যদিকে ১ এবং ২ নং ইউনিটদুটির সঙ্গে শুধুমাত্র এম ডি সি গঠন করা হয়েছিল। সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভোল্টাস কর্তৃপক্ষের সাহায্যে ১নং ইউনিটের ই এস পি ১৯৯১ সালে তৈরি করেছিল।

কিন্তু নির্গমনের মাপ ছিল ২২০০ mm^3 কারণ ই এস পি-গুলি হচ্ছে স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম দিকের যন্ত্রপাতি। বর্তমান পরিস্থিতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধোঁয়া নির্গত হওয়ার চিমনিগুলি সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা এবং কার্যভার অর্পণ তার সঙ্গে ছাইয়ের কাজের প্রণালী সম্পাদন করার জন্য পি.এফ.সি-র বিনিয়োগের মাধ্যমে আর. এন্ড এম. প্রকল্পে অ্যালস্টম সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। ২নং ইউনিটের ই.এস.পি. এবং এ.এইচ.পি-র কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু ছাই বেরিয়ে যাওয়ার প্রণালীর অসুবিধার জন্য সেটি স্থায়ীভাবে চালানো সম্ভবপর হয়নি। এ.বি.বি সংস্থাকে উক্ত কাজটি দ্রুত সংশোধন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং ১নং ইউনিটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ই.এস.পি. এবং এ.এইচ.এস-র সঙ্গে সংযোগ করার জন্য। কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। ১নং ইউনিটের ছাই বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। যদিও বর্তমান ১ এবং ২নং ইউনিটের চিমনি দিয়ে নির্গত ছাইয়ের মাপ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের নির্ধারিত আওতার মধ্যে আছে। গত ৪.৮.২০০০ তারিখে বীভৎস আগুন লাগার জন্য ১ এবং ২নং ইউনিটদুটি বন্ধ রাখা হয়েছিল। আগুন লাগার পর ২০০১ সালের মার্চ এবং জুলাই মাসে যথাক্রমে ২ এবং ১ নং ইউনিটের পুনরায় কাজ শুরু হয়েছিল। ছাই নির্গত প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলির সমাধান করার পর ১ এবং ২নং ইউনিটদুটি পাওয়ার গ্রিডের সহিত সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। ২নং ইউনিটের ছাই নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াটি এখনো পর্যন্ত স্থায়ীভাবে সমাধান করা যায়নি।

নতুন ছাই সম্পাদন করার প্রক্রিয়ার সাথে শুকনো ছাই নির্গমন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত কাজটি সম্পাদন করার জন্য ২০০১-২০০২ সালে ছাই সংগ্রহ ও নির্গমন কাজের জন্য আনুমানিক ৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।

সি.ই.এ. অনুসারে (২০০৩ - ২০০৪)

১। সাওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনের লক্ষ্য রাখা হয়েছিল	১৫০০ মেগা ইউনিট
২। উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচের মাত্রা	১৩%
৩। তেল খরচ হওয়ার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল	২৫ml/kwh

৩০-৬-২০০৩ পর্যন্ত সাঃতাঃ বিঃ কেন্দ্র নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেছে।

১। মোট উৎপাদন	২৯৯.০১২ মেগা ইউনিট
২। উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ হওয়ার মাত্রা	১৫.০৭
৩। তেল খরচ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য।	২.৯৬

প্রশাসনিক, কর্মীবৃন্দ এবং কল্যাণ

সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত কোণে অবস্থিত। জায়গাটি ঝাড়খণ্ডের এলাকার সীমানায়। বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য পঃ বঃ রাঃ বিদ্যুৎ পর্ষদ, পঃ বঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম নানারকম কল্যাণমূলক কাজ করেছেন।

যেমন, শিক্ষাকর্মীদের আমোদ-প্রমোদ-এর সুবিধা, সস্তায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিজস্ব রেস্তোরাঁ, পুরীতে ছুটি কাটানোর জায়গা, বাজারের সুবিধা, চিকিৎসার সুবিধা এবং সৌন্দর্যপূর্ণ বনভূমি তৈরি করা।

এই এলাকার মধ্যে বিদ্যায়গুলির মান অনেক উন্নত। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যা নিম্নে দেওয়া হল।

	সাঃতাঃ প্রঃ উঃ বিদ্যালয় মাঃ মান	সাঃতাঃ বিঃকেঃ উচ্চ বালিকাবিদ্যালয় মাঃ মান	সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্সঃ
কতজন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল	৯২	৬৮	০২
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ	২৯	১৫	০১
২য় বিভাগে উত্তীর্ণ	৩৩	৩৬	০১
৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ	০৫	০৭	
কম্পার্টমেন্টাল	১০	০৯	
অকৃতকার্য	১৫	০৪	
কতজন ছাত্র স্টার মার্ক পেয়েছিল	১০	০৪	

সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্সটিটিউট বর্তমানে পঃবঃ মাধ্যমিক পর্ষদের কাছ থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছে। ২০০২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যালয়ের প্রথম দলটি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষাভাষী মানুষ এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করছে, তাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ১টি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি জুনিয়ার হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক স্তরের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য এখানে একটি বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছোট্ট শিশুদের বাংলায় শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় আছে, যার নাম শিশুভারতী।

ক্যান্টিন

বিদ্যুৎশিল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দের সস্তায় খাবারের ব্যবস্থার জন্য, কর্মীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতিকে দেওয়া হয়েছে।

ক্লাব

সাঃতাঃ বিঃকেন্দ্র কর্মী প্রমোদ সংস্থা এবং অফিসার্স প্রমোদ সংস্থা উভয়েই বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক এবং আমোদ-প্রমোদ-এর অনুষ্ঠান শুধুমাত্র তাপবিদ্যুৎ উপনগরীর কর্মীদের জন্যই করেন না পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের জন্যও অনুষ্ঠান সম্পাদান করেন। পঃবঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, পঃবঃ রাঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এই প্রমোদসংস্থাগুলিকে অনুরূপ সাহায্যের জন্য এবং বিশেষভাবে অনুদান প্রদান করেন। উক্ত দুটি প্রমোদসংস্থার কর্মসূচিগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

সাঃতাঃ বিদ্যুৎকেন্দ্র কর্মী প্রমোদ সংস্থা

প্রমোদসংস্থা অতি সাফল্যের সঙ্গে পঃবঃ রাঃ বিঃ পর্ষদ-এর বাৎসরিক ইন্‌ডোর মিট ২০০০-২০০১ পরিচালনা করেছিল। এছাড়া আলাদা যে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিল। যেমন, ৫(পাঁচ) দিন যাবৎ জুনিয়ার পিসি সরকারের জাদু প্রদর্শন হয়েছিল, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা, বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিয়োগিতা, বিভাগীয় নাটক প্রতিযোগিতা, সারা বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা এবং প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিদায় সম্বর্ধনা প্রভৃতি সম্পাদন করা হয়। সাঃতাঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অফিসার্স ক্লাব কলকাতা এবং বোম্বের প্রখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান করেছিল। এছাড়া বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, বিজয়া সম্মিলনী উৎসব, ইত্যাদি উক্ত সংস্থার সদস্যদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুতীর্থ

উপনগরীর কর্মীদের ছেলেমেয়েদের শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের জন্য শিশুতীর্থ সংস্থাকে একান্ত এবং আন্তরিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে। শিশুমেলা প্রতি বৎসর জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিপালিত হয় যা শুধু উপনগরী নয় আশেপাশের গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আকর্ষণ করে।

ছুটিতে বেড়ানোর জায়গা

দুটি কক্ষসহ পুরীতে ছুটি কাটানোর জায়গা করা হয়েছে, সেখানে সাধারণ ভাড়ায় নিজস্বভাবে রান্না করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সাঃতাঃ বিঃকেন্দ্র কর্মী প্রমোদ সংস্থা উক্ত ছুটি কাটানোর জায়গাটি পরিচালনা করে। বাজার সুপার মার্কেট টি বোর্ড কর্তৃপক্ষ উন্নতি বিধান করেছে, যা এখন দেখার মতো জায়গায় পরিণত হয়েছে, বিশেষত কর্মী সমবায় সমিতি সংস্থার বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করার জন্য। সাঁওতালডি কর্মী সমবায় সমিতি কো অপারেটিভ কর্তৃপক্ষ পাবলিক কল বুথ, জেরক্স সেন্টার, কমপিউটার এডুকেশন সেন্টার, দ্বিচক্রযান কেনার ব্যবস্থা ছাড়াও রেশন দোকান, মুদিখানা, কাপড় দোকান, গৃহস্থালি দ্রব্যাদি এবং ইন্ডেন গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা করেছে, যা শুধু সাঁওতালডি থার্মল প্ল্যান্টের উপনগরীর অধিবাসীদের জন্যই নয় আশেপাশের অধিবাসীদের যেমন আদ্রা, পাড়া, দুবড়া, রঘুনাথপুর, চেলিয়ামা ইত্যাদি জায়গায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এই সমিতি চার চাকার গাড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এবং আশেপাশের জায়গার ভ্রমণের জন্য বেশি আসনবিশিষ্ট মোটরগাড়ি ক্রয় করেছে এবং কর্মচারীদের বদলির সময় মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য মিনি ট্রাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরিবেশের উন্নতি এবং সৌন্দর্য বিধান, উপনগরীর সৌন্দর্য বিধান এবং বনসৃজন প্রকল্প আগেই আরম্ভ করা হয়েছে। উপনগরীর এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কিছু জায়গায় শীতকালে ফুলের বাগান তৈরি করে সৌন্দর্য বিধান করা হয়। সাঁওতালডি প্ল্যান্ট, উপনগরীতে ও আশেপাশে প্রতি বছর বনসৃজন প্রকল্প গৃহীত হয়। ফলে সমগ্র জায়গাটি সবুজ বনানীতে পরিণত হয়েছে।

হাসপাতালে এক্সরে, ই.সি.জি এবং প্যাথলজিক্যাল (রোগ নির্ণায়ক) বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মেডিক্যাল সুপারিন্টেডেন্টের পরিচালনায় ১০(দশ) জন ডাক্তার নিরলস দিবারাত্র কর্মে নিযুক্ত আছে। অসুস্থ রোগীদের প্রয়োজনার্থে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় স্থানান্তিরত করার জন্য দুটি

অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সহায়তায় সাঁওতালডি হাসপাতালে চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিল্প সংক্রান্ত সম্পর্ক

পরিচালকবর্গ সর্বদা বিশ্বাস করে যে, যদি কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় তবে তা ইউনিয়নগত এবং সহযোগী সঙ্গী হিসাবমতো বিনিময় করে সমস্যার সমাধান করা যায়। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি ওয়াশারি থেকে প্রত্যক্ষভাবে কয়লা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বিশেষত ভোজুডি কোল ওয়াশারি সংস্থা হতে। সেইমতো কয়লার রেলের বগিগুলি জড়ো করার জায়গা তৈরি করা হয়। যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৪০ ভাগ কয়লার ব্যবস্থা করা যায়। প্রযুক্তিগত কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ওয়াশারি কয়লাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার না করতে পারার জন্য কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টে স্থায়ীভাবে সমস্যা রয়ে গেছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি খরাপ্রবণ এলাকার মধ্যে অবস্থিত। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৮ কিমি দূরবর্তী দামোদর নদী থেকে জল আনা হয়। ইনটেকের জল সরবরাহ মূলত দামোদর নদের উপরিভাগের তেনুঘাট বাঁধের নির্গত জলের উপর নির্ভরশীল।

এই কারণে জলের সরবরাহ ব্যবস্থা এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে গভীর সমস্যাসঙ্কুলে। সম্প্রতি পঃবঃ বিঃ উঃ নিঃ তাই জল সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণ না পাওয়ার জন্য পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া জেলার সন্নিকটে বকবাড়ি নামক জায়গায় নতুন ইনটেক পয়েন্ট তৈরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যার ফলে জল সংক্রান্ত যে সমস্যা বর্তমান আছে সেগুলি আশা করা যায় দূরীভূত হবে। প্রয়োজনীয় কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে।

সাঁওতালডি নতুন এক্সটেনশন ইউনিট

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালডিতে ৫ম এক্সটেনশন ইউনিট (২৫০ x ১ = ২৫০ মেগাওয়াট) নির্মাণ করার পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমকে দিয়েছে এবং সাঁওতালডি ৫ম ইউনিটের জন্য বিভিন্ন ছাড়পত্র ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আশা করা যায় এই প্রকল্পটি দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সমর্থ হবে।

পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট

রমেন্দ্রনাথ কর

প্রেক্ষাপট: বর্তমান সভ্যতায় জল আলো বাতাসের মত বিদ্যুৎ এক আবশ্যিক শক্তি যা না হলে আমরা এক বিন্দু এগোতে পারি না। আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই আদিম যুগে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসাব প্রাণকেন্দ্র কোলকাতা থেকে। গ্রামের প্রত্যন্ত জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। গ্রামের স্কুলে, ব্লক অফিসে, ভূমি রাজস্বের অফিসে সব জায়গায় অধিকাংশ কাজই হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে যেখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন রয়েছে। কোল্ড স্টোরেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুতের ব্যবহার প্রতিনিয়ত।

এই রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি হচ্ছে (১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (২) পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উৎপাদন করপোরেশন (৩) দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড (৪) ডিসেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কবপোরেশন (৫) কোলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোবেশন। এছাড়া পুরোপুরি এই রাজ্যের জন্য না হলেও আমরা ন্যাশনাল থারমল পাওয়ার করপোরেশন ও দামোদর ভ্যালী করপোরেশন থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে থাকি।

এই উৎপাদিত বিদ্যুত যা আমাদের রাজ্যকে জীবন ধারণ করতে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তার সিংহ ভাগই আসে তাপ বিদ্যুৎ থেকে। এ রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে জলবিদ্যুতের পরিমাণ খুবই কম। সুস্থ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুতের অনুপাত যেখানে হওয়া দরকার ৬০:৪০ সেখানে বর্তমানে তা হচ্ছে ৯৭:৩। শুধু এ রাজ্যে নয় সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে। যেখানে বিভিন্ন পাহাড়ী নদী ও ঝরনার জলরাশি থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলবিদ্যুত হতে পারে। সেই উত্তর পূর্ব ভারতে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুতের পরিমাণ ৮৪:১৬। এর ফলে যখন রাত্রিবেলায় বিশেষতঃ রাত দশটার পর থেকে বিদ্যুতের চাহিদা কমতে থাকে তখন অতিরিক্ত বিদ্যুত আমাদের নষ্ট করে ফেলতে হয়। কোনোভাবে কাজে না লাগিয়ে।

বিদ্যুত সঞ্চালনের জন্য দেশে যে ব্যবস্থা আছে তাকে ঠিক মত চালাতে হলে যখন বিদ্যুতের চাহিদা সবচেয়ে বেশী (Peak Demand) তখন অনেক সময় আমরা উৎপাদিত বিদ্যুতের চেয়ে বেশী বিদ্যুত সরবরাহ করার চেষ্টা করি, এর ফলে (১) বিদ্যুতের গুণগত মান কমে যায়। ফলে কম্পনাংক (Under Frequency) কমে যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতি যা কারখানায়, রেলগাড়ির ইঞ্জিনে এবং হাসপাতালে নিত্য প্রয়োজন সেগুলি অচল হয়ে পড়ে।

(২) উৎপাদন যন্ত্রগুলি ক্ষমতার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বাধ্য হওয়ায় তাদের উপর চাপ পড়ে ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেড়ে যায়।

(৩) সঞ্চালন ব্যবস্থার ওপর চাপের তারতম্য হওয়ার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

(৪) সবচেয়ে বড় অসুবিধা তাপ বিদ্যুতের ইউনিট গুলি ইচ্ছেমত বন্ধ করে দেওয়া যায় না। যেটা জল বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সহজেই বন্ধ ও চালু করা যায়।

উপরের সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় একমাত্র পাম্প স্টোরেজ প্রকল্পের মাধ্যমে যা প্রয়োজনের সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং প্রয়োজন মত উদ্‌বৃত্ত বিদ্যুৎ টেনে নিয়ে সদ্‌ব্যবহার করে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে, যে শক্তি কাজে লাগিয়ে আবার বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। পাম্প স্টোরেজ করবার আর কয়েকটি সুবিধা হলো :-

(১) সামান্য কয়েক বর্গ কিলোমিটার জলাধারের জলে ডুবে থাকা ছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ বিঘ্নিত করবার প্রয়োজন হয় না।

(২) পরিবেশকে অনুকূল রাখে। কোনো ভাবেই দূষণ ছড়ায় না।

(৩) কোনো জনপদের লোকেদের অন্য জায়গায় সরিয়ে দেবার দরকার হয় না।

(৪) তেল বা কয়লার মত জ্বালানি খরচ নেই।

(৫) চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় লোক সংখ্যা খুবই কম লাগে।

(৬) পাম্প স্টোরেজের বড় উপকার এই যে বিদ্যুতের গুণগত মান উন্নত করা এবং কম্পনাংক নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখা।

(৭) পি. এল. এফ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিটগুলি।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রচেষ্টা

এই ভাবনা মাথায় রেখে পুরুলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে একটি পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প গড়ে তোলবার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে প্রয়োজনের সময় ৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। আবার অন্য সময় উদ্বৃত্ত বিদ্যুতকে কাজে লাগিয়ে জল নিম্ন জলাধার থেকে উপরের জলাধারে তুলে শক্তি সঞ্চয় করে রাখা যাবে।

১৯৭৮ সালে পর্ষদের সার্ভে ও ইনভেষ্টিগেশনের ইঞ্জিনিয়াররা এই প্রকল্পের প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করেন। তারপর কোন কোন সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা হয়। ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করেন ইলেকট্রিক পাওয়ার ডেভালাপমেণ্ট করপোরেশন নামে জাপানের একটি সংস্থা ১৯৯২ সালে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে অনুমোদন পাওয়া যায়:

(১) সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির ১৯৯২

(২) পরিবেশ দপ্তরের ১৯৯৩

(৩) প্ল্যানিং কমিশনের ১৯৯৪

আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস মেলে জাপান ব্যাঙ্ক অফ ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশনের কাছ থেকে। এই কাজ শেষ করতে ব্যয় হবে ভারতীয় মুদ্রায় ৩২০০ কোটি টাকা।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় দুটি জলাধার তৈরি হবে যার একদিকে থাকবে একটি করে বাঁধ। এই বাঁধ মাটির তৈরি, বাইরে থাকবে মাপ মত পাথর দিয়ে বাঁধানো। মাটি ছাড়া কংক্রীটের বাঁধ করা সম্ভব নয় কারণ এখানে গরম কালে ও শীতকালে উষ্ণতার তারতম্য অনেক বেশি ফলে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কংক্রীটের বাঁধের ফাটল ধরতে পারে। উপরের বাঁধটির

দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় কিলোমিটার। নীচের বাঁধটির দৈর্ঘ্য তিনশ মিটারের কাছাকাছি। যদিও দুই বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা প্রায় সমান। ছোটখাট সমস্যার ফলে কাজের আরম্ভ দেরিতে হলেও, নির্দিষ্ট গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। এর কাজ শেষ হবে ২০০৭ এর শেষ দিকে। দুই জলাধারকে যোগ করবে টানেল। টানেল, বাঁধ তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। যথাসময়ে এসে যাবে বলে মনে হয়। পাওয়ার হাউস যার মধ্যে টারবাইন গুলি থাকবে। সেই পাওয়ার হাউস থাকবে পাহাড়ের ভেতরে টানেলের মধ্যে। এই অঞ্চলের পাথর যথেষ্ট শক্ত হবার ফলে টানেল তৈরি করতে বেশী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

প্রকল্পের উপকারিতা

এই প্রকল্পের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি (400 Kv) সঞ্চালন লাইনের সাহায্যে পৌঁছে যাবে দুর্গাপুর ও আরামবাগে। সেখান থেকে সাবস্টেশনের মাধ্যমে চলে যাবে প্রত্যন্ত প্রদেশে যেখানে যেমন প্রয়োজন। সেই বিদ্যুতের লাইন তৈরির কাজও বরাত দেবার মুখে।

এই প্রকল্প রূপায়ণের সময়ে ও পরে কোনো পরিবারকে বাস্তুচ্যুত হতে হচ্ছে না। কোনো জনপদ জলাধারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে না। দরকার হচ্ছে না কোনো পুনর্বাসনের। কোনো জীবজন্তুর বিচরণ (অরণ্যে) বিঘ্নিত হচ্ছে না। অরণ্যের যে অংশে সাময়িক ভাবে দখল করা হচ্ছে তার বদলি জমি ও সেই জমিতে গাছ লাগাবার খরচ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে।

জলাধারের গাছ ও জলজ প্রাণীর সৃষ্টি হবে, তাতে লাভবান হবেন স্থানীয় মানুষ।

বড় জলাধার হবার ফলে শীতকালে পরিযায়ী পাখীদের ভীড় বাড়বে এই অঞ্চলে।

ভ্রমণ বিলাসীদের ভীড় জমবে এই প্রকল্পের রূপায়ণের পর থেকে

অপর্য্যাপ্ত বিদ্যুতের ফলে গড়ে উঠবে অনেক নতুন শিল্প।

যে নদীর ওপরে এই কর্মযজ্ঞ হতে চলেছে তার নাম কিষ্টো বাজার নালা। তার দু একটি উপনদী আছে তা হচ্ছে, বামনী, মৃগী ঝোরা ইত্যাদি। বিদ্যুত তৈরি হবার পর এই জল আবার নদীর স্রোত হয়ে গিয়ে পড়বে সুবর্ণরেখা নদীতে।

ভাবী সম্ভাবনা

এই প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হলে এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি পাম্প স্টোরেজ প্রকল্পের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা আছে তার কাজ শুরু হতে পারে। সে গুলি হোলোঃ

(১) পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প	৯০০ মেগাওয়াট
প্রকল্প রূপায়নের পথে	
(২) তুরগা পাম্প স্টোরেজ	৬০০ মেগাওয়াট
(৩) কাথলা জল পাম্প স্টোরেজ	৯০০ মেগাওয়াট
(৪) বাচ্চুনালা পাম্প স্টোরেজ	৯০০ মেগাওয়াট
(৫) কুলবেড়া পাম্প স্টোরেজ	৬০০ মেগাওয়াট
সব মিলিয়ে মোট	৩৯০০ মেগাওয়াট

কালক্রমে সবকটি প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হলে শুধু রাজ্যের নয়, ভারত বর্ষের বিদ্যুত চিত্র বদলে যাবে। জাতীয় গ্রিড-এ এই বিদ্যুত ছড়িয়ে যাবে দেশের দূরতম প্রান্তে যেখানে যেমন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করবার ফলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে জায়গা করে নেবে পুরুলিয়ার এই মালভূমি অঞ্চল।

শিল্প বিকাশে পুরুলিয়া

অতনু কুমার মণ্ডল

অবিভক্ত মানভূম জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে পুরুলিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে। মূলতঃ কৃষিনির্ভর এই জেলা জন্মলগ্ন থেকেই নানা সমস্যায় দীর্ণ। জেলার মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ গ্রামকেন্দ্রিক এবং তাদেরও নব্বই শতাংশের জীবিকা কৃষিনির্ভর। কিন্তু জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও কৃষিক্ষেত্রে এই জেলার অগ্রগতি তেমন আশাব্যঞ্জক হয়নি। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, উঁচুনীচু অসমতল ভূমিরূপ, খরার প্রকোপ, ডুংরী ও টাঁড়ের আধিপত্য, জমির জল ধারণে অক্ষমতা, ক্রমাগত ভূমিক্ষয় এবং উন্নত মানের কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয়গুলির মোকাবিলা করে গ্রামের কৃষিনির্ভর মানুষ সবুজ বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হননি। যদিও আশি ও নব্বই-এর দশকে ভূমি সংস্কার তথা খাস জমি বণ্টনে এই জেলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটেছে বাস্তবে কিন্তু তার সদর্থক প্রতিফলন দেখা যায়নি।

ফলত: এক ফসলা জমির ভূমিরূপ পরিবর্তন হয়ে দো ফসলা বা তিন ফসলা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। বাড়েনি কৃষিনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ। জলবিভাজিকা প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণে ব্যর্থতার ফলে কৃষির সহায়ক দিকগুলি যেমন ভূমি সংরক্ষণ, মৎস্যচাষ, পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যতটা অগ্রগতি আশা করা গিয়েছিল বাস্তবে তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। আশেপাশের জেলাগুলি যেমন মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেলেও প্রত্যন্ত এই জেলাটি এখনও চিহ্নিত হয়ে রয়েছে পিছিয়ে পড়া জেলা হিসেবে।

কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির এই অন্তরায়গুলি পরোক্ষে কিন্তু সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে। যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভূমি সংস্কারের পরেও রয়ে গেছে অনাবাদী, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তা দাঁড়িয়েছে আশীর্বাদ স্বরূপ। তেমনি কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিক অভাব পূরণ করেছে প্রয়োজনীয় শিল্প শ্রমিকের। বস্তুত পুরুলিয়া জেলার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রাকৃতিক বাধাগুলি দূর করা বাস্তবে যতটা কঠিন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তা কিন্তু অনেকটাই অনায়াসলব্ধ প্রয়াস। জমির সহজ লভ্যতা, শ্রমিকের প্রাচুর্য, কাঁচামালের যোগান, নিকটবর্তী শিল্পোন্নত বাজার ও বিপণনের সুযোগ প্রভৃতি প্রাথমিক সুবিধাগুলি কিন্তু জেলা গঠন হওয়ার শুরু থেকেই ছিল। ভৌগোলিক দিক দিয়েও এই জেলাটি বরাবর অবস্থিত সুবিধাজনক জায়গায়। ভারতবর্ষের মানচিত্রে পুরুলিয়ার অবস্থান ও তার পারিপার্শ্বিক দিকগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই জেলাটিকে 'সলমনের আংটি'র মতো বেষ্টন করে আছে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি শিল্পসমৃদ্ধ শহর, যেমন—জামশেদপুর, রাঁচী, ধানবাদ, হাজারিবাগ, বোকারো, দুর্গাপুর, আসানসোল, রানিগঞ্জ,

বর্ধমান ইত্যাদি। এমনকি পেট্রোকেমিক্যাল শহর হলদিয়ার দূরত্ব এই জেলা থেকে খুব দূরে নয়।

শুধু ভৌগোলিক অবস্থানই নয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুকূল ছিল প্রথম থেকেই। উপরোক্ত শিল্পসমৃদ্ধ শহর তথা ভারতবর্ষের বেশকিছু প্রধান প্রধান নগরের সঙ্গে রেল ও সড়ক পথে পুরুলিয়ার যোগাযোগের সূত্র ছিল অবিভক্ত মানভূম জেলার সময় থেকেই। তবে এই যোগাযোগের সূত্রগুলি বহুলাংশে উন্নত হয়েছে আশি এবং নব্বই-এর দশকে বেশ কয়েকটি নতুন রেলপথ স্থাপনে এবং বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে। বর্তমানে রেল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমগুলি হল দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বিভাগীয় কার্যালয় আদ্রা থেকে নির্গত দুটি প্রধান সংযোগকারী রেলপথ যা বিহার তথা অধুনা সৃষ্ট ঝাড়খণ্ড রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত করেছে এবং অপর একটি রেলপথ যা পুরুলিয়া জংশন থেকে ঝালদা ও মুরী হয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় সড়ক-৩২ যা জামশেদপুর, বোকাবো, চাস এবং ধানবাদকে পুরুলিয়ার সাথে যুক্ত করেছে। জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়ক বাদেও বিগত ২৫ বছরে পূর্ত দপ্তর, পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রায় ৮২৭৪ কিমি রাস্তার নির্মাণ এবং উন্নয়ন করা হয়েছে যা পুরুলিয়া জেলায় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রেও পুরুলিয়া যথেষ্ট সমৃদ্ধ। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুযায়ী এই জেলায় প্রায় দশ রকমের খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল কয়লা, চুনাপাথর, গ্রানাইট, চিনামাটি, রক ফসফেট, কোয়ার্টজ, ডলোমাইট ইত্যাদি। এই খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য ১৯৭৩ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপ্‌মেন্ট এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন নামে রাজ্য সরকারের একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সংস্থা বরাবাজার থানার বেলডি এবং মানবাজার থানাব চিরুগোড়াতে রক ফসফেট এবং বেরো ও রঘুনাথপুর থেকে গ্রানাইট, বলরামপুরের মালতি থেকে ফায়ার ক্লে এবং মিরমি থেকে কোয়ার্টজ উত্তোলনের কাজ হাতে নেয়। এই সংস্থার অধীনে বিভিন্ন স্থানে ৫০০-এর বেশি শ্রমিক এবং আশি জনের উপর কর্মী ও আধিকারিক নিযুক্ত থাকেন। তবে খনিজ সম্পদের উত্তোলন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রযুক্তিগত অসুবিধার ফলে এই সংস্থা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। ফলে চাহিদাভিত্তিক উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে বেশকিছু ঘাটতি।

এমতাবস্থায় ২০০২ সালে রাজ্য সরকারের 'মাইনর মিনারেল রুলস' প্রবর্তনের মাধ্যমে খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও সঠিক ব্যবহারের একটি নীতি প্রণয়ন করেন। সরকারি নীতির এই সরলীকরণের ফলে লিজ বা বন্দোবস্তের মাধ্যমে খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পায় এবং বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হতে শুরু করেন।

শিল্পবিকাশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি, যেমন—বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থা, ব্যাংক, ডাকঘর, টেলিযোগাযোগ ও অন্যান্য পরিকাঠামো পরিষেবার বিষয়ে প্রত্যন্ত এই জেলাটির কতকগুলি প্রাথমিক দুর্বলতা ছিল। এই বাধাগুলি আশির দশক থেকে নানাধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা হয়। যেমন, ১৯৭৭ সালে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সাঁওতালডি ছিল একমাত্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু বর্তমানে ৪৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে বাঘমুণ্ডিতে জাপানি সহায়তায় একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার মুখে। আগে যেখানে মাত্র ৪৬৫টি মৌজাতে বিদ্যুৎ পৌঁছেছিল, ২০০৩ সালের শেষে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬৯৪। এছাড়া ওই সময়ের মধ্যে ৯টি সাবস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫টি নতুন সাবস্টেশনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। শুধু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নয় গ্রামীণ

রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ১৯৭৮ সালের ৩০০ কিমি গ্রামীণ রাস্তা ২০০৩-এ সরকারি হিসেব অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ৭৪৩৬ কিমিতে। টেলিযোগাযোগ বিস্তৃত হয়েছে ব্লক হেড কোয়ার্টার ছাড়িয়ে বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। পোস্ট অফিস স্থাপিত হয়েছে ৪৩১টি স্থানে। দূরবর্তী গ্রামগুলিতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় ৮৩টি শাখা খোলা হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও পরিকাঠামো উন্নয়নের বেশকিছু কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে বিগত ২৫ বছরে।

পুরুলিয়া জেলার আরও একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল শাল, মহুয়া, ঝরনা, নদী, ডুংরি ও পাহাড় ঘেরা বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। অযোধ্যা, মাঠা, দুয়াসিনী, পাঞ্চেত, কুইলাপাল, সুরুলিয়া, দোলাডাঙা, গড়পঞ্চকোট, পাকবিড়রা প্রভৃতি পর্যটন কেন্দ্রগুলি শীতের মরশুমে এবং বসন্তের প্রারম্ভে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পর্যটকদের আনাগোনায়। এই পর্যটন কেন্দ্রগুলি উন্নয়নের জন্য জেলা প্রশাসন তথা বনবিভাগ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলে হোটেল ব্যবস্থায় বেশকিছু বিনিয়োগকারী এমনকি 'সামগ্রিক এলাকা উন্নয়ন সংস্থা' (CADC)-এর মতে আধাসরকারি সংস্থাও উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছে।

উপরোক্ত পটভূমিতে পুরুলিয়া জেলার শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে অনেক সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এই জেলাটি ভারতবর্ষ এমনকি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মানচিত্রে কোনো বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারেনি। ফলত ষাটের দশক থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও তার ছাপ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তেমন পড়েনি। বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রে সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মধুকুণ্ডার দামোদর সিমেন্ট উল্লেখযোগ্য হলেও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে কিন্তু স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের বড়ো একটা উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। ২০০০ সাল অব্দি যে ৭১টি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়েছে তার একটি বড়ো অংশই দখল করে আছে হলদিয়া অনুসারী শিল্প, লাক্ষা, খাদ্য, রাসায়নিক ও কারিগরী শিল্পের বেশ কয়েকটি ইউনিট। এইসব শিল্পোদ্যোগগুলি স্থাপনের যে পরিমাণ বিনিয়োগ তথা কর্মস্থান হয়েছে তার একটি সারণি দেওয়া হল—

শিল্পের নাম	বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)	ইউনিট	কর্মসংস্থান
(১) রাসায়নিক দ্রব্য	৩৪৬.০০	১৪	৬৪৪
(২) খাদ্যসামগ্রী	৪০৯.৩৮	২০	৩৮৪
(৩) কারিগরী শিল্প	৮০.০০	৪	৫১
(৪) তামাক শিল্প	১০.০০	১	৩৫
(৫) অধাতব খনিজ দ্রব্য	১১১০.৯০	৬	১১০
(৬) কাচ শিল্প	১৫৪.০০	৬	১৩৯
(৭) পর্যটন শিল্প	১০০.০০	১	২৭
(৮) অন্যান্য শিল্প	৭৮.৮২	৮	৬৫
(৯) হলদিয়া অনুসারী শিল্প	২২৮.৭৭	১১	১১০
মোট ২৪৬২.১০	৭১	১৫৬৫	

সারণিটি থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বিনিয়োগের সাথে কর্মসংস্থানের হার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ফলে কৃষিক্ষেত্রে বেকার এবং অর্ধবেকার শ্রমিকদের একটা বিশাল অংশের কর্মসংস্থানের যে সুযোগ শিল্পায়নের মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল বাস্তবক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তেমনি সম্ভব হয়নি স্থানীয় খনিজ সম্পদের ব্যবহারিক প্রয়োগে। বিপুল পরিমাণে গ্রানাইটের ভাণ্ডার ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তার উত্তোলন এবং ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি।

এখন প্রশ্ন হল অনেকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনের মাত্রা কেন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করলে যে ত্রুটিগুলি চোখে পড়ে সেগুলি হল—

(এক) বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাব এবং শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক দায়ভার তথা ঝুঁকি গ্রহণে শঙ্কা।

(দুই) কৃষিজ পণ্যকে কেন্দ্র করে কোনো শিল্প গড়ে না ওঠার জন্য কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ন্যূনতম কারিগরী দক্ষতা তথা জ্ঞানের অভাব। ফলত উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকদের শিল্পে নিযুক্ত করার ব্যাপারে বিনিয়োগকারীদের অনীহা।

(তিন) খনিজ সম্পদ উত্তোলন তথা ব্যবহারিক উৎপাদন সম্পর্কে সঠিক নীতির অভাব এবং মাইনস ও মিনারেল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের পরিচালনগত ত্রুটি এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব।

(চার) পর্যাপ্ত জমি থাকলেও শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত না করতে পারার প্রশাসনিক দুর্বলতা।

(পাঁচ) গ্রামীণ শক্তি উন্নয়ন নিগম (REDC) কর্মসূচির মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা গেলেও শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহে বিদ্যুৎ দপ্তরের সঠিক উদ্যোগের অভাব।

(ছয়) অনেকগুলি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে সাধারণের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য উপযুক্ত প্রচারের অভাব।

(সাত) বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের সরকারি নীতি **'Single Window'** ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তার সঠিক রূপায়ণ করতে না পারার প্রশাসনিক দুর্বলতা।

২০০২ সালের পর থেকে অবশ্য পুরুলিয়ার শিল্পবিকাশের পটভূমি নতুন রূপ পরিগ্রহণ করতে শুরু করে। এই পরিবর্তনের মূল কারণ হল রাজ্য সরকারের নয়া শিল্প নীতি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কীম'—২০০০-এর প্রকাশ এবং জেলাপ্রশাসন ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আগ্রহের সঞ্চার। এর প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখতে পাই সরকারি নীতি ও জেলাপ্রশাসনের ইতিবাচক ভূমিকাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য একের পর এর আলোচনাচক্র তথা সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা। ২০০০ সালের শুরুতে রাজ্য সরকার, জেলাপ্রশাসন এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিনিয়োগকারীদের নিয়ে প্রথম একটি বড়ো মাপের আলোচনাচক্র হয় এবং সেখানে পুরুলিয়া জেলার সম্পদের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এই আলোচনাচক্রের পর শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হলেও বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু তার প্রতিফলন ঘটেনি বিনিয়োগের মাধ্যমে। মূলত সরকারের ঘোষিত নীতি রূপায়ণে জেলাপ্রশাসনের সদিচ্ছা প্রকাশ পায় পরবর্তী বেশ কয়েকটি আলোচনা শিবিরের মাধ্যমে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়—

(১) ২০০১ সালের জুলাই মাসে হলদিয়া অনুসারী শিল্পের ওপর আলোচনাচক্র।

(২) ২০০২ সালের মার্চ মাসে লাক্ষা শিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ শিবির।

(৩) ২০০২ সালের জুলাই মাসে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা সভা।

(৪) ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে পুরুলিয়া জেলায় শিল্প বিকাশের সম্ভাবনার ওপর আলোচনাচক্র।

(৫) ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে তসর শিল্পের ওপর জাতীয় কর্মশালা।

শুধু আলোচনাচক্রই নয় পুরুলিয়া জেলার সম্পদ তথ্য সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট www.purulia.org জেলাপ্রশাসনের উদ্যোগে খোলা হয় ২০০২ সালে। এই ওয়েবসাইটটি বিনিয়োগকারী তথা নতুন শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়। যেমন—

(এক) জমির অবস্থান, পরিমাণ এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তা উপযুক্ত কিনা এইসব তথ্য সম্বলিত একটি ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করা, যা থেকে উদ্যোগী শিল্পপতি বা শিল্প স্থাপনে আগ্রহী বিনিয়োগকারীরা প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।

(দুই) জেলাশাসকের অধীনে একটি বিশেষ সেল গঠন করা, যা **'Single Window'** হিসেবে শিল্পোদ্যোগীদের সমস্ত রকম সহায়তা করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করতে পারে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের সুবাদে প্রশাসনিক ঢিলেমি বা লাল ফিতের ফাঁস সম্পর্কে সাধারণভাবে ধারণাগুলি জনমানস বিশেষত শিল্পোদ্যোগীদের মন থেকে দূর হতে শুরু করে। ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই বেশ কয়েকটি মাঝারি শিল্প—স্পঞ্জ আয়রন ও হলদিয়া ডাউনষ্ট্রীমের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে, যার আনুমানিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০০ কোটিরও বেশি।

নীচের সারণিতে উপরোক্ত মাঝারি শিল্পগুলির অবস্থান তথা বিনিয়োগের একটি চিত্র দেওয়া হল—

শিল্প ইউনিটের নাম	অবস্থান	বিনিয়োগের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান	মন্তব্য
(১) পূর্বাঞ্চল স্পঞ্জ আয়রন প্রাইভেট লিমিটেড	নেতুড়িয়া	৬৩.০০	১০০	চালু হয়ে গেছে
(২) মা ছিন্নমস্তিকা স্টিল পাওয়ার লিমিটেড	নেতুড়িয়া	১৬.০০	৭০	চালু হয়ে গেছে
(৩) মার্ক স্টিল	সাঁতুড়ি	১৬.৬৫	১০০	চালু হয়ে গেছে
(৪) ভিশন স্পঞ্জ আয়রন প্রাইভেট লিমিটেড	সাঁতুড়ি	৪৯.৮৪	১২০	চালু হওয়ার মুখে
(৫) বিকাশ মেটাল প্রাইভেট লিমিটেড	সাঁতুড়ি	৬৬.৮৩	৪১৯	চালু হওয়ার মুখে
(৬) রঘুপুর স্টিল এ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড	নেতুড়িয়া	১২.০০	৪০	চালু হওয়ার মুখে
(৭) ওড়িশা আয়রন ওর লিমিটেড	কাশীপুর	৫.৫০	৪০	চালু হওয়ার মুখে

শিল্প ইউনিটের নাম	অবস্থান	বিনিয়োগের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান	মন্তব্য
(৮) BISCO স্পঞ্জ আয়রন প্রাইভেট লিমিটেড	বলরামপুর	৫৫.০০	৩০০	চালু হওয়ার মুখে
(৯) বালাজী স্টিল	বলরামপুর	১.৫৫	১৫	চালু হওয়ার মুখে
(১০)ব্রেভো স্পঞ্জ আয়রন	পাড়া	৯.৮০	৭০	চালু হওয়ার মুখে
অধাতব খনিজ দ্রব্য :				
(১) মেসার্স পুরুলিয়া সিমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড	শিমুলিয়া, পুরুলিয়া	১০.০০	৯৭	চালু হয়ে গেছে
(২) (ISCO) ট্র্যাক স্লিপার প্রাইভেট লিমিটেড	আনারা	৫.০০	৪৫	চালু হয়ে গেছে
হলদিয়া অনুসারী (ডাউনষ্ট্রীম) শিল্প :				
(১) কুশল পলিস্যাক্স প্রাইভেট লিমিটেড	ঝালদা	৩.০০	৪০	চালু হয়ে গেছে

উপরের সারণি থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিগত ৪৫ বছরে শিল্পক্ষেত্রে যে হারে বিনিয়োগ হয়েছে গত তিন বছরের বিনিয়োগ তথা কর্মসংস্থানের চেয়ে অনেক বেশি। এর থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, সরকারি নীতির সরলীকরণ, প্রশাসনিক উদ্যোগ ও সহায়তা, সহজলভ্য জমি, সুলভ শ্রমিক, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোগত সুবিধাই বেশ কিছু বিনিয়োগকারীদের পুরুলিয়া জেলায় শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করেছে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খনিজ নীতি সরলীকরণের ফলে শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হলেও, এই সংক্রান্ত তেমন কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। যেমন গড়ে ওঠেনি কৃষিজ পণ্যকে কেন্দ্র করে কোনো বড়ো শিল্প। এমনকি উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোনো 'ঠান্ডাঘর' বা **Cold storage** স্থাপন করতে কেউ এগিয়ে আসেননি এখনও পর্যন্ত। পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি উদ্যোগে একমাত্র পুরুলিয়া শহর ছাড়া অন্য কোথাও গড়ে ওঠেনি পর্যটন আবাস এমনকি ছোটোখাটো হোটেলও। পর্যটকদের ভ্রমণে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসেনি কোনো ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি।

১৯৯৮ সালে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির একটি দল পুরুলিয়া শিল্প বিকাশের ভবিষ্যত নিয়ে যে সমীক্ষা করেছিলেন সেখানে অনেকগুলি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেমন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ, ল্যাম্প সোসাইটির মাধ্যমে বনজ সম্পদের প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন ও হোটেল নির্মাণ, খনিজ সম্পদের গুণগত মান পরীক্ষা করে শিল্প স্থাপন ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উদ্যোগী এগিয়ে আসেননি। তাই বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পুরুলিয়া জেলা এখনও পর্যন্ত শিল্পোন্নত জেলা হিসেবে পরিচিত হতে পারেনি। এখন প্রয়োজন পুরুলিয়া জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব

সম্পদ পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আইনশৃঙ্খলার সুব্যবস্থা ও প্রশাসনের ইতিবাচক ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে নিরন্তর প্রচার চালানো এবং বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হয়ে রাজ্য সরকার, জেলাপ্রশাসন এবং বিনিয়োগকারীরা যদি পারস্পরিক মত বিনিময় করেন এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তরায় দূর করে একসাথে এগিয়ে যেতে পারেন তাহলে পুরুলিয়া জেলার শিল্প বিকাশের চালচিত্র নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। আঙ্গুল তুলে কেউ এই জেলাকে চিহ্নিত করবে না পিছিয়ে পড়া জেলা হিসেবে।

গ্রন্থপঞ্জি

(1) District Gazetteer, Purulia District

(2) Industrial Scenario in Purulia : A Review — Official Document of DM, Purulia

(3) Prospects of Development of Industry in Purulia — A Published Document of Purulia Zilla Parishad

(4) West Bengal Minor Mineral Rules, 2002

(5) West Bengal Incentive Scheme, 2000

(6) Inventory of Land & Minerals : — Official Document of DM. Purulia

(7) Unnayaner Chalchitra (উন্নয়নের চালচিত্র) — A Published Document of Purulia Zilla Parishad

(8) Report of CII, 1998

(9) In Search of a District Development Index, SIPRD, 2001

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প—পুরুলিয়া

সঞ্জিত কর্মকার

দেশ ও দশের প্রতি কল্যাণকর, উন্নতমনা সৎ বাস্তববাদী মানুষের কুটিরশিল্পের প্রতি প্রধান আকর্ষণের কারণ দুটি— (১) কম পুঁজি, (২) প্রচুর কর্মসংস্থান।

যে উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারে চাহিদা আছে, যে কোনো রকমের অসুবিধা কাটিয়ে সেই সামগ্রীর উৎপাদন যে অব্যাহত থাকবে— তা' নিশ্চিত।

কিন্তু বাস্তবে আজ এই বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করার উপায় নেই যে কুটির - শিল্পজাত সামগ্রীর চাহিদা কমেছে। কম পুঁজির কুটিরশিল্পীদের আমরা ভিড়িয়ে দিয়েছি মহাবিত্তবান বহুজাতিক সংস্থার সাথে। ফলে এইসব কম সামর্থ্যের কুটিরশিল্পীদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো সত্যিই কষ্টকর।

আর তাই গান্ধীজির দেখানো স্বনির্ভর গ্রাম আজ শুধু কল্পনাই কবা যায়। স্বপ্নের গণ্ডি পেরিয়ে আজ তা' বাস্তবে উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব।

এখনকার শিল্প মানেই বিশাল পুঁজি বিনিয়োগ, অত্যল্প কর্মসংস্থান— যা কুটিরশিল্পের একেবারে বিপরীত।

আসা যাক্ আমাদের পুরুলিয়া জেলার কথায়।

বিশের দশকের আগে পুরুলিয়া জেলাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার প্রায় ছিল না বললেই চলে। ১৯২২ সালে তুলসীদাস কর্মকার ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ড থেকে মেটালারজিতে স্নাতক হয়ে পুরুলিয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯২৮ সালে প্রেসিডেন্সি এজ্ টুলস্ নামে একটি আগর (Auger) কারখানা স্থাপন করেন। আগর হল মোটা কাঠের তক্তা ফুটো করার যন্ত্র বিশেষ। তার আগে ভারতে আর কোথাও আগর তৈরি হত না। এখনও হয় না। সারা ভারতের আগরের প্রয়োজন একা পুরুলিয়া মেটায়। এই শিল্পের হাত ধরে পুরুলিয়াতে কাঁচি, ছুরি, বাটালি ইত্যাদি ছোট ছোট যন্ত্র তৈরির বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং বহুলোকের কর্মসংস্থান হয়। সত্তরের দশক পর্যন্ত এই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির রমরমা ছিল। বর্তমানে উপযুক্ত কাঁচামাল, পর্যাপ্ত মূলধন, আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রযুক্তির অভাবে এই শিল্প এখন মৃতপ্রায়। এই সুযোগে কিছু মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বিনাশ্রমে এর থেকে মুনাফা অর্জন করছে। এই শিল্পের দক্ষতা পুরুলিয়া থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লিতে নিয়ে যাবার বহু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ঐ প্রচেষ্টা সফলতা পায়নি। উন্নত প্রযুক্তিসহ যথাযথ সরকারি সহযোগিতা পেলে এই শিল্পের মাধ্যমে বহু বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। শুধু তাই নয়—এর দ্বারা প্রচুর বিদেশি মুদ্রাও অর্জন করা যেতে পারে।

এর পাশাপাশি এই জেলার ঝালদা ও বলরামপুরে লাক্ষাকীট চাষ ও লাক্ষা তৈরির কিছু কারখানা প্রাক্-স্বাধীনতা সময়ে গড়ে ওঠে খুবই ক্ষুদ্র আকারে। ধীরে ধীরে এই শিল্পের প্রসার

ঘটতে থাকে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এই শিল্পের ব্যাপক প্রসারতা থাকে, যার ফলে লাক্ষাকীট চাষের ব্যাপকতা বাড়তে থাকে, পরিণতিতে চাষী, শিল্পপতি, কর্মী এই শিল্পে যুক্ত হল যার ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়। বর্তমানে এই শিল্পে বেশকিছু শিল্পপতি এগিয়ে এলেও সেইভাবে লাক্ষাকীট চাষীদের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে না, যদিও সারা বিশ্বে লাক্ষা ও লাক্ষাজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। যেহেতু লাক্ষাশিল্পের মূল উপাদান হ'ল লাক্ষাকীট, তাই এই শিল্পের প্রসার ঘটাতে লাক্ষাকীট চাষীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ানো প্রয়োজন।

আগরশিল্পের মতো এই শিল্পেও প্রচুর কর্মসংস্থান ও বিদেশি মুদ্রা অর্জনের সুযোগ আছে।

রাজস্থানের জয়পুর থেকে কিছু লাক্ষা হস্তশিল্পী বহুদিন যাবৎ পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরের বাসিন্দা। আগে তাঁরা লাক্ষার মোটা চুড়ি, বালা, দুল ইত্যাদি তৈরি করতেন—তাতে আধুনিক সৌন্দর্যের ঘাটতি ছিল। তখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় এবং শিল্পের উৎকর্ষতায় সুন্দর সুন্দর চুড়ি, বালা, দুল ও ঘর সাজানোর 'শোপিস' তৈরি হয়। বিভিন্ন সরকারি বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে ও নিজস্ব বিপণন ব্যবস্থায় এঁরা এই সমস্ত শিল্পসামগ্রী বিক্রি করে বেশ ভাল দাম পান।

এই শিল্পটি গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর মাধ্যমে আরও কিছু লোকের কর্মসংস্থান করতে হলে এই শিল্পের প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটাতে হবে। বিদেশেও এই সমস্ত সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা আছে।

বলরামপুরের উলেন কার্পেট তৈরি শিল্পের প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। কাঁচামাল (র' উল) আসত উত্তরপ্রদেশের সম্ভবত মির্জাপুর/বেনারস থেকে। অতি অল্প মজুরীর বিনিময়ে বলরামপুরে কার্পেট তৈরি করিয়ে উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ীরা তা নিয়ে যেতেন। তারপর উত্তরপ্রদেশে 'ফিনিশিং' এবং 'পালিশিং'-এর পর তা বিদেশে রপ্তানি হত। বলরামপুরে কিন্তু 'ফিনিশিং' এবং 'পালিশিং' কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘদিন বিহার রাজ্যে থাকার পর ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬-এর আগে ও পরে একটি কুটিরশিল্প এখনও একই অবস্থায় এই জেলায় বিরাজমান। সেটি "বিড়িশিল্প"। বিড়ি কোম্পানির মালিকরা/এজেন্টরা কারিগরদের পাতা এবং তামাক সরবরাহ করেন। অত্যন্ত কম মজুরিতে নানারকম রোগের ঝুঁকি নিয়ে তামাকের বিষাক্ত পরিবেশে কারিগর সপরিবারে বিড়ি তৈরি করে মালিক বা এজেন্টের হাতে প্রতিদিন তুলে দেন এবং কোনোরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। অসুখ-বিসুখ এমনকী কারিগরের মৃত্যুসংক্রান্ত দায়ও মালিক বা এজেন্ট গ্রহণ করেন না।

পুরুলিয়া জেলায় উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প বাগমুণ্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের "মুখোশ শিল্প"। তবে এর বাজারও ক্রমশ কম্‌তির দিকে। শিল্পীরা এই শিল্পে টিকে থেকে দিনগুজরানের চেষ্টা করে চলেছেন মাত্র।

পুঞ্চা ব্লকের রাজনোয়াগড়ে কাশিধাম এবং খেজুর পাতা দিয়ে শিল্পসামগ্রীর বাজারও বেশ ভাল। পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়াশবর কল্যাণ সমিতির এইসব কারিগররা এই শিল্পের মাধ্যমে রুজি-রোজগারের পথ পেয়েছেন।

পুরুলিয়া, কাশিপুর, পুঞ্চা ও মানবাজার এলাকায় একসময় কাঁসার বাসন শিল্পের বেশ রমরমা ছিল। পুরুলিয়া ছাড়া বাইরেও এখানের কারিগরদের তৈরি কাঁসার বাসনপত্রের বাজার খুবই ভাল ছিল। পরবর্তীকালে কাঁচামালের অভাব, জ্বালানির সঙ্কট সৃষ্টি ছাড়াও পুলিশি অত্যাচারে এই শিল্প ধুঁকতে থাকে। যদিও যা শিল্পী-কারিগরেরা কোনোরকমে দিনগুজরান করে এই শিল্পকে নিজেদের পেটের তাগিদে বাঁচিয়ে রেখেছে এভাবে আর বোধহয় বেশিদিন সম্ভব হবে না।

কারিগরেরা তাদের বংশধরদের আর এই শিল্পে নিযুক্ত হতে উৎসাহ দিচ্ছেন না। সারাদিন পরিশ্রম করার পরেও অত্যল্প আয়ে সংসার চালানো অতি কষ্টকর হয়ে পড়ছে কারণ এখানেও সেই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর কালো ছায়া বর্তমান। কারিগরদের অসহায়তার সুযোগ তারা এই ব্যবসার মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর মূল শাঁস তারাই আত্মসাৎ করছে। এই সমস্ত শিল্প -সামগ্রীর বাজার স্টীলের বাসনপত্রের আগমনে বেশকিছুটা কমে গেলেও এর বাজার এখনও আছে। তবে সেই বাজার ধরতে হলে চাই সুলভে ও সহজে কাঁচামাল ও জ্বালানির সরবরাহ আর চাই উন্নত প্রযুক্তি।

এই জেলার কুমোরদের একটা অংশ তাদের চিরাচরিত ব্যবসা মাটির হাঁড়ি, কলসি, গ্লাস, খাগরা ইত্যাদি থেকে দিক পরিবর্তন করে 'রুফ টাইল্স' তৈরি কারখানা করেন এবং বহু পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের মুখ দেখেন। এতদিন বেশ ভালই চলছিল, ইদানীং খোলা বাজারের দৌলতে মালয়েশিয়া থেকে কারোগেটেড শিট্ এসে এই টালির বাজার দখল করছে। আর কিছুদিন এইভাবে চললে এই টালি শিল্প খালি হয়ে যাবে— ফলে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে। এই শিল্পকে সামগ্রিকভাবে বাঁচাতে হলে এখনই কিছু সরকারি চিন্তাভাবনা প্রয়োজন।

বর্তমান কালের নিয়মে এই জেলায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে বা উঠছে। যেমন— ঝালদাতে প্লাস্টিক শিল্প, নেতুড়ি এবং সাঁতুড়িতে স্পঞ্জ আয়রন শিল্প, পুরুলিয়াতে সিমেন্টশিল্প। এছাড়াও অগ্নিনিরোধক ইঁট, বিস্কুট, প্রভৃতি কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে।

পুরুলিয়া জেলা বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থে ভরপুর। অন্যান্য খনিজ সেভাবে শিল্পে ব্যবহৃত না হলেও কয়লা এবং পাথরকে নির্ভর করে বেশকিছু সফ্ট্ কোক্, ব্রিকেট, হার্ড কোক, স্টোন চিপ্স্ তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে এবং বহুলোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পরিবেশ দূষণের চোখরাঙানি এবং মাইনিং আইনের উপর।

এই জেলাতে জঙ্গল বেশ ভালই ছিল এবং সেখানে আসবাবপত্র তৈরির উপযোগী কাঠ পাওয়া যেত। ঐ কাঠের উপর নির্ভর করে বেশকিছু কাঠচেরাই কারখানা ও ফার্নিচার তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছিল— যাতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল। বর্তমানে ঐসব জঙ্গল যেমন কমে গেছে তেমনি আবার কঠোর জঙ্গল আইন হওয়াতে কাঠের সরবরাহ কমে গেছে। ফলে কাঠনির্ভর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় বন্ধের মুখে। এইসব শিল্পকে বাঁচাতে হলে একদিকে যেমন কাঠের সরবরাহ বাড়াতে হবে অন্যদিকে তেমন জঙ্গল আইনের বিভিন্ন দিকগুলি পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

পরিশেষে বিশ্বায়ন এবং অস্থির এই সময়ে কুটিরশিল্পীদের টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি বাস্তব কার্যধারার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় হবে না।

১। পুরুলিয়া জেলা এবং আশেপাশের জেলাতে কাঁচামাল, কারিগর এবং বাজার সম্পর্কে এক ব্যাপক এবং বাস্তব সমীক্ষা।

২। জেলার বাইরে, রাজ্যে, দেশে এবং বিদেশে বাজার সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান।

৩। কারিগরদের আধুনিকমনা করার প্রয়াস, আধুনিক চাহিদার সামগ্রীতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

৪। বাজার সম্পর্কে ব্যাপক এবং সরকারি অংশগ্রহণ। সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি কার্যালয়ে, কলকারখানায় চাহিদামত সামগ্রীর যথাসম্ভব কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা।

পুরুলিয়ার মতো ছোট এবং তথাকথিত অনুন্নত জেলায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের হাসিমুখ জেলার উন্নয়নের সহায়ক হবেই—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

পুরুলিয়া জেলায় তসর ও রেশম চাষ

অজিত মাণ্ডি

কৃষিনির্ভর খরাপ্রবণ পুরুলিয়া জেলায় তসরচাষের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। এই জেলার দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান উপজীবিকা হিসাবে জঙ্গলে তসরগুটি সংগ্রহের কর্মকাণ্ড স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। শতাব্দী প্রাচীন "রঘুনাথপুর তসর" বাংলার তসর-শিল্পজগতে একটি সুপরিচিত নাম। অতীতে যখন জেলায় বনের পরিধি ব্যাপক ছিল তখন প্রকৃতিতে তসরপলু শাল, অর্জুন, আসান, সিধা ইত্যাদি গাছে গুটি তৈরি করত। বনসংলগ্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গুটি সংগ্রহ করত এবং এই গুটি থেকে সুতো নিষ্কাশন করে বস্ত্রবয়ন করা হত।

এই শতাব্দীর শুরু থেকে জঙ্গলের আয়তন ক্রমশ কমে যেতে থাকে। জঙ্গলগুলিতে ব্যাপকভাবে গাছ কাটার ফলে, তসর পলু পালনের উপযোগী গাছের অভাব দেখা দেওয়ায়, তসরের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় ভীষণভাবে কমে যেতে থাকে। খাদ্যগাছের অভাবে এবং তসরচাষের উপযোগী প্রযুক্তির অভাবে '৭০-এর দশকের প্রারম্ভে তসরগুটির উৎপাদন প্রায় অবলুপ্ত হয়ে আসে। অবশেষে আশির দশকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষের তসর বলয়ে আন্তঃ রাজ্য তসর প্রকল্প (আই. এস. টি. পি.) গ্রহণ করে তসরচাষকে একটি সুসংগঠিত আকার দিতে বেশকিছু আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এই সময়ে এই প্রকল্পের আওতায় পুরুলিয়া জেলায় চাষ-অনুপযুক্ত মোট ২৮০ হেক্টর সরকার অধিকৃত খাস জমিতে সারিবদ্ধভাবে ৪' × ৪' দূরত্বে অর্জুন গাছ লাগিয়ে এবং তারপর তিনবছর গাছগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী অর্জুন-বাসন (Economic Plantation) তৈরি করা হয় এবং ঐ বাগানগুলি উপভোক্তা দলের মধ্যে তসরচাষ করার জন্য বিলি-বন্দোবস্ত করা হয়। উক্ত প্রকল্প রূপায়িত হবার পর তসর-চাষ সংগঠিত ভাবে শুরু হয়। চাষীরা প্রতি ১০০ ডিম পুষে ৪০০০ টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হয়। তসর-চাষে অগ্রগতির দুটো দিক উম্মোচিত হয়।

সারিবদ্ধভাবে লাগানো অর্জুন বাগানে তসরচাষ অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ার জন্য পরবর্তীকালে খরাপ্রবণ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, জওহর রোজগার যোজনা, পতিত জমি উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য বিভাগীয় প্রকল্পের আওতায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সহযোগিতায় মোট ১১০০ হেক্টর জমিতে অর্জুন বাগান তৈরি করা সম্ভব হয়।

তসরচাষের এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নীরোগ তসর ডিম উৎপাদনের জন্য জেলায়, ৩টি বিভাগীয় বীজাগার স্থাপন করা হয়, এবং অগ্রণী প্রকল্প কেন্দ্রগুলি (পি. পি. সি.) থেকে নীরোগ তসর ডিম চাষীদের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। উন্নত পদ্ধতিতে তসর চাষ করাব লক্ষ্যে জেলার তসরচাষের এলাকায় চাষীদের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের প্যাকেজ অনুসরণে সহায়তা করতে প্রযুক্তি সহায়তা কেন্দ্র (টি. এস. সি.) স্থাপন করা হয়। ট্রাইসেম ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে তসব চাষীদের উন্নত পদ্ধতিতে তসর চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা কবা হয়।

জেলায় তসর পলুর খাদ্যগাছের এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে নীরোগ তসর ডিমের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারি বীজাগার নীরোগ ডিম উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত হওয়ার জন্য জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউ. এন. ডি. পি.) অধীনে জেলার তসরশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির অন্যতম বেসরকারি নীরোগ তসর ডিম উৎপাদনের কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়িক করতে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে জেলায় ২৪টি তসর বীজাগার স্থাপন করা হয়।

বেসরকারিভাবে তসর ডিম উৎপাদন চালু করার ফলে তসরগুটির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তসরগুটির উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও জেলায় তসর-গুটি থেকে সুতা নিষ্কাশন (রিলিং ও স্পিনিং ইউনিট) কেন্দ্র সংখ্যায় নগণ্য হওয়ায় উদ্ভুত তসরগুটির বাজার (marketing) সমস্যার সমাধানে, সাম্প্রতিককালে হাতে নেওয়া, প্রকল্পগুলি (IXth Plan-CDP & UNDP) গুটি থেকে সুতো নিষ্কাশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জেলায় তসরশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া কর্মসূচিগুলির মধ্যে একটি হল তসল কাটাইদারদের উন্নতমানের তসর-নিষ্কাশনের যন্ত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করা। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণসহ ৫৫ জন কাটাইদার এবং ২৯ জন পাকদারকে উন্নতমানের যন্ত্র সরবরাহ করা হয়। এর সঙ্গে জেলায় ৫২টি তাঁতযন্ত্রেব উন্নতিকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পে উন্নত পদ্ধতিতে সুতো উৎপাদন ও নতুন পরিগণক যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি নক্সার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে জেলাতে উন্নতমানের বৈচিত্র্যময় নক্সার তসর-বস্ত্র উৎপন্ন হবে এবং তসরশিল্পে নতুন যুগের সূচনা ঘটবে। এর ফলে উৎপাদিত সমস্ত বাণিজ্যিক গুটি জেলাতেই সুতা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে তসরগুটি বিপণনের সমস্যা দূর করা যাবে।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বীজগুটি ও বাণিজ্যিক গুটি উৎপাদক চাষীদের সার ও কীটনাশক সরবরাহ ; পলু-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ ; বীজ উৎপাদকদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ ; সম্পূর্ণ সরকারি অনুদানে বীজাগার নির্মাণের ব্যবস্থাগ্রহণ ; ফসল, চাষী ও চাষীর ঘরের বিমাকরণের ব্যবস্থাগ্রহণ ; চাষী (বীজগুটি ও বাণিজ্যিক গুটি উৎপাদক), বীজ উৎপাদক দল, কাটাইদার, পাকদার, বয়নশিল্পী-এই সর্বস্তরে প্রশিক্ষণদান ইত্যাদি কর্মসূচিগুলি উক্ত প্রকল্পে গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়।

অনুরূপভাবে ক্যাটালিটিক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (সি.ডি.পি.) বিভিন্ন কর্মসূচি তসরশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তসর চাষীরা ফসল-বিমার সুযোগ পান। খাদ্যগাছের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার সরবরাহ করা হয়। বেসরকারি উদ্যোগে বীজাগার স্থাপনের জন্য সরকারি অনুদানে ৬টি বীজাগার নির্মাণ ও চাষীদের গুটি শুকানোর জন্য স্বল্পমূল্যের গুটি শুকানোর কুঠুরি নির্মাণ হয়। অগ্রণী প্রকল্প কেন্দ্র (পি. পি. সি.)-গুলির উন্নতি বিধান করা হয়।

বর্তমানে জেলার মোট ২০টি ব্লকের মধ্যে ১৭টি ব্লকে তসর চাষ হয়। জেলায় ৩০০০ পরিবার

তসরশিল্পের সাথে যুক্ত। বহু নতুন চাষীও তসর-চাষের জন্য এগিয়ে আছেন। উন্নত প্রযুক্তিতে তসর-চাষ করার জন্য গুটির উৎপাদন পূর্বের ডিম প্রতি ১৫-২০টি গুটির তুলনায় বেড়ে ডিম প্রতি ৪০-৫০টি গুটি হয়েছে। ২০০২-২০০৩ আর্থিক বছরে জেলায় মোট ২,৯৬,৭৬০টি নীরোগ তসর ডিমের চাষ হয় যা গত ২০০১-'০২ বছরের চাষের (২,৪৬,১০০টি) তুলনায় ২০% অধিক ;২০০২-'০৩ সালে মোট ৮৩৮৭ কাহান গুটি উৎপাদন হয় যা গত ২০০১-'০২ বছরের (৭৮১৫ কাহান) তুলনায় ৭% অধিক।

অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় সম বিকাশ যোজনা (R. S. V. Y.)-র মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলায় মোট ৯০০ একর জমিতে অর্জুন বাগান তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঐ বাগান তৈরি করতে মোট ৭৯২০০টি মানব/শ্রম দিবস তৈরি হবে। ঐ জমিতে চাষের জন্য মোট ৯০,০০০ হাজার নীরোগ তসর ডিম উৎপন্ন হবে যার বর্তমান বাজারে মূল্য আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টাকা। ঐ পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে মোট ৯০০টি চাষী পরিবার উপকৃত হবে। চলতি আর্থিক বছরে মোট ৫০০ একর জমিতে অর্জুন গাছ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে।

তসরচাষের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকলেও এই জেলায় রেশমচাষ কয়েকটি ছোট এলাকায় স্বল্প পরিসরে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। খরাপ্রবণ এই জেলায় অধিকাংশ জমি সেচযুক্ত না হওয়ায় এবং মৃত্তিকা সর্বত্র তুঁতচাষের পক্ষে উপযোগী না হওয়ায় রেশমচাষের সম্প্রসারণ খুবই কষ্টসাধ্য এবং আশানুরূপ নয়। এই কারণে অতীতে চেষ্টা সত্ত্বেও তুঁত চাষ সম্প্রসারণে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়নি। এর মধ্যেই ব্যতিক্রম হিসাবে অযোধ্যা পাহাড়ের নাম করা যেতে পারবে। অযোধ্যা পাহাড়ের আবহাওয়া দ্বি-চক্রী (Bivoltine) রেশম পলু পালনের বিশেষ উপযোগী হওয়ায় এখানে সরকারি ও বেসরাকারি স্তরের দ্বি-চক্রী রেশমচাষ হচ্ছে, বর্তমানে জেলায় রেশম পলু পালনের জন্য মোট ২টি সরকারি খামার আছে। এর মধ্যে অযোধ্যা পাহাড়স্থিত সরকারি খামারে মূলত দ্বিচক্রী রেশম পলু পালন হয়। এছাড়া কাশিপুর ব্লকের কাপিষ্ঠায় অবস্থিত সরকারি খামারে মূলত বহুচক্রী রেশম পলু পালন ও নীরোগ রেশম বীজ উৎপাদন হয়। উক্ত খামার দুটিতে রেশম পলু পালন ও গুটি উৎপাদন ছাড়াও তুঁতকাঠি উৎপাদন, তুঁতচারা উৎপাদন ইত্যাদি কাজ হয়ে থাকে।

পুরুলিয়ার তাঁতশিল্প

আব্দুল আজিজ মণ্ডল

বাংলার তাঁতশিল্পে পুরুলিয়া জেলা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেনা। এখানকার বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, দিগন্তবিস্তৃত শাল-অর্জুন বীথি, রৌদ্রের প্রচণ্ড খর দাবদাহ ও পাথুরে মাটি এখানকার মানুষকে শিল্প বিমুখ করে রেখেছে। তাই পশ্চিমবাংলার মধ্যে পুরুলিয়া জেলা পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে পরিচিত। অতীতে পুরুলিয়া জেলা একমাত্র গালাশিল্পে পরিচিত ছিল এখনও রয়েছে। এখানকার তাঁতশিল্পে-র বিশেষ পরিচিতি কখনই ছিল না—বিশেষ করে সুতিবস্ত্রে, যদিও তসরবস্ত্রের কিছুটা নাম এখনও আছে।

সুতিবস্ত্রের মধ্যে মোটা সুতোর কাজই এখানে কেবলমাত্র হয়। এই জেলাতে মোটা সুতোর শাড়ি, পাঁচ হাত লম্বা ধুতি, ছয়হাত ধুতি, গামছা ও বেডশিট্ উৎপাদন হয় প্রধানত স্থানীয় প্রয়োজনের নিরীখেই। সুতিবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি কাশীপুর ব্লকের কালাপাথর, সোনাথলি গ্রাম, রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের নূতনডিহি গ্রাম, বড়বাগান গ্রাম, উপরসাঁকড়া গ্রাম, জয়পুর ব্লকে জয়পুর, শ্রীরামপুর, প্রতাপপুর গ্রাম, হুড়া ব্লকে হিজুরী, দলদলি গ্রাম, পুরুলিয়া ১নং ব্লকে ভাণ্ডার পুয়াড়া, মানাড়া গ্রামে, পুরুলিয়া ২নং ব্লকে বাইকাটা, আড়িতা গ্রামে, আড়ষা ব্লকে চাটুবাসা, লিলড়ি সিধাটাঁড় গ্রামে।

তসরের শাড়ির থান ও শাটিং-এর কাপড় উৎপাদিত হয় প্রধানত পুরুলিয়া ২নং ব্লকের সিংবাজার গ্রামে, রঘুনাথপুর শহরে, পুঞ্চা ব্লকে রাজনোওয়াগড় গ্রামে ও মানবাজার ব্লকের কেশ্যামোহনডি গ্রামে।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁতশিল্প দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীন কুটিরশিল্প। কৃষির পরেই সর্বাধিক মানুষ তাঁতশিল্পে নিযুক্ত। তাই এই শিল্পের কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে দেশের অর্থনীতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তাঁতশিল্পীরা আবহমানকাল থেকেই মহাজনের দ্বারা শোষিত হয়েছেন। শোষণের অবসানকল্পে এবং তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক শিল্পী সংগঠন গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। তাঁতহীন তন্তুবায়দের জন্যও সমবায় সংগঠনের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাঁতশিল্পীকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে সরকারি প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হল:—

১। সমবায় সমিতির মূলধনে রাজ্য সরকারের অংশগ্রহণ:

২। সমবায় সমিতির সদস্যদের শেয়ার ক্রয় বাবদ ঋণ:

৩। কার্যকরী মূলধন বাবদ ঋণ:

৪। ন্যাবার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে মূলধন:

৫। ন্যাবার্ড প্রকল্পে প্রদত্ত কার্যকরী মূলধনের সুদের উপর ভরতুকি :

৬। উন্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ঋণ ও অনুদান:
৭। সমবায় সমিতির কর্মরত সদস্যদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প:
৮। সমিতির সদস্যদের গোষ্ঠীবীমা প্রকল্প:
৯। তন্তুবায়দের জন্য কর্মশালা ও গৃহনির্মাণ প্রকল্প:
১০। তন্তুবায়দের জন্য স্বাস্থ্যপ্রকল্প:
১১। উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের উপর অনুদান:
১২। দীন দয়াল হাত চরখা প্রোৎসাহন যোজনা:
১৩। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা:
১৪। রাষ্ট্রীয় শ্রমবিকাশ যোজনা:

পুরুলিয়া জেলার তাঁত শিল্পের প্রধান সমস্যা:

১। এই জেলার অধিকাংশ তাঁতশিল্পী কৃষিকর্মের পাশাপাশি তাঁত বোনার কাজ করেন। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে তাঁত বোনায় শিল্পীদের অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে জেলার বেশ কিছু সমবায় সমিতি চরম সংকটের মুখে এবং বেশ কিছু সমবায় সমিতি বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া এই শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীগণের দক্ষতা খুবই কম থাকায় মজুরি খুবই সামান্য—ফলে অনেকের অন্য পেশায় যুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

২। তাঁত সমবায় সমিতিগুলির সমস্যার আর একটি উৎস হল অভ্যন্তরীণ কলহ ও সাংগঠনিক দুর্বলতা। এর ফলে এই জেলার বেশ কিছু সমিতি বন্ধ হয়ে গেছে।

৩। বিপনন সমস্যা এই জেলার তাঁতশিল্পের একটা প্রধান সমস্যা। এই জেলার মোটা সুতোর তাঁতবস্ত্র সামগ্রীর গুণগত মান ও বৈচিত্র্য খুবই নিম্নমানের হওয়ার জন্য উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা চিরকালের সমস্যা।

৪। ন্যাবার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা সমবায়-ব্যাংক থেকে সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ন্যাব্যার্ড নর্মসের সরলীকরণ না হওয়ার ফলে জেলা সমবায় ব্যাংক থেকে সমিতিগুলি মূলধন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৫। তসর বস্ত্র বয়নে কোনোরূপ নক্শা না থাকার জন্য তা বিপননে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকারি পদক্ষেপ ঃ

১। সুতি ও তসর বস্ত্রের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁতিদের কলকাতার উইভার্স সার্ভিস সেন্টার-এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে এলাকার তন্তুবায়গণ চিরাচরিত বস্ত্র উৎপাদন না করে বাজারমুখী বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। তাছাড়া কয়েকটা ক্ষেত্রে সরকারি নক্শা কেন্দ্র (কম্পুটারাইজড) থেকে নক্শা নিয়ে সেই মোতাবেক বস্ত্রে বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যে বস্ত্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। বিপনন সমস্যার জন্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন জেলায় তাঁতবস্ত্রের মেলা কয়েক বৎসর যাবৎ চালু করা হয়েছে। সেই মেলায় এই জেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতি অংশগ্রহণ করছে ফলে তাহাদের বিপনন সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে। এ ছাড়া আগামী আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০০৩ মাসে এই জেলার একটি সমবায় সমিতি তাদের উৎপাদিত তসর বস্ত্র নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত 'দিল্লি হাটে' অংশগ্রহণ করবে।

আমরা আশা রাখি এই হাটে তসরবস্ত্রের ভালো বাজার পাওয়া যাবে।

৩। এছাড়া বিগত বৎসরে তিনটি সমবায় সমিতি Hand-Loom Development Centre, একটি সমবায় সমিতি Quality Dyeing Unit এবং একটি সমবায় সমিতিকে Project Package Scheme দেওয়া হয়েছে। তসরও রেশম বস্ত্রে উৎকর্ষতা ও নকশার বৈচিত্র্য আনার জন্য দুটি সমবায় সমিতিতে ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার তাঁতশিল্প সম্বন্ধে কিছু তথ্য:

১।	মোট তাঁতসংখ্যা	৩৪২১
২।	তাঁতশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৫১৩২
৩।	মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা	৬০৭
৪।	সমিতিভুক্ত মোট তাঁতসংখ্যা	৩০৭১
৫।	চালু সমবায় সমিতির সংখ্যা	১৩
৬।	চালু সমবায় সমিতির মোট তাঁতসংখ্যা	১৭১৩
৭।	বন্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা	৪৩
৮।	তাঁতহীন তন্তুবায় সমবায় সমিতির সংখ্যা	২
৯।	তাঁতহীন চালু সমবায় সমিতির সংখ্যা	নেই
১০।	পেনশনপ্রাপক তাঁতশিল্পীর সংখ্যা	২০৯
১১।	গোষ্ঠীবীমা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১৫৯
১২।	ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা—	৪৬১
১৩।	স্বাস্থ্য প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা—	১৫৮
১৪।	তাঁতগৃহ নির্মাণ প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা—	১৬৫

২০০১-০২ আর্থিক বর্ষে বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি সাহায্যের খতিয়ান:

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমাণ	উপকৃতের সংখ্যা
১।	প্রোজেক্ট প্যাকেজ স্কিম:		
	(ক) রাজ্য সরকারের অনুদান	3,75,000/-	
	(খ) রাজ্য সরকারের ঋণ	1,50,000/-	১টি সমিতি
	(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ	75,000/-	
২।	তাঁতবস্ত্র প্রতিযোগিতা পুরস্কার (Award of Prizes.)	4,400/-	১২জন শিল্পী
৩।	কর্মশালা নির্মাণ প্রকল্প	1,27,000/-	১৬জন শিল্পী
৪।	কার্যকরী মূলধনের সুদের ভরর্তুকীর	3,34,246/-	৭টি সমিতি
৫।	M. D. A স্কিম রাজ্য-সরকারের শেয়ার	2,32,376/-	৮টি সমিতি
৬।	উন্নত বস্ত্র ট্রেনিং প্রোগ্রাম	2,48,750/-	৪৬জন শিল্পী
৭।	বস্ত্রমেলায় যোগদানের ভরর্তুকি	20,000/-	২টি সমিতি

৮।	পেন্‌শন্‌ স্কিম	7,30,800/-	১৫৩জন সদস্য
৯।	Common Facility সেন্টার	5,00,000/-	১টি সমিতি
১০।	ভবিষ্যনিধি প্রকল্প	12,800/-	২০৪জন শিল্পী

২০০২-০৩ আর্থিক বর্ষে বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি সাহায্যের খতিয়ান :

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমাণ	উপকৃতের সংখ্যা
১।	সদস্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প রাজ্য সরকারের শেয়ার	16,800/-	১৬৮জন সদস্য
২।	M. D. A. স্কিম কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার	35,070/-	৯টি সমিতি
৩।	M. I. স্কিম রাজ্য সরকারের শেয়ার	77,700/-	৭টি সমিতি

পুরুলিয়া জেলার লাক্ষা শিল্প—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

পিনাকী রঞ্জন রক্ষিত

রাজ্য পুনর্গঠনের কমিশনের রাজনৈতিক বদান্যতায় অধুনা অবলুপ্ত মানভূমের অঙ্গচ্ছেদজনিত পুরুলিয়া জেলাব গঠন এবং পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর। অতিক্রান্ত বৎসরের হিসেব অতএব প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। হাঁটি হাঁটি পা পা করে বয়স এগোলেও কোনো এক জেলার ইতিহাসে পঞ্চাশ বৎসর অবধিকাল সমৃদ্ধির দাবি রাখে। নৈরাশ্যের কথা এতদাবৎ—এই জেলাতে উদারহণযোগ্য কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় উদ্যমের অভাব এবং হয়তো বা সরকাবি নির্লিপ্ততা অবহেলিত জেলার মানুষকে আর্থিক দিক থেকে দরিদ্রতর করে রেখেছে। ছোটনাগপুর মালভূমির কোল ঘেঁষে নদ-নদী, পাহাড়-টিলা, বন-বাদাড় বুকে নিয়ে পুরুলিয়া স্বৈরিণী। আবার এই ভূখণ্ডের জঠরে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ যেন রত্নগর্ভা। সরকারি পরিসংখ্যানে তারই সন্ধান পাওয়া গেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এই জেলাতে সংশ্লিষ্ট কোনো শিল্পও গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ জমানার সময় বা তার আগে থেকেই কয়েকটি কুটির শিল্প ব্যক্তিগত বা যৌথ মালিকানায় গড়ে ওঠা জেলার অর্থনীতিকে খানিকটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। লাক্ষা শিল্প তারই এক উদাহরণ এবং এই জন্যই আঞ্চলিক অর্থনীতিতে লাক্ষা শিল্পের একটা স্থান রয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা, তুলিন, বলরামপুর অঞ্চল—লাক্ষাচাষ, প্রসেসিং, বিদেশে রপ্তানিযোগ্য গালা তৈরি করার জন্য বিশেষ রূপে চিহ্নিত। শুধু দেশের ক্ষেত্রে নয়, মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপীয় তথা এশীয় দেশেও এই জেলার লাক্ষা শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেলার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প হচ্ছে বিড়ি শিল্প। এছাড়া আগর, বাটালি, কাঁচি, ছুরিগুপ্তি, হাতুড়ি তৈরিও উল্লেখনীয় আর একটি কুটির শিল্প। তবে তা স্থিতিশীল কুটির শিল্পের সমগোত্রীয় নয়। তবু এই সমস্ত কুটির শিল্প কর্মসংস্থান ও জীবিকার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। অতীত এখানে কথা কয়। **পুরুলিয়া জেলার লাক্ষা শিল্পের ইতিহাসে আর্মেনিয়ান সাহেবদের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাই স্মরণ করতে হয়।** কারণ সুদূর পারস্য দেশ থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার হয়ে আসা এই কতিপয় সাহেব এসে কানপুরে ব্যাবসা স্থাপন করেন—ভারতে লাক্ষা শিল্পের সূচনা করে ক্রমে এই শিল্পটিকে আমেরিকা, জার্মানি, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, কায়রো তথা বিশ্বের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান করে দিতে হবে সক্ষম হওয়ার ফলে বর্তমানে লাক্ষা/গালা রপ্তানি করে ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর মোটা অঙ্কের বিদেশি মুদ্রা আনেন। পারস্য শহরের এক অখ্যাত

গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের স্বল্পশিক্ষিত তরুণ ঝালদাতে এসে লাক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন—ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যক্তির নাম এ. এম. আরাথুন সাহেব। তিনি ঝালদাতে আসেন ১৮৯৭ সালে যখন পুরুলিয়া শহরে রেলওয়ে স্টেশন ছিল না—ঝালদা আসতে হত "পুশ-পুশ" গাড়িতে (হাতটানা বড়ো রিক্সার মতো— গোরুর গাড়ির মতো ছাউনি দেওয়া) দুজন লোক ঠেলত—একজন সামনে ঠিক হাত রিক্সার মতো টেনে নিয়ে যেত।

পুরুলিয়া থেকে ঝালদা—৩০ মাইল রাস্তা ভালো ছিল না, শহর ছিল না—ছিল কতকগুলি কুঁড়েঘর। এই সাহেবও এসেই কুঁড়েঘরে থাকতে লাগলেন। কোম্পানির নাম হল এ. এম. আরাথুন প্রাইভেট লিমিটেড। ক্রমে শিল্পের রমরমা দেশে-বিদেশে শিল্পের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। তারপর হস্তান্তর। এই কুঠির বর্তমান মালিক সমর সিং জয়সওয়াল এবং কুঠিটির ভবিষ্যৎ নেই—শুধু চলছে।

লাক্ষাচাষের গোড়ার কথা বলতে গেলে বলা যায় পূর্বে লাক্ষার কোনো চাষ হত না—অরণ্য অঞ্চলে কোনো কোনো গাছে লাক্ষার বীজ পোকার পক্ষীবাহিত-বায়ুবাহিত ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপায়ে ডালে ডালে লার্ভা সঞ্চারিত হত। ক্রমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই বস্তুটি আহরণ করে শহরে নিয়ে এলে— এই লাক্ষা বীজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ক্রমে মানুষ এর চাষ করতে শুরু করে। এরপর বনজঙ্গল ঘেরা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার দারিদ্র মানুষ, মাহাতো, কুমার, মুড়া-মানকি, মাকি সম্প্রদায় নিজেদের রায়তি জমির ওপর বেড়ে ওঠা কুল, পলাশ, কুসুম, ডুমুর ইত্যাদি গাছে লাক্ষাবীজের কাঠি বেঁধে দিয়ে সেই যে অতীত থেকে এব চাষ শুরু করেছিল যা বর্তমানেও একই ভাবে চলছে। শিল্প স্থাপনের উষালগ্নে লাক্ষার চাষ কম হত—পরে এই চাষ জীবিকা অর্জনের অন্যতর উপায় বলে পরিগণিত হতে লাগল। প্রথমত লাক্ষা স্থানীয় বাজার বা অন্যান্য বাজারে কেনাবেচা হত। শিল্প গড়ে ওঠেনি—কুঠি স্থাপিত হয়নি। ক্রমশ গালার প্রয়োজনীয়তা মানুষ বুঝতে পারল—বাজার গড়ে উঠল এবং বাজারের প্রয়োজনে লাক্ষার প্রসেসিং শুরু হল। গোড়াতে সব কাজটাই ছিল Manual. যেমন লাক্ষার কাঠি (লাক্ষাযুক্ত গাছের ডাল ছোটো ছোটো করে কাটা) শিল নোড়া বা জাঁতার সাহায্যে গুঁড়ো করা— তারপর ওই গুঁড়ো বা দানাকে হাথালি (চৌবাচ্চা/নাদ) তে ঢেলে জল দেওয়া এবং পায়ে ক্রমাগত ঘষে ঘষে লাক্ষার রং-জল বের করে দানার শুদ্ধিকরণ করা হত। পরে পরিষ্কৃত দানাকে হালকা রোদে শুকিয়ে—চালনি দিয়ে অন্যান্য বর্জ্য পদার্থকে আলাদা করে ফিল্টার (filter) কাপড়ের তৈরি লম্বা লম্বা থলিতে পরিশোধিত দানাকে ভরে ভাটার নির্দিষ্ট তাপের আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গালার চাপড়াকরণ পদ্ধতিই প্রাচীন পদ্ধতি। বলা বাহুল্য, আধুনিকীকরণের যুগেও প্রতিটি কুঠিতে পাশাপাশি প্রাচীন পদ্ধতি বর্তমান এবং এই পদ্ধতি চলতে থাকবে।

আধুনিকীকরণের মধ্যে হাইড্রলিক প্রেস মেসিন, ক্রাশার মেশিন (লাক্ষাবীজ গুঁড়ো করার জন্য) , অটোম্যাটিক ওয়াশার মেসিন ইত্যাদি বসানোর ফলে গালা তৈরির কাজকে আরও পরিশুদ্ধকরণ ও ত্বরান্বিত করেছে। লাক্ষাচাষের প্রাচীনতম ইতিহাসের সাক্ষী বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বর্তমানে এখানে এমনকি বাঁকুড়া জেলাতেও লাক্ষার চাষ হয় না। পূর্বে এই শিল্পটি ছিল বাঙালিদের হাতে এবং বাঙালি মালিকানায়। সোনামুখীতে এই কুটির শিল্পের উৎপাদিত সম্ভার স্থানীয় বাজার এবং লোকের ব্যবহার্যরূপে অর্থাৎ গালা থেকে চুড়ি/রুলি (মোটা শাঁখার মতো), আলতা, বার্নিশ বিভিন্ন রং তৈরি করা এবং অন্যান্য কাজে লাগত। এই শিল্পের ইতিহাস বলে যে মির্জাপুর থেকে ব্যাবসামনস্ক লোকজন সোনামুখীতে এসে গালা তৈরির পদ্ধতি শিখে মির্জাপুরে তা চালু করে।

ক্রমে সাহেবরা এদেশে এসে এই শিল্পের বাজার তৈরি ও প্রসার করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। বর্তমানে মির্জাপুরে থাকলেও সোনামুখীতে এই শিল্পের চিহ্ন নাই। লাক্ষা চাষ এবং প্রসেসিং অর্থাৎ গোলাকরণ প্রক্রিয়ায় পুরুলিয়া জেলার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে এই শিল্পের প্রসার নেই বললেই চলে। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা, তুলিন ও বলরামপুরের সমগ্র দেশের প্রায় ১০ শতাংশ উৎপাদন এই জেলাতেই হয়ে থাকে। লাক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে তাই পুরুলিয়া জেলার উপস্থিতি উজ্জ্বল।

সরকারি উদ্যোগ এই জেলাতে কিছু আছে যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাষিদের উৎসাহ প্রদান, আর্থিক উন্নতি এবং শিল্পের প্রসারের কথা মাথায় রেখে এই জেলার ঝালদা, তুলিন, মানবাজার, বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর, রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ি, পুঞ্চাপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলে লাক্ষা বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন এবং এইসব কেন্দ্রে দরিদ্র চাষিদের জন্য লাক্ষাবীজ বিতরণও করা হয় কিন্তু পরিহাস এমনি নিষ্ঠুর যে গোদামজাত ওইসব লাক্ষাবীজ কাঠিতে লাক্ষার পোকা বিতরণের পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যায় যার ফলে লার্ভার অভাবে বীজ কাঠিতে লাক্ষা জন্মে না। চাষিরা তাই অনেক কম মূল্যে ওই বীজহীন লাক্ষা বাজারে বিক্রি করে দেয়—সরকারের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং চাষেরও কোনো কাজ হয় না।

এছাড়াও সরকার দরিদ্র চাষিদের কথা ভেবে সমবায় বিপণন সংস্থা/সমিতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত এবং উচ্চমূল্যে (অর্থাৎ কে.জি. প্রতি তিনটাকা—যেখানে বাজারদর প্রতি কেজি ১.৫০ পয়সা ছিল) চাষিদের কাছ থেকে লাক্ষা ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন—বিগত ১৯৭৫-৭৬ সালে যখন লাক্ষার প্রভূত ফলন হয়েছিল এবং স্বভাবতই লাক্ষার মূল্য খুব পড়ে গেছিল। প্রচুর ফলনের জন্য সেই সময় অনেক গালাকুঠি খুলেছিল এবং ঝালদা, তুলিন, বলরামপুরে এই সংখ্যা ছিল ১২০ থেকে ১৪০ যা বর্তমানে অনেকগুলোই বন্ধ হয়েছে—অনেক কুঠি রুগণ অবস্থায়, কয়েকটা শ্লথ গতিতে চলছে। কোনো কারখানারই আর রমরমা নেই যদিও বর্তমানে কেজি প্রতি লাক্ষার দর ৭০/৮০ টাকা। কলকাতা শহরে গালার ভালো বাজার আছে এবং রপ্তানি ব্যবস্থাও অনুকূল। Lac Export Promotion Council সংস্থার মাধ্যমে গালার গুণগত মান নির্ধারিত হয় এবং তদনুসারে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এব্যাপারে এই Council অথবা রাঁচীর Lac Research Institution গালার গুণগত মান পরীক্ষা করে Certificate দেন এবং এই ছাড়পত্র বিদেশের ক্রেতাগণ মান্যতা দিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থা পূর্বেও চালু ছিল বর্তমানেও আছে।

ভারতের অন্যান্য কিছু রাজ্য বর্তমান ঝাড়খণ্ডের চাতরা অঞ্চলে (হাজারিবাগ), রাজস্থানে লাক্ষাচাষ হয় এবং রাজস্থানে গালা তৈরির কুঠিও রয়েছে। ঝালদা শহর থেকে ৪৫০ মাইল এবং কলকাতা থেকে ২৩০ মাইল দূরে মির্জাপুর শহর। সাহেবরা মির্জাপুরেও গালা তৈরির কুঠি স্থাপন করেন স্থানীয় কুঠিয়ালদের সহযোগিতায় এবং কলকাতা বন্দর থেকেই জাহাজে করে বিদেশে গালা রপ্তানি হত। বর্তমানেও কলকাতা, মুম্বাই থেকে গালা রপ্তানি করা হচ্ছে।

ছোটোনাগপুর পাঁচ পরগনাতে লাক্ষার চাষ উল্লেখযোগ্য। বিহারের সমস্তিপুরে আছে গালা তৈরির কারখানা। ঝালদার সন্নিকটবর্তী অঞ্চল যথা, রাঁচী, মুড়ঙ্গ, ডালটনগঞ্জ, লাতেহার লাক্ষাচাষের উৎকৃষ্ট এলাকা পালামৌ লাক্ষাচাষের বিশেষ অঞ্চল।

দেশে ও বিদেশে গালার প্রয়োজনীয়তা অতীতেও ছিল (মহাভারতের লাক্ষাগৃহ) বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বর্তমানে লাক্ষার দাম প্রতি কে.জি. ৭০/৮০ টাকা তাই লাক্ষাকে গ্রামের ঘর-গৃহস্থের মানুষেরা বলে সোনা। অতএব, লাক্ষা চাষের উদ্যোগকে প্রসারিত করার জন্য

সরকারকে উৎসাহ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। বর্তমানে রুগণশিল্পটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে বেগমান করে তুলতে হবে কেননা, এই লাভজনক শিল্পের মৃত্যু নেই। Lac Export Promotion Council-কে আরও প্রাণবন্ত করে চাষি তথা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের হাত শক্ত করতে হবে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশি মুদ্রা আনয়নের পথ তবেই সুগম হবে। গালার অবিসংবাদিত প্রয়োজনীয়তা দেশের বিভিন্ন শিল্পে যথা রং তৈরির কারখানা, জুতোর চামড়ার কাজে বিভিন্ন ট্যানারিতে, বার্নিশের কাজে, ক্যাপসুল তৈরির কাজে, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হাতের চুড়ি, বন্দুকের কারখানায়, জাহাজের পাটাতনে (গুরুত্বপূর্ণ) লাক্ষার দানা এবং পরিশোধিত গালা অপরিহার্য। গালার bye-product বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে—গ্রামাফোন রেকর্ড তৈরি, আলতা, বার্নিশ প্রভৃতি উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।

লাক্ষাচাষের ফসল বৎসরে দুবার করা হয়। আশ্বিন মাস ও বৈশাখ মাস। লাক্ষা ফলনের পক্ষে প্রধানত বাধা স্থানীয় জলবায়ু। আবহাওয়া। চাষিরা আপ্রাণ চেষ্টা করে ফসলের জন্যে— কিন্তু হঠাৎ করে কুয়াশা বা অত্যধিক রৌদ্র এসে লাক্ষার বীজ ধ্বংস করে দেয়—লাক্ষাকীট বাড়তে পায় না—ফলত নৈরাশ্যজনকভাবেই ফলন কমে যায়। প্রতিকূল জলবায়ুর কারণে বিগত তিন বছর ভালোভাবে লাক্ষা চাষ করতে পারা যাচ্ছে না। গত দশ বছরে লাক্ষার উৎপাদন সারণি :

সারণি—১

ছড়ি লাক্ষার উৎপাদন (মেট্রিক টন)

বৎসর	ভারতবর্ষ	পশ্চিমবাংলা	পুরুলিয়া
১৯৯২-৯৩	১১,৬৮৫	১,৪৫৫	১,৩৩৯
১৯৯৩-৯৪	২০,৫২০	২,৯৬৬	২,৮০৭
১৯৯৪-৯৫	২২,৪৫০	৩,২৪৫	২,৫২৫
১৯৯৫-৯৬	২০,০৫০	২,২৩৮	৯৫৮
১৯৯৬-৯৭	১৯,৭৫৫	২,৮৩০	১,৪৮০
১৯৯৭-৯৮	১৫,৮৪৬	২,২৭৮	১,৯৯৮
১৯৯৮-৯৯	১০,৩৫৫	২,০৭০	১,৮৫০
১৯৯৯-২০০০	১১,৯৫৪	৯৮৫	৯৫৫
২০০০-২০০১	২০,৬০০	১,২৬০	১,১২১
২০০১-২০০২	২৬,৪৫০	১,৩৫০	১,২২৮

হয় বিদেশি অর্থাৎ রপ্তানি মূল্যের মানদণ্ডেই। প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে উৎপাদন অনেক কম। লাক্ষার কেজি প্রতি ৭০/৮০ টাকা। বিভিন্ন মানের বটম (buttom) গালা কেজি প্রতি ১৪০ টাকা থেকে ১৬০ টাকা। দানা (Seed Lac) কেজি প্রতি ১১০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা। চাপড়া (Shellac) প্রতি কেজি ১৪৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। ভারতবর্ষের মতো দেশে লাক্ষা উৎপাদনের তুলনায় বিদেশি চাহিদাও অনেক বেশি ফলে শিল্পটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উন্নতধরনের মেশিন বসাতে পারলে রপ্তানিযোগ্য গালার মূল্য কেজি প্রতি ৩০০ টাকাও পাওয়া যেতে পারে। এই মেশিনের

অভাব এদেশে আছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে পূর্বে দেশের উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ গালা বিদেশে রপ্তানি হত। স্থানীয় বাজার ছিল ৪০ ভাগ। বর্তমানে কিন্তু রপ্তানির ভাগ ৪০ এবং স্থানীয় বাজারের চাহিদা শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। গত দশ বছরে দেশের উৎপাদন ও বাণিজ্য চিত্র :

সারণি—২

ভারতবর্ষের ছড়ি লাক্ষার উৎপাদন ও বাণিজ্য

বৎসর	ছড়ি লাক্ষার উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বাণিজ্য (মেট্রিক টন)	মোট আয় (টাকা—লক্ষতে)
১৯৯২-৯৩	১১,৬৮৫	৫,৯৭৮	৫,২৬৩·০০
১৯৯৩-৯৪	২০,৫২০	৮,২২০	৮,৮৫৭·০০
১৯৯৪-৯৫	২২,৪৫০	৭,২৫৭	৭,২৭৭·০০
১৯৯৫-৯৬	২০,০৫০	৮,৯৬৩·২২	৯,৯৭১.০০
১৯৯৬-৯৭	১৯,৭৫৫	৯,২৫৯·২৯	৯,৩৮৪·০০
১৯৯৭-৯৮	১৫,৮৪৬	৯,৯৪৪·০১	৬,৫০৭·০০
১৯৯৮-৯৯	১০,৩৫৫	৭,৬২৪·৬৬	৬,৯৯৫·০০
১৯৯৯-২০০০	১১,৯৫৪	৬,৮৬১·৫৬	৭,৯৯৩·০০
২০০০-২০০১	২০,৬০০	৫,৬৭০·৩৪	৯,৩৭৪·০০
২০০১-২০০২	২৬,৪৫০	৭,০১৫·৫৯	৪,০০০·০০

একদা পুরুলিয়া জেলার গালা শিল্প এত প্রসারিত ছিল যে, ঝালদা শহরকে বলা হত লাক্ষা শিল্পের আঁতুড়ঘর। ঝালদা, তুলিন ও বলরামপরে কুঠির সংখ্যা বর্তমানে নগণ্য। ঝালদা শহরে উল্লেখযোগ্য তৎকালীন কুঠির সংখ্যা নিম্নরূপ— ছোটোখাটো কুঠি থাকলেও তা টিম টিম করে চলছে। কুঠিগুলোর বর্তমান অবস্থা—

(১) এ. এম. জর্ডন অ্যান্ড কোং : এই কুঠি বড়ো সাহেবের কুঠি বা মীন সাহেবের কুঠি নামেই পরিচিত ছিল। কুঠিটি ৪/৫ বৎসর থেকেই বন্ধ— খোলার সম্ভাবনা নেই। শ্রমিক নিরন্ন। পৃথকভাবে নিম্নে এর পরিচয় দেওয়া হল।

(২) অচ্ছুরাম খালকফ্ কোম্পানি: অচ্ছুরাম বেহেল/ মোহনলাল বেহেল এবং খালকফ্ সাহেবের যৌথ মালিকানায় এই কারখানা ছিল অত্যন্ত উন্নত ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। খালকফ্ ছেড়ে দেওয়ায় এবং আইনের ঘেরাটোপে বন্দি এই কারখানা আজ প্রায় ৫/৬ বৎসর থেকেই বন্ধ। বাজারে প্রচুর দেনা। মালিক মারা গেছেন। খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই। শ্রমিক বেকার।

(৩) লকাস সাহেবের কুঠি: ঝালদার নামো পাড়াতে সদম্ভে কুঠি চলছিল। বর্তমানে কুঠির বাড়িঘর, কারখানা সব ফুটবল খেলার মাঠে পর্যবসিত। ঝালদার শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই। খোলার তো কোনো কথাই নেই।

(৪) এঞ্জেলো কুঠি: খুঁখড়ি সাহেবের কুঠি বলেই চিহ্নিত। ২০ বৎসর পূর্ব থেকেই বন্ধ। খোলার কোনো কথা নয়। শ্রমিক মাথা ঠুকলেও নয়—শ্রমিক নেতারা কি বলবেন জানা নেই।

(৫) মাদ্রাজ সেলাক (shellac) ফ্যাক্টরি : ১৯৭৮ থেকেই বন্ধ। খোলার স্বাপ্নিক সম্ভাবনাও নেই।

(৬) এম. পি. কে. পি. ফ্যাক্টরি : ৫ বৎসর থেকে বন্ধ। বর্তমানে মালিক রতনলাল লোহারিওয়ালা। খোলার সম্ভাবনা নেই বলা চলে না।

উপরিউক্ত প্রতিটি কারখানাতে ২০ থেকে ৪০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত থাকত। বড়ো কুঠির শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫০০। এছাড়া ছোটো ছোটো অন্যান্য কুঠিতেও সব মিলিয়ে কয়েক সহস্র শ্রমিক কাজ করতেন—তাঁরা আজ সুদীর্ঘ বৎসর থেকেই বেকার শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ জীবনের বিশেষ অধ্যায় নিয়োজিত ছিল ওই সমস্ত গালাকুঠিতে। শিল্পের ভবিষ্যৎ থাকলেও শ্রমিকদের এই বিধিলিপি।

ঝালদার বড়োকুঠির কথা সাত কাহন করে বলার থাকলেও প্রবন্ধে তার পরিসর স্বল্প। তবু এই কুঠির কথা উল্লেখের দাবি রাখে এইজন্য যে এই বড়ো কুঠির স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উপরিউক্ত আর্মেনিয়ান সাহেব এ. এম. আরাথুন—যিনি "ঝালদা আরাথুন" নামে পরিচিত ছিলেন এই ক্ষুদ্র শহরে। গালা শিল্পের ইতিহাসে এই সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে কারণ তাঁরই একনিষ্ঠ প্রয়াস কৃচ্ছ্র সাধন এবং ঝালদার জনগণের প্রতি ভালোবাসা—একদা শিল্পে দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ১৯৫৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং এইচ.এম. নাদজরিয়ান H.M. Nadjarian সাহেব লিখিত আরাথুন সাহেবের আত্মজীবনী যেমনি বিস্ময়কর তেমনি সুদৃঢ় সংকল্পে সমৃদ্ধ।

বর্তমানে এই আরাথুন সাহেবের বড়ো কুঠি কবেই অন্য মালিকানায় চলে গেছে যার বর্তমানে মালিক সমর সিং জয়সোয়াল। কারখানাটি শুধু চলছে বলা চলে এবং একেবারে উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

সাম্প্রতিক কালে যে কয়েকটি ছোটো-বড়ো গালাকুঠি ঝালাদাতে চলছে তাদের বিবরণ নিম্নরূপ:

(১) সমর সিং জয়সোয়ালের উপরি উক্ত বড়ো কুঠি—

(২) সীমা লেক ইন্‌ড্রাস্ট্রিজ : কারখানাটি বরাবর চলে আসছে। তরুণ মালিক শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দত্ত। ব্যাবসাটির প্রতি টান আছে আর লাক্ষা শিল্পের প্রতি নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। ভবিষ্যৎও আছে।

(৩) কেশরী ইন্ডাস্ট্রিজ : ৭/৮ জন শ্রমিক নিয়ে কুঠি চলছে — প্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।

(৪) জালান কুঠি: কুঠির মালিক পি. ডি. জালান। জালান সাহেবের কন্যার পুত্রগণ ৫/৬ জন শ্রমিক নিয়ে কুঠি চালাচ্ছেন। এঁদের অন্যান্য ব্যাবসাও রয়েছে—তাই কুঠিটির বিশেষ কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

(৫) সুরেশ ভগতের মালিকানায় ৫/৬ জন শ্রমিক নিয়ে কুঠি চলছে। কুঠির প্রগতি, সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করছে মালিকের ওপর।

(৬) ঝালদার সন্নিকটবর্তী পাটঝালদা গ্রামে বিলাস চন্দ্র সাহুর মালিকানায় ১০/১২ জন শ্রমিক নিয়ে গালা কুঠি একটা চলছে। সম্ভাবনাসমৃদ্ধ নয় বলে বলা চলে না।

অন্যান্য ছোটো-মাঝারি কুঠি যেগুলো রুগ্ন তার একটা নৈষ্ঠিক সমীক্ষা প্রয়োজন। সরকার

পুরুলিয়া জেলাকে যদি কুটির শিল্পসমৃদ্ধ করার লক্ষ রাখেন তাহলে গালা শিল্প শ্রমিক সংস্থান তথা আর্থিক সংস্থান হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

উপসংহার :

সমগ্র পৃথিবীর জমিদার ৫০ শতাংশেরও বেশি লাক্ষা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে সরবরাহ হয়। লাক্ষার প্রযুক্তিগত গবেষণার ৯০ শতাংশেরও বেশি বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের অবদান। যেহেতু লাক্ষার বিভিন্ন ব্যবহারকে ভিত্তি করে দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো বাজার গড়ে ওঠেনি তাই ভারতের সমগ্র উৎপাদনের বেশিরভাগই বিদেশে রপ্তানি হয়। বিদেশে রপ্তানির ওপর এই শিল্প নির্ভরশীল।

পেট্রোলিয়ামজাত সংশ্লেষিত পলিমারের ভাণ্ডারে একদিন টান পড়তে পারে যদি পেট্রোলিয়াম সহজলভ্য না হয় কিন্তু লাক্ষার ভাণ্ডার নিঃশেষিত হবে না। লাক্ষা শিল্পের স্বার্থে লাক্ষাকীটের চাষযোগ্য গাছগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখা দরকার। প্রয়োজন লাক্ষা চাষ ও ব্যবহারের বৃদ্ধি, লাক্ষার উপযোগিতার প্রচার ও প্রসার এবং সচেতনতা বাড়ানো যাতে প্রকৃতির দান এই অনন্য বস্তুটি সামগ্রিক অবহেলায় হারিয়ে না যায়। দেশে ও বিদেশে গালার প্রয়োজনীয়তা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই শিল্পকে রক্ষা করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ।

পুরুলিয়া-ভ্রমণ

প্রজ্ঞাবর্মা

আসুন, ঢেউখেলানো নীল পাহাড়ের দেশ পুরুলিয়ায়। সিঁড়ি ভাঙা—অঙ্কের মাঠ, লাল মাটি, খোয়াইয়ের গৈরিক ল্যান্ডস্কেপ, প্যাচপ্যাচে ঘামহীন, রোদজ্বলা দুরন্ত দুপুর, অথবা বর্ষায় কাদার দুর্ভোগ ছাড়া দিগন্তবিথারী অরণ্যের শ্যামশ্রী-দর্শনে ফুরফুরে মেজাজ ছন্দমুখর হয়ে উঠুক— পাহাড়ি নদীর কলোচ্ছ্বাসে। সব মিলিয়ে ভালোবাসার আবেশে, মায়াজাগানো অথচ তপ্তমধুর পুরুলিয়া।

নয়নরম্য মুগ্ধতা শুধু নয়, এ জেলায় সঞ্চিত আছে কয়লা, তামা, চুনাপাথর, কালোপাথর, ডলোমাইট, কোয়ার্জ, ফেল্সপার প্রভৃতি খনিজ পদার্থ। শিল্প (Industry) গঠনে এ জেলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বর্তমান রাজ্য সরকারের সদর্থক উদ্যোগে তার শুভবার্তা নানাভাবে আশাসঞ্চারী।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়নাভিরাম ললিতকঠোর অপরূপ রূপের পাশাপাশি এ-জেলার লোকসংস্কৃতির বহুমাত্রিক ঐশ্বর্য আমাদের মুগ্ধবিস্মিত করে। তাই খরার জেলা-অভিধা আপতিক সত্য, প্রকৃত সত্য নয়। কারণ, অতুল প্রাণসম্পদে ভরপুর, সারল্যে মাখা পুরুলিয়ার রূপ-রস-ছন্দ রসিক তথা সুধীজনের রসবোধের অপেক্ষা রাখে যে।

চৈত্র-বৈশাখ মাস। পুরুলিয়ার লাল মাটি ঝল্সে তামা রঙ! অথচ সে-সময়েই পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার শাখায়-শাখায় রঙিন প্রাণের পুষ্পিত উচ্ছ্বাস! সুবাস-ছড়ানো রেশমিকোমল, ঘি-রঙা পেলব শিরিষকুসুম, হলুদ সোঁদাল মঞ্জরি, জারুল ফুলের গোলাপি স্তবক আর গৌরবর্ণা গর্ভবতী নারীর স্তনাগ্রের মতন নিটোল - টসটসে মহুয়ার স্বাদেগন্ধে ইন্দ্রিয়ঘন মদির যৌবনের তপ্ত আবেশ! তখনই পুরুলিয়ার আদিবাসী যুবকের কণ্ঠে মাঠেঘাটে কিংবা অরণ্যছায়ায় শোনা যায় রঙের ঝুমুর কলি — 'ওলো, খরিস সাপের ফণা/ ও তুই ছুঁয়ে দে না/ ঘর বিকি জমি বিকি/ তখে দিব গহনা।' কিংবা 'তুই হামার সরু সিঁথা/ তুই হামার আয়না চিরুনি গো/ তোর আড়ে আড়ে চরা হাসি/ হামি বড় ভালবাসি/ সেই হাসিতে ভরেছে গো মন/ তোর ভালবাসায় জুড়ায় এ জীবন.........।'

প্রায় সারারাত নাচনি নাচের রসের ঠমকে খরার দেশে জাগে যৌবনের ঢেউ! যৌবনবতীর লাস্যবেশ, নাচের বিচিত্র মুদ্রায়, দ্বিধা থরো থরো যৌবন-অমরাবতীর সাত চূড়া ওঠে দুলে। সে এক রসের জগৎ।

বিখ্যাত 'পালমৌ' ভ্রমণকাহিনিতে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গাঙ্গেয় অঞ্চলের গড়পড়তা বাঙালির পাহাড় না-দেখা বিস্ময় ও অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। অথচ সুদূর হিমালয় না-গিয়েও নিকট দূরে দেখতে আসুন অযোধ্যার শৈলশ্রেণি, যা দলমা রেঞ্জের নীলাভ সুষমার ইঙ্গিত দেয়। আর আছে

জয়চণ্ডী শৈলমালা, বেড়ো থেকে পঞ্চেত অবধি পঞ্চকোট শৈলশ্রেণি। আর বান্দোয়ান তো পাহাড়ের মালাগাঁথা! অজন্তা-ইলোরা নয়, পুরুলিয়াতেই আছে শিল্পী-ভাস্করের লীলায়িত ছন্দ—'পাখি-পাহাড়'!

পলাশ-কুর্চি-কুসুম-শালবনে নতুন পাতার সতেজ লাবণ্যের ঢেউ জাগে খেটে-খাওয়া আদিবাসী মানুষের মনে। তখন তাঁরা খরার জ্বালাকে ভুলে, আধপেটা খেয়েও, অন্তর্গত শিল্পের সংস্কারে সান্ধ্য অন্ধকারে শূরনৃত্য (Heroic dance) ছো-য়ের মহড়া দেন। ঢোল, সানাই, ধাম্‌সা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে শোনা যায় —তাক্-ঝাঁ, তাক্ -ঝাঁ, টিক্-ঝাঁ, তেরে-খিটি-তাক্ ইত্যাদি তাল। সেই তাল-লয়ে ছো-শিল্পীরা বীরদৃপ্তপদছন্দে অসাধারণ শারীরিক কসরতে, বিচিত্র মুদ্রায় আর শূন্যে মাঝে-মধ্যে উল্লম্ফন দিয়ে শিল্পশোভন বীর ভাবকে শ্রুতিদৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলেন। সেই লোকনৃত্যে (Folk dance) রামায়ণ-মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনি শুধুমাত্র নয়, সমকালীন সমাজজীবনের বিচিত্র জীবন্ত সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিতও লোকায়ত ছন্দে বিধৃত। আজ পুরুলিয়ার জয়পুরের কাছে পালগ্রা গ্রামের জিতেন মাহাত কিংবা ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ির কাছে রঘুনাথপুর গ্রামের অনিল পাত্র নারীবর্জিত ছো-নৃত্যে নারী-ছোশিল্পীদের সংযোজন করে নতুনতর 'মাত্রা' এনেছেন। তার চমক পুরুলিয়ার ছো-নাচে অভিনব শিল্পরূপ আনছে।

শুধু বলদর্পী ছো-নাচ নয়, বাগমুণ্ডির চড়িদা গ্রামের ছো-মুখোশ শিল্পীদের 'মাটি গড়া', 'কাগজ-চিটানো', 'কাবিজ-লিপা', 'থাপি-পালিশ', 'খুশ্‌নি-খোঁচা', 'রঙ-করা', 'সাজানো' ইত্যাদি শিল্পপর্যায় রসিকদের নান্দনিক অগ্রহকে টান-টান ধরে রাখে। দেবপ্রসাদ জানা যখন পুরুলিয়া জেলাশাসক তখন তাঁরই উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় বাগমুণ্ডির সবুজ অরণ্যানীর নির্জন অথচ নিরাপদ পরিবেশে গড়ে উঠেছে এক বাহারি দোতলা বন-বাংলা। আধুনিক জীবনছন্দের যাবতীয় সুযোগ আছে সেই গহিন নিরালা পরিবেশে। আছে ডেসেণ্টার। তবু প্রকৃতি সেখানে প্রধান নায়িকা। তাই মুগ্ধ বিস্ময়ে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই বন-বাংলোর নাম দিয়েছেন—'বনজ্যোৎস্না'। এ যেন তাঁর একদা লেখা বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্প 'রাতপাখি'-রই পটভূমি!

কিছুদিন আগে, বিশ্বখ্যাত ছো-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার প্রয়াণে, তাঁরই গ্রামে ছো-নৃত্য আকাদেমি স্থাপন করেছেন জননেতা তথা লোকসংস্কৃতিবিদ নকুল মাহাতোর সহযোগিতায় পুরুলিয়ার শিল্পসংস্কৃতিমনস্ক তৎকালীন জেলাশাসক দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়।

হ্যাঁ, বুদ্ধপূর্ণিমার দিনটি পুরুলিয়ার আদিবাসী জীবনে অহিংসার মন্ত্র না-ছড়িয়ে, যৌবন-সংরক্ত শিকার-পরবের উদ্দাম আবেগ জাগায়! পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, রানিবাঁধ-সারেঙ্গা, বর্ধমান-বীরভূম জেলার সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দেন ঝাড়খণ্ড, বিহারের অসংখ্য সাঁওতাল যুবক। ধাম্‌সা, মাদল, ঢোল, শিঙা, বাঁশি, সবাই দৃপ্তছন্দে ওঠেন অযোধ্যা পাহাড়ে—পাহাড়গাত্রের নানা পাকদণ্ডি পথ বেয়ে। আদিবাসী যুবকদের বিশ্বাস—শিকারে সাফল্য আনেন পারগানা-বোঙ্গা। তবু যৌবন ও যৌনতার মূর্তিময়ী দেবী রঙবুজি-বোঙ্গার প্রসন্নতা দরকার যৌবনদৃপ্ত কামনামদির বিহ্বল আবেশের জন্যই। অযোধ্যা পাহাড়ের উসুম-ডুংরি, সীতা-চাটান, পাহাড়িঝোরার নানা চাটানে, পানভোজনের আগে বা পরে তরুণরা বা যৌবনদীক্ষার বিচিত্র কামকলার মুদ্রা শিখে নেন বয়স্ক হয়েও যৌবনমনা আদিবাসী বন্ধুদের কাছে। লক্ষণীয়, সেই যৌবনমেলায় কোনও তরুণী যেতে পারে না। আদিবাসী সমাজের কঠোর অনুশাসন। অথচ কৃষ্ণতুল্য প্রেমিক গুতিকোড়া আর প্রেমিকা রাধার মতন

কাড়মিকুড়ির যৌবনমদির আদিবাসী পণয়লীলার কাহিনি আদিবাসী তরুণীদের হৃদয়ে জাগায় রসার্দ্র যৌবনাবেগ! সেই শিকার-সমর্থ শিকারী যুবকদের জীবনসঙ্গী হিসাবে পাওয়ার আশায় সাঁওতাল পল্লিতে-পল্লিতে আদিবাসী তরুণীরা 'মানত' করে, শিকার-পরবের গান গায়—'তুই মানসিক কর জড়া ভেঁড়া ল/ তবে পাবি ন শিকারা মরদ।'

বর্ষার রজনীগন্ধা-কাঁঠালিচাঁপা-বেলি - জুঁই-মালতী প্রভৃতি ফুল অপেক্ষা পুরুলিয়ার আদিবাসী নারীমনকে দোলা দেয় হলুদ-ঝিঙেফুল। করম-জাওয়া পরবের গানে খাটো-হলদে শাড়ি-পরা কিশোরীরা নাচের ছন্দে গায়—

ঝিঙা ফুল গাঁথি দেন ম'কে
হাথে ধরি চুমা খাব ত'কে।

অথবা, বিবাহিতা-যৌবনবতী, অথচ প্রোষিতভর্তৃকা নারী ঝরোঝরো বর্ষায়, মনের আবেগে ঝুমুরগান একা বা মরমী নারীদের সঙ্গে গেয়ে ওঠেন—

ঝিঙা ফুল সারি সারি
বঁধু বিনা রইতে নারি
আইজ বঁধু রইল্য ক্য্খানে —
সখি গো, হামি রইব ক্যামনে।

কিংবা —

নারীর জনম ঝিঙা ফুলের কলি
সাঁঝে ফুটি সকালে যায় ঝরি —
নারীর 'জইবন' ঝিঙা ফুলের কলি
'বঁধু' বিনা পরান ঝুরে মরি।

কলকাতা-হাওড়া-হুগলি প্রভৃতি গাঙ্গেয় অববাহিকার জেলা বর্ষার জল-কাদায় দুঃসহ দুঃখের কারণ। অথচ পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় বর্ষা সুভদ্র-শোভন। কারণ, কাঁকুরে-পাথুরে মাটিতে জল জমে না। অথচ দুরন্ত গ্রীষ্মের পর বর্ষায়—এখানের প্রকৃতি মনোহারিণী। সবুজ ঘাসের চিকন-বাহারি রূপ, আরণ্যক শ্যামলিমায়, ঝুমুরগানের কলি মনকে উন্মনা-ভাবুক করে।

ভাদ্র সংক্রান্তি। চাকলতোড়ের ছাতাপরব আদিবাসী জীবনের প্রাণের উৎসব। প্রান্তিক বাংলা, বিহার, ঝাড়খন্ডের বহু আদিবাসী নরনারী—মূলত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক ছাতাটাঁড়ের মেলায় মিলিত হন যৌবনমদিরতায়। সন্ধে পেরিয়ে রাতের জোনাক-জ্বলা-আলোয় তাদের নৃত্যগীত মদির বিহ্বল পরিবেশ জাগায়। দেহাতি পানীয়ের রঙসে ও প্রিয় সান্নিধ্যে শরীরী আকর্ষণ উদ্দাম অথচ ছন্দোময় সরস নিবিড় মায়া আনে। দেহাতি পানীয়ের রভসে ও প্রিয় সান্নিধ্যে শরীরী আকর্ষণ উদ্দাম অথচ ছন্দোময় সরস নিবিড় মায়া আনে। অথচ নেই কোনও উচ্ছৃঙ্খল হৈহল্লোড়! রাতের শেষ প্রহরে, ক্লান্ত শরীরগুলি একান্ত বিশ্বস্ততায় পাশাপাশি ঘুমে ঢলে পড়ে, খোলা আকাশের নীচে। মকবুল ফিদা হোসেন কেন, গণেশ পাইন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ কর্মকার পরিতোষ সেন প্রমুখ এ রাজ্যের শিল্পীরাও এইসব বিরল-জীবন্ত শিল্প নিয়ে কোনও 'স্টাডি' এ যাবৎ করেননি! শরৎ-হেমন্তে পুরুলিয়ায় সবুজ ওড়না-ঢাকা নীল পাহাড়। সাদা খরগোস আর পেখম তোলা-ময়ূর নির্ভয়ে, আপন মনে খেলা করে। কাছেই অযোধ্যা পাহাড়। পাকদণ্ডি পথ বেয়ে ট্রেকিংছন্দে অথবা পাহাড়ের

বুক চিরে প্রশস্ত পথ দিয়ে গাড়িতে ওপরে ওঠা যায়। তখন মনে হয় — সুক্না পেরিয়ে কার্শিয়াঙের পথে গাড়ি চলেছে! অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায়, আরণ্যক পরিবেশের মাঝে সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলো, ইউথ হস্টেল। কলকাতায়, রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ বা সরাসরি পুরুলিয়া জেলা বনবিভাগের আধিকারিক সঙ্গে যথারীতি আগাম যোগাযোগ করলে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা হয়। আধুনিক জীবনছন্দে সজ্জিত বাংলোর স্যুইটগুলি বেশ আরামপ্রদ, নিরালা, নিরাপদ অথচ রোমান্টিক আবেগসঞ্চারী। চুপি চুপি বলি : মহুয়ার আদিম গন্ধে মন আনচান করলে, সে-সব শখ-মেটানোর আছে এন্তার সুযোগ। তার সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় শ্যামলিমা বিশ্বস্ত অনুষঙ্গে মধুর সঙ্গ দেবে। কল্পিত স্বর্গসুখ তখনই হাতের মুঠোয়। ওমর খৈয়াম আজও আছেন। অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলি ঝকঝকে হোটেল বা সরকারি বাংলো আছে। সেখান থেকে জিপে বা আরামপ্রদ গাড়িতে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সিরকাবাদ পথে পাহাড়ের মাথায় ওঠা যায়। সারাদিন আনন্দ আবেশে কাটিয়ে সন্ধের আগেই ফেরা যেতে পারে। শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ভাড়ার গাড়ি কিংবা ট্রেকার সুলভে পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত আদিবাসী-গাইড পাহাড়ের মাথায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে কিংবা নিছক ভালবাসায় সুলভ।

পুরুলিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে, পশ্চিম মেদিনীপুর-ঝাড়খন্ডের গা-ঘেঁষে পাহাড়ের মালাগাঁথা আরণ্যক বান্দোয়ান। শাল, পলাশ, অর্জুন, আমন, বহড়া, কঁ্যাদ্, কুসুম, মহুয়ার জঙ্গল। সাঁওতাল, শবর, মুন্ডা, হো, মাহালি প্রভৃতি আদি-অধিবাসী নরনারী বর্ষায় ঘুঙের টোকা-মাথায় ডাঙা-ডহরে গুঁদ্লি-গেঁহু-জনারের সঙ্গে ধানচাষও করে। বনের কঁ্যাদ্-পিয়াল-জাম-মহুল-পাতালকোঁড় প্রভৃতি তাদের জীবনধারণের বিকল্প উপায়। মধুপুর, চিপিড়ি, চিরুগড়া, মাঘলা, পাটকিতা থেকে জবালা, গোলাপাড়া প্রভৃতি গ্রামে কোনও পর্যটক দূরঅস্ত্, লোকসংস্কৃতি-গবেষকও যাননি! মাঘলা, কাড়ালি পাহাড়ঘেরা আরণ্যক পরিবেশে বেড়ানোর রোমাঞ্চ আছে। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় খুঁজে পাওয়া যাবে নবদিগন্ত। চর্যাপদের শবর বালিকা এখানের উঁচু-উঁচু পার্বত্য পরিবেশে গুঞ্জার মালা, ময়ূরপুচ্ছে সাজে—আপন মনে। বান্দোয়ান-বাগমুন্ডির দুর্গম আরণ্যক পরিবেশে, বীরহড় সম্প্রদায়ের (বীর = জঙ্গল। হড় = মানুষ 'ইগলু'-র ধাঁচে পাতার ঘর বানিয়ে বনের ফল-কন্দ, কিংবা বন্য জন্তুর মাংস দিয়ে উদরপূর্তি করে। উল্লেখ্য, দেবপ্রসাদ জানা পুরুলিয়ায় জেলাশাসক থাকাকালীন বান্দোয়ানের গরিব আদি-অধিবাসীদের জন্য আই.আর.ডি.পি.র আর্থিক অনুদান এবং গৃহনির্মাণে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। নাচনীদের সামাজিক মর্যাদার 'অবস্থান' খুঁজে দিয়েছেন, দরদী মন নিয়েই।

কালীপুজোর সময় গাঁয়ে-গাঁয়ে বাঁধ্না পরব। কাড়া-খুঁটা, গোরু-খুঁটা। অহিরা গানের প্রলম্বিত সুর। আর ধানকাটার সময় থেকেই টুসুগানের আমেজ। টুসুগান পুরুলিয়ার প্রাণের সম্পদ। পৌষ-সংক্রান্তির মকর-পরব। এখানের আদিবাসী জীবনে টুসু-পরবের আবেদন দুর্গাপুজোর থেকে অনেক বেশি। এখ্খান যাত্রা কৃষিকর্মে শুভদিন।

লক্ষণীয়, পুরুলিয়ায় আছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অসংখ্য নরনারী। তাঁদের 'সোহরাই' পরব ধানকাটার সময় পাঁচদিনব্যাপী হয়। আর তাঁদের বসন্ত-উৎসবকে বলে 'বাহা-পরব'। ফুলে-ফুলে সারা দেহ সাজিয়ে সাঁওতাল তরুণীদের শিল্পশোভন নৃত্যগীত পুরুলিয়ায়-দেখা বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। বান্দোয়ান কিংবা পুরুলিয়ার নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাঁওতাল-সম্প্রদায় মর্যাদার সঙ্গে বাস করেন

পশ্চিমবাংলার নাগরিক হিসাবেই। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী শবর-সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। তাই তিনি 'শবর-জননী' নামে সমাদৃতা। ঝুমুর গানের কিংবদন্তী গায়িকা সিন্ধুবালা দেবীর কেঁদ্‌রি গ্রামে (কাঁটাড়ির কাছে) গিয়ে শিল্পীর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে।

পুরুলিয়ার অন্যতম বড় আকর্ষণ তার পুরাকীর্তিমালা। এ জেলার মন্দির-পুরাকীর্তি প্রাচীন বাংলার মুর্শিদাবাদ-বিষ্ণুপুর প্রভৃতি ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চলের মতনই চিত্তাকর্ষক। তার বিস্তারিত আলোচনা উৎসাহী নরনারীদের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে 'পুরাতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পুরুলিয়ার অন্যতম দর্শনীয় স্থান পঞ্চকোটরাজের কাশীপুর রাজবাড়ি। রাজা নীলমণি সিংদেও ছিলেন স্বাধীনতাপ্রিয়, গুণগ্রাহী নরপতি। তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের সময়, তাঁর উদ্যোগে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা ও পুরুলিয়া ট্রেজারি লুঠ ঐতিহাসিক ঘটনা। কবি মধুসূদন দত্ত জীবনসায়াহ্নে তার আমলেই পঞ্চকোটরাজের দেওয়ানপদে কিছুদিন পুরুলিয়ায় ছিলেন। এ সব সর্বজনবিদিত তথ্য। রঘুনাথপুর ফরেস্ট রেঞ্জে সরবাড়ি মোড় থেকে কাছেই পাঞ্চেত পাহাড়। ঢেউখেলা সবুজের বন্যা! তার মাঝে দুধ সাদা সুরম্য বন-বাংলো। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বানানো। বন-বাংলোর সরকারি নাম—'গড়পঞ্চকোট-প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র।' গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ বা শীতে প্রাণের আরাম, মনের আনন্দের জন্যে চলে আসুন এখানে।

এ জেলায় মধুসূদনের প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে উৎসাহী নরনারীদের কাছে এই শহরের রাঁচি রোডে অবস্থিত GOSSNER EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH, তার সঙ্গে কাশীপুর রাজবাড়ি, কবি মধুসূদন দত্ত-নামাঙ্কিত মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : পাষাণময় দেশ পুরুলিয়ার প্রতি গভীর ভালবাসায় তার ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে মধুকবি যে-কবিতাটি একদা লিখেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক চতুর্দশপদী কবিতাটি পুরুলিয়া-জেলা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে শোভন মর্যাদায় উৎকীর্ণ হয়েছে কবি শঙ্খঘোষের পৌরোহিত্যে এবং তৎকালীন জেলাশাসক দেবপ্রসাদ জানা মহোদয়ের সক্রিয় উদ্যোগে।

পুরুলিয়া অনেকের কাছে খরাব জেলা। অথচ এই খরার মোকাবিলায় এ জেলায় আছে অনেক পুকুর, বাঁধ। তাদের মধ্যে ঝালদার কাছে বেগুনকোদরের মুরগুমা জলাধার, পাঞ্চেতের মুরারডি জলাধার, পাঞ্চেতের তেলকুপির জলময় স্থান উল্লেখযোগ্য বিশাল জলাশয় হিসাবে সুবিখ্যাত সাহেব বাঁধ। খরার জেলায় এ যেন কলকাতার ঢাকুরিয়া লেক! মনোরম পরিবেশ। কাছেই সুভাষ পার্ক। নয়নশোভন। সেখানে আছে কবি জীবনানন্দ দাশের আবক্ষ মূর্তি। সাহেব বাঁধের নর্থ লেক রোডের মুখে সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার— হরিপদ সাহিত্য মন্দির। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার প্রমুখ অনেক বিদ্বজ্জন সেখানে এসেছেন। এখানের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ বিভাগটি সবিশেষ উল্লেখ। নর্থ লেক রোডের অন্যপ্রান্ত জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র। দর্শনীয় স্থান।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জননী-নামাঙ্কিত নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, মানভূমকেশরী অতুলচন্দ্র ঘোষের শিল্পাশ্রম, স্বাধীনতাসংগ্রামী ঋষি অসীমানন্দের রামচন্দ্রপুর আশ্রম, এ রাজ্যের একমাত্র পাবলিক স্কুল হিসাবে মান্য পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল, সর্বভারতীয় আবাসিক বিদ্যালয় রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যাপীঠ, সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশ' চলচ্চিত্রের শুটিং স্পট জয়চণ্ডী পাহাড়, মিশিডি গ্রাম প্রভৃতি বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

কবি-চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান' স্বর্ণকমল বিজয়ের সম্মান

পেয়েছে। পুরুলিয়া শহরে এবং গ্রামে হয়েছে তার শুটিং। ক্ষুধা জর্জর পরিবেশে, দারিদ্র-যৌনতার ঊর্ধ্বে কাব্যিক মূর্ছনা সৃষ্টির জন্য চিত্র পরিচালককে নানাবিধ প্রশাসনিক সহযোগিতা করেছেন তৎকালীন জেলাশাসক দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়। অনুসন্ধিৎসু নরনারীরা এ জেলায় এলেই তার শুলুকসন্ধান পাবেন লোক মুখে। নিদেন পক্ষে কুমুরিয়া-কবি কুচিল মুখার্জির মুখে। যিনি উক্ত সিনেমায় অভিনয় করেছেন।

বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর জলাধরের অপর প্রান্তে পুরুলিয়ার বনপুকুরিয়া। সেখানে আছে প্রায় দু'শ হরিণের এক সুরম্য উদ্যান। অসংখ্যা পর্যটক নৌকায় সেখানে আসেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর মুকুটমণিপুর এবং বনপুকুরিয়ায় রোপওয়েয়র সুব্যবস্থা করায় আগ্রহী। গড় পঞ্চকোট-নেতুরিয়া অঞ্চলে একটি আধুনিক ট্যুরিস্ট লজ করা হয়েছে। রঘুনাথপুরের পাহাড়ের গদিবেড়ো গ্রামের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামেব মুখে বিশাল সরোবর বহু পর্যটকের কাছে সুদীর্ঘকাল প্রিয়।

পুরুলিয়ায় জেলাশাসক থাকাকালীন দেবপ্রসাদ জানা মহোদয় পর্যটন-মানচিত্তে এ জেলাকে মর্যাদাবান করার পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে বিশেষ যত্নবান হন। সুদূর আন্দামানের আদিম অরণ্যেব শোভা খুঁজে পাওয়া যায় বান্দোয়ানের পাহাড়-ঝর্ণার বিচিত্র ছন্দ জাগানো অরণ্যানীর মাঝে। বান্দোয়ান থেকে খুব কাছেই 'বিউটি স্পষ্ট' দুয়ারসিনি। পুরুলিয়ায় জেলা শাসক থাকার সময় দেবপ্রসাদ জানা এখানের সুরম্য পরিবেশে ছিমছাম বন-বাংলো গড়া শুরু করেন। নাম দেন 'উড়ুল'। ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ মায়ার নামটি ব্যঞ্জনামধুর। কারণ অনতিদূরে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ঝিলিমিলি শালবন। কুইলাপার্ক নেচার পার্ক। তালবেড়িয়া ড্যাম। সুরম্য সুতানের ইকোপার্ক। রিমিল পর্যটন নিবাস। ঝাড়গ্রামের ডুলুং নদী। প্রাচীন রাজবাড়ি। কনকদুর্গা। আদিম শালবন। বেলপাহাড়ির ঝুমুর-টুসুগান। কোতাও উড়াল দেওয়ার নেই মানা! পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার অদূরে, পুরুলিয়া গ্রামের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ইকো-ট্যুরিজন সেণ্টারগড়ার কাজ শুরু করেন তৎকালীন জেলাশাসক দেবপ্রসাদ জানা। 'বিশল' জলাধারে নৌ-বিহারের সুযোগ, হরিণদের বিচরণ ভূমি-দর্শনের জন্য গড়া হচ্ছে সুরম্য অতিথিনিবাস। খয়রাবেড়া অঞ্চলে পর্যটন আবাস নয়নরম্য। এ বিষয়ে কিছু সরকারি পরিসংখ্যান ও সারণি-নিম্নে প্রদত্ত হল।

হাওড়া থেকে পুরুলিয়া আসার জন্য আগাম রিজার্ভেশন করে হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি অনেকেই ধরেন। হাওড়ায় রাত ১০.৪০ -এ ছাড়ে। পরদিন সকাল প্রায় সাড়ে ছ-টার মধ্যে পুরুলিয়ায় আসে। থ্রি-টিয়ার স্লিপার কোচ। ফার্স্ট ক্লাসও আছে। 'এ রাতের গাড়ি/ দিন পাড়ি'—মনে আওড়ে সুন্দর এক ঘুমে সকাল!

তাছাড়া, হাওড়া থেকে বিকেল ৪.৫০-এ ছাড়ে পুরুলিয়া এক্সপ্রেস। রাত ১১টা নাগাদ পুরুলিয়ায় আসে। রূপসী বাংলা নামেও একটি ভালো ট্রেন আছে। খড়গ্‌পুর, বর্ধমান বা আসানসোল, দিল্লি, পুরী থেকে আসারও ট্রেন আছে। ধর্মতলা থেকে অনেকগুলি রকেট সার্ভিস বাস আছে। ইচ্ছে থাকলে উপায় তো অনেক।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া একত্রে ভ্রমণ অথবা শুধুমাত্র পুরুলিয়া-ভ্রমণে, উড়ু-উড়ু মন—কাজের শিক্‌লি-কেটে বেরুনোয় আছে অপার আনন্দ। ফাঁক বা ফিকির খুঁজে নেওয়া, সময়ের স্রোতে ভেসে-যাওয়া আপন খুশিতে—সে-ও তো এক শিল্প!

স্থান	কার্যকরী প্রশাসনিক সংস্থা	অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
পরিবেশ উন্নয়নে পর্যটন কেন্দ্র : দোলডাঙ্গা মানবাজার -১	পুরুলিয়া বন-আধিকারিক কে.এস.সি.-২ বিভাগ	১,৭৭,৫২৬.০০	কাজ চলছে।
কুইলা পাল - বিশ্রামাগার (বান্দোয়ান)	ঐ	২,০৫,৫০০.০০	ঐ
পরিবেশ উন্নয়নের পর্যটনকেন্দ্র : পুরুলিয়া (পুরুলিয়া-২)	পুরুলিয়া বন-আধিকারিক কে.এস.সি.-২ বিভাগ	১০,০০,০০০.০০	ঐ
পরিবেশ উন্নয়নে পর্যটনকেন্দ্র : মাঠা (বাগমুন্ডি)	পুরুলিয়া বন-আধিকারিক	৫,০০,০০০.০০	ঐ
অযোধ্যা পাহাড়-আবাসকেন্দ্র (বাগমুন্ডি)	ঐ	১২,০০,০০০.০০	ঐ
পাখি পাহাড়ে বিশ্রাম-ছাউনি (মাঠা, বাগমুন্ডি)	পার্বত্য উন্নয়ন সংস্থা	৫,০০,০০০.০০	ঐ
		৩৫,৮৩,০২৬.০০	

পুরুলিয়ায় থাকার জায়গা / শহরে আবাসস্থল
(সরকারি বিভাগ)

	রুম সংখ্যা		বুকিং-কেন্দ্র
	এ. সি.	নন - এ. সি.	
১. পি. ডব্লু. ডি. গেস্ট হাউস	০	২	এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়র , পি. ডব্লু. ডি. , পুরুলিয়া।
২. পি. ডব্লু. ডি. (রোড্স্) গেস্টহাউস	০	২	ঐ (রোড্স্) , পুরুলিয়া।
৩. ইরিগেশন	০	৬	ঐ, আই. অ্যান্ড ডব্লু. ডি., পুরুলিয়া।
৪. এগ্রি-ইরিগেশন	০	২	ঐ, এগ্রি-ইরিগেশন বিভাগ, পুরুলিয়া।
৫. পি. এইচ. ই	৩	০	ঐ, পি. এইচ. ই., পুরুলিয়া।
৬. ফরেস্ট বাংলো	০	২	ডি. এফ. ও., কংসাবতী - ২, পুরুলিয়া।
৭. ফরেস্ট বাংলো	০	২	ডি. এফ. ও. এক্সটেনশন, ফরেস্ট্রি, পুরুলিয়া।
৮. ইয়ুথ হস্টেল	০	১২০	ইয়ুথ ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গল।

পুরুলিয়ায় শহরে আবাসস্থল (বেসরকারি উদ্যোগে)

ক. ।। হোটেল ।।				খ. ।। লজ ।।			গ. ।। ধর্মশালা / ক্লাব ।।		
	হোটেলের নাম	এ. সি. রুম	নন - এ. সি. রুম		নাম	রুম		হোটেলের নাম	রুম
১.	আকাশ	৭	৯	১.	কমলালয়	১৯	১.	পুরুলিয়া ধর্মশালা	৭
২.	ময়ূর	৭	১৩	২.	মীনাক্ষী	১৫	২.	করনি ধর্মশালা	১০
৩.	অ্যারিস্টোক্র্যাট	০	১০	৩.	সারদা-নিকেতন	১০	৩.	রাজগড়িয়া ধর্মশালা	১২
৪.	হোটেল নেস্ট	২	৮	৪.	বেঙ্গল বোর্ডিং	২০	৪.	শ্যাম ধর্মশালা	১২
৫.	ওরিয়েন্ট	০	৭	৫.	দাস লজ	১০	৫.	ব্রাহ্মণ-ধর্মশালা	১০
৬.	শ্রীহোটেল	০	১০	৬.	পুষ্পক	১২	৬.	ছবি বিড়ি ধর্মশালা	৮
৭.	রাজশ্রী	০	১০	৭.	বিকাশ ভবন	১৫	৭.	শক্তিসংঘ ক্লাব	৮
৮	রাজদূত	৩	৯	৮.	দীপ লজ	১০			
৯.	দীক্ষিত লজ	৮							
১০.	মন্মথ দাঁ লজ	১০							
১১.	শ্রীরাম লজ	১০							

মফঃস্বল-পুরুলিয়ায় আবাসস্থল (সরকারি বিভাগ)

	রুম সংখ্যা		বুকিং-কেন্দ্র
	এ. সি.	নন - এ. সি.	
১. তুলিন	০	২	এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়র , পি. ডব্লু. ডি. , পুরুলিয়া।
২. রঘুনাথপুর	০	৪	ঐ
।। ফরেস্ট বাংলো ।।			
১. ঝালদা	০	২	ডি. এফ. ও., পুরুলিয়া।
২. কাশীপুর	০	২	ডি. এফ. ও., কে. এস. সি.-১ , পুরুলিয়া।
৩. বান্দোয়ান	০	২	ঐ, কে. এস. সি.-২, পুরুলিয়া।
৪. কুইলাপাল	০	২	ঐ, ঐ
৫. দুয়ারসিনি	০	২	ঐ, ঐ
৬. পুরুলিয়া	০	২	ঐ কে. এস. সি.-১
৭. বরাবাজার	০	২	ঐ, কে. এস. সি.-২, পুরুলিয়া
৮. বলরামপুর	০	২	ঐ, ঐ
৯. অযোধ্যাপাহাড় নীহারিকা গেস্ট হাউস		শতাধিক	প্রোজেক্ট ডিরেক্টর, সি., এ. ডি.সি., অযোধ্যা , পুরুলিয়া।

1. Surulia eco-tourism centre (waterbody. deer park. guest house. proposed dormitory & boating) **2.** Scenic beauty at Duarsini at the junction of Purulia (Powers) Bankura (Ranibandh) and Mid-West (Beltation) **3.** I've laid foundation of guest house "Urul" at Duarsini for construction of Panch Samiti guest house. **4.** "বনজ্যোৎস্না" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাম দিয়েছে ২ তলা বিশ্রামাগাব বাগমুণ্ডিতে **5.** Day centre আমার সময়ে বাগমুণ্ডিতে MP (Mahato)-র টাকায় ৫০/৬০ জন ছাত্র শিক্ষক থাকতে পারে।

অযোধ্যা পাহাড়

সুবোধ বসুরায়

পর্যটক টেনে আনতে অযোধ্যা পাহাড়ের জুড়ি নেই। যেমন দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য তেমনি প্রকৃতির এক বিশাল গবেষণাগার।

পুরুলিয়া বা বরাভূম স্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করলেই হল, কেউ না কেউ আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে পশ্চিম দিগন্তে একটানা পাহাড়ের রেখা উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে। আর্কিয়ান যুগের শিলাস্তর, ক্ষইতে ক্ষইতে এখন গড় বারোশো ফুট উচ্চতা, দধীচির অস্থি-অবশেষের মতো পড়ে আছে পুরুলিয়া, বলরামপুর, বাগমুণ্ডি, ঝালদা, আড়ষা থানাকে বেড় দিয়ে ফের পুরুলিয়া। দৈর্ঘ্যে ৩২ মাইল, প্রস্থে ১০। ইংরেজি L অক্ষরের মতো; এগিয়ে-পেছিয়ে কত লীলাভঙ্গ। বিমান থেকে দেখলে মনে হবে বিশাল এক দৈত্য দল্‌মা থেকে হাঁটতে হাঁটতে রাঁচি-হাজারিবাগের দিকে আনমনে যেতে যেতে বুঝি একপাটি বুটজুতো ফেলে গেছে।

দধীচির ওই অস্থিপঞ্জরের ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে কত জলধারা, ধুয়ে এনেছে পাতাপচা মাটি, ভরাট করেছে নিচের অববাহিকা। এখানের অধিবাসী জনজাতিরা পাহাড়কে মনে করতো দেবতা। সাঁওতালি ভাষায় বুরু মানে পাহাড়। এক-একটি চূড়ায় এক এক বুরুর অধিষ্ঠান—বাগমুণ্ডীতে মারাং বুরু = বড় পাহাড়। গজাবুরু, গর্গবুরু, মাঠাবুরু, চেমটুবুরু—গুনে শেষ করতে পারবেন না এত। এর সঙ্গে দ্রাবিড়ের ডুংরি, যা হল অনুচ্চ বিচ্ছিন্ন পাহাড়। 'ই ডুংরি, উ ডুংরি পিয়াল পাকেছে'—এও গেঁথে গেছে জনমানসে—ফুলডুংরি, লাহাডুংরি কত কি।

ফুল? আসুন না বসন্তপূর্ণিমায়, যখন মাঠের পর মাঠ লাল হয়ে আছে পলাশফুলে। পাশে ফুটে থাকে হল্‌দে রঙের গলগলি ফুল। কপিং কালারের কিসব অর্কিড। এসব সংগ্রহ করতে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও আসে। সিরকাবাদ বনবাংলোর পাশে বান্দুনদীর চড়ায়, ঠুড়গা ফল্‌সের নিচে, বামনি ফল্‌সের ওয়াচটাওয়ারের বড় বড় বোল্ডারে এদের দেখতে পাবেন, মহা ফূর্তিতে পিকনিক করছে। বামনি ফল্‌সের মাথায় পৌঁছলেই বুঝতে পারবেন *পুরুলিয়াকে কেন রাঢ়ভূমি বলে। নদীগর্ভস্থ এইসব* বড় বড় *বোল্ডার, খোঁচা খোঁচা পাথর*, নুড়ি, কাঁকর, মোটা বালিকেই সাঁওতালরা বলে রাঢ় বা লাড়, বা লাড়া। বড় রূঢ় তাই রাঢ়ের ভাষা।

একসময় জঙ্গলমহল, ঝাড়খণ্ডও বলত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ছিল দুর্ভেদ্য অরণ্য; ভর্তি ছিল লতাগুল্ম, ওষধি, গাছ আর বিরাট সব বনস্পতি দিয়ে। রাজত্বটা ছিল শাল, পলাশ, কুসুম, মহুয়ার। অসংখ্য *ছিল পাকরেদদের সংখ্যা—পিয়াল, পিয়াশাল*, সেগুন, সত্‌সর, *শিরীষ*, শিমুল, অর্জুন, তেলা, ধ, কঁ্যাদ, কুড়চি, গামার, ডকা, গলগল, ডুমুর, আমড়া, নিম, বয়ড়া, আমলকী, হর্তুকী, আম, জাম, কুল, তেঁতুল, অশ্বত্থ, বট, আসান, মুরগা, করম। দুধিলত, বাঁদরলত, কুকুরমুতা,

স্বর্ণলতা, চীহড়, ধাধকি যত্রতত্র। এদের অন্তরালেই বইত নৃত্যরতা পাহাড়ি স্রোতগুলি—কাঁসাই, রুপাই, কেরেংসাই, সাহারজুড়ি, সামরবিশি, বান্দু, চাটুহাসা, কুমারী, ল্যাকড়াগাড়া, কুলবেড়া, শাঁখা, শোভা, বামনি, ঠুড়গা, মাচকাঁদা, কাডরুগাড়া। কখনো বুড়বুড় করে পাথরবালি ফাটিয়ে প্রস্রবণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। একে বলে দাঁড়ি। খানিকটা বয়ে চলার পর সীতাচাটানের নীচে আবার কোথায় অদৃশ্য হল বুড়বুড়ি দাঁড়ি। অন্তঃসলিলা হয়ে নীচে পৌঁছে ফেব দেখা দিল জোড় কিংবা নদী হয়ে।

যুগ যুগ ধরে এই বন্যপ্রকৃতির মধ্যে যারা মানুষ হয়েছে তাদের জীবনচর্যায় এর প্রভাব না পড়ে কি থাকতে পারে? ১৯৭৯-এব গণনানুসারে ২৯টি মৌজায় ছড়িয়ে ছিল অযোধ্যার গ্রামবসতি। বেশির ভাগই সাঁওতাল। তাছাড়া ছিল বিরহড়, মুন্ডা, ভূমিজ, ঘাসী, পাহাড়িয়া, খেড়িয়া। কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হওয়ার আগে শিকার ছাড়া বাঁচার কোনো উপায়ই ছিল না। পশুপাখি সরীসৃপদের যা পেত তাই মেরে খেত। বৌদ্ধ পূর্ণিমায় সাঁওতালদের শিকাব পরবে অযোধ্যা পাহাড়ের কেউ রেহাই পেত না—শেয়াল, সজারু, হাতি, ভালুক, শূয়ার, হরিণ, হনুমান, খরগোশ, তিতির, ময়ূর, সাপ, গোসাপ, হরিয়াল, বনমোরগ, ঘুঘু, শালিক, টিয়া, কাদাখোঁচা, শ্যামকাহাল, ধনেশ, বগেড়ী, কাঠবেড়ালি, ইঁদুর। বৈশ্বানর ছাড়া এমন সর্বভুক আব কেউ নেই।

যাদের রক্তে রয়েছে এই 'মাবি কিংবা মবি' ভাব, তাদের পালাপার্বণ, লোককথা, লোকাচারেও লক্ষ করা যাবে এই হিংস্রতা। এই সেদিনও মাঠাবুরুর মাথায় নরবলি হয়েছে। প্রতি বছর, মাঘের গোড়ায় জমজমাট মেলা বসে ; গা শিরশির করে উঠবে ওখানে চাপতে--হাজার হাজার ছাগমুণ্ড পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে পাহাড়ি পথ, তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে বাঁদর-হনুমান।

মাঠার ডাকবাংলোয় যাঁরা আসেন বনবিভাগের অতিথি হয়ে এত কথা তাঁরা কী করে জানবেন? তাঁরা হয়তো শোনেনওনি আবণ্যকের বিভূতিভূষণ এই বাংলোতেই তিন মাস ছিলেন। ছটি গল্পও লিখেছিলেন। ডাযেরিতে লিখে গেছেন রোজনামচা। পরে, প্রতি পয়লা বৈশাখে ছো-নাচের প্রদর্শনী করে বিদেশযাত্রার কুশীলব বেছে নিতেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। তারও আগে 'অযোধ্যাবনিনাথ' মদনমোহনের আমলে গগন স্পর্শ করেছিল বাগমুণ্ডি শৈলীর ছোনাচ। সব সম্প্রদায়ের লোকই তাতে অংশগ্রহণ করতো। তবে খ্যাতির শীর্ষে ছিল পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং-এর পিতা জীপা সিং মুড়া। রণনৃত্য, কালবৈশাখীর ঝড়ের মতোই তার সংহারমূর্তি। ঢোল-ধামসা বাজাত ডোমরা।

পাহাড়ের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে অযোধ্যা নামধেয় ছ'টি টোলায় বিভক্ত গ্রাম। এখানের ভূপৃষ্ঠে পুরুলিয়া শহরের মতোই প্রায় সমতল। পাকা বাড়ি প্রতিষ্ঠানও আছে। এক প্রান্তে লুথেরান ওয়ার্ল্ড সারভিসের ক্যাম্পাস। এখন হাত বদলে C.A.D.C অর্থাৎ Community Area Development Corporation-এর অধীন। পূর্বে এবং বর্তমানে অনেক কাজ করে চলেছেন এঁরা। চিকিৎসা, farming, poultry, dairy, nursery, water-supply, irrigation, roads, literacy, ration shop, চা-বাগান—সবেতেই কল্যাণহস্তের স্পর্শ নিজের করে নেবেই আদিবাসী এবং বহিরাগত সকলকেই। Tourism-এর কথা এরাঁও ভেবে রেখেছিলেন। জিপ, ট্রেকার, মিনিবাস, বড় বাসের জন্য বাসস্ট্যান্ডও চালু থাকে সকাল-সন্ধে। ইদানীং ক্যাম্পাসের মধ্যেই নীহারিকা, সাগরিকার মতো আবাসন নির্মিত হয়েছে ট্যুরিস্টদের জন্য।

CADC'র পাশেই আদিবাসী স্কুল ও হস্টেল। পেছনেই পাবলিক লাইব্রেরি। অনতিদূরে বাগমুণ্ডীর পথে ইয়ুথ হস্টেলের ডরমিটরি ও কটেজ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির ও মিশন গৈরিক পতাকা উড়িয়ে হাজির। সাহেবডিতে আছে সুরম্য বাংলো বনবিভাগের।

ময়ূরপাহাড়ে গ্র্যানাইটের বিরাট চাটান। বিখ্যাত হয়ে গেছে বিংশ শতকের শেষপাদে পূর্ণ

সূর্যগ্রাসের জন্য। ঝলমল করে উঠেছিল দেড়মিনিট ব্যাপী diamond ring-এর ঔজ্জ্বল্যে। পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীরা ছুটে এসেছিলেন তা পর্যবেক্ষণ করতে। জয়দ্রথ-বধের মতো তা অক্ষয় হয়ে থাকবে স্মৃতিতে।

ওইখানেই আছে যোগিনী পাহাড়। কিংবদন্তি হঠিয়ে কোনোও দুঃসাহসিক প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক দেখতে যাননি তার অভ্যন্তরে কী সত্য আত্মগোপন করে আছে।

অতি সম্প্রতি জাপানি সহযোগিতায় আয়োজন চলছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের।

বিধান রায় স্বপ্ন দেখেছিলেন অযোধ্যাকে দ্বিতীয় শৈলনগরী বানাবার। সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। কলকাতার ভ্রমণপিপাসী মানুষজন কিন্তু তাতেই সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। ঋত্বিক ঘটক এবং সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল সে আগ্রহ। তা সত্ত্বেও, বনবিভাগ ছাড়া অন্য কোনোও সরকারি অধিকার এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। যা করেছে তা শুধু সিএডিসি। জেলাশহর পুরুলিয়ায় পর্যটন কেন্দ্র খোলার নামগন্ধও কেউ কখনো করেনি। সরকারি বা বেসরকারি তরফে পরিবহনের কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো পুস্তিকাই ছাপা হয়নি, ট্যুরিস্টদের সাহায্যার্থে। ট্রেকার, মাউন্টেনিয়ার, ট্যুরিস্টরা চকবাজারের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে অনাহুত অতিথির মতো ঘুরে বেড়ান যানবাহনের খোঁজে। স্থানীয় ছত্রাক পত্রিকা বার করেছিল অযোধ্যা শিরোনামের সঙ্কলনগ্রন্থ। কজনই বা তার সন্ধান রাখে?

আর্কিয়ান যুগের অযোধ্যা পাহাড় তবু দাঁড়িয়ে আছে স্বমহিমায় পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধান রায়ের স্বপ্ন কবে সম্ভব হবে?

পুরুলিয়া জেলার নদ নদী

মলয় চৌধুরী

পৃথিবীর একভাগ স্থল তিনভাগ জল। এই তিনভাগ জলের অনেকটাই লবণাক্ত যা সমুদ্রের জল বা বহুক্ষেত্রে হ্রদের জল। তার মধ্যে ব্যবহারিক জল তথা পানীয় জলের পরিমাণ এর ২·৫ শতাংশ। এই ব্যবহারিক জলের বহুলাংশেরই ধারক বাহক এই নদীগুলি। অন্যান্য জলাধার তথা হ্রদ ও পুকুরের সঙ্গে এর পার্থক্য গড়ে দিয়েছে এর বাহিকা রূপটি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায় "নদী আপন বেগে পাগল পারা"। নদী জলকে বহন করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায়। সাধারণতঃ পাহাড় থেকে সাগরে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্রদ থেকে সাগরে বা পাহাড় থেকে অন্য নদীতেও মিলিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নদীর একটি উৎসমুখ আছে, সেখান থেকে এর উৎপত্তি। তারপর মাইলের পর মাইল স্থলভাগের উপর বয়ে গিয়ে সঙ্গমস্থলে মিলিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোস তার ভাগরথীর উৎস সন্ধানে কাহিনীতে লিখেছেন "নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, মহাদেবের জটা হইতে?" এখানে লেখক কাব্যিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হলেও তিনি আসলে এর উৎসমুখের প্রতি ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা পুরুলিয়াতে অনেক নদী, শাখানদী বা জোড় আছে। সেগুলি এ জেলার জীবনযাত্রার ধারক বাহক। আবার পানীয় জল বা সেচের জল সরবরাহে এই নদীগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। এই জেলাটি ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় এর ভূ-প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো নয়। জেলাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৩৪·০১ মিটার উঁচু এবং ভূ-প্রকৃতি কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হওয়াতে এখনকার নদীগুলির পক্ষে বর্ষার জল সারাবছর ধারণ করে রাখা সম্ভব হয় না। জেলার গড় বৃষ্টিপাত বছরে ১৩৬৩·১ মিঃ লিঃ বছরে গড়ে ৭০·৯ দিন বৃষ্টি হয়। তাই বছরের বেশির ভাগ দিনই নদীগুলি শুষ্ক বালুকাময় থাকে। এখানকার অধিবাসীগণ নদীর বুকে কুপ খনন করে বা চুঁয়া কুড়ে জল সংগ্রহ করেন। এই নদীগুলি এই জেলার লোক-সংস্কৃতির পীঠস্থান। পৌষ-সংক্রান্তিতে মকর-স্নানের সময় এই নদীগুলির ধারে মেলা বসে। বিখ্যাত টুসু উৎসবের, টুসু ভাসান এই নদীগুলিতেই হয়। টুসু, ভাদু, ঝুমুর গানে ভরে ওঠে নদীতট। তাছাড়া এই নদীগুলি নিয়ে রয়েছে কত লোককথা, লোকগান, যা এই জেলার লোকসংস্কৃতির এক বিরাট সম্পদ। পুরুলিয়া জেলায় বড় নদীর সংখ্যা বেশি নয়। অতিবৃহৎ নদী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র বা দক্ষিণের কাবেরী, গোদাবরীর মতো নদী এই জেলাতে নেই। এখানে মূল নদী সাতটি। (১) কংসাবতী বা কাঁসাই (২) দামোদর (৩) কুমারী, (৪) দারকেশ্বর (৫) শীলাবতী (৬) সুবর্ণরেখা (৭) টাটকো। অনেক ক্ষেত্রে টাটকো

নামটি ধরা হয় না। তাড়াছা রয়েছে অনেকগুলি ছোটনদী যথা—নেংসাই, হনুমাতা, সোনা, বেকো, উৎলা, পাড়গা, সালদা, রূপাই বাঁদু, পাতলই, চাকা, জাম, কাররু, শোভা, কুদলুং, শাঁখা, তসের কুয়া কদমদা, হড়াই, গুয়াই, তারা, আমরুহানা, কেঁররো, ইত্যাদি এবং রয়েছে। অসংখ্য জোড় বা ঝরণা। জোড় নামটি সম্ভবতঃ ঝোরা বা ঝরণা থেকে উৎপত্তি। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল বন্ধুর ভূ-ভাগের গা বেয়ে অজস্র ধারায় নেমে আসে। ধারাগুলি মিলিত হয়ে যখন বড় জলধারার সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় জোড়। জেলার মূল নদীগুলির পরিচিতি নিম্নরূপ।

(১) **কংসাবতী (কাঁসাই)**—মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই নদীর নাম বলেছেন কপিশা। রঘুবংশের ৩য় সর্গে ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে তিনি লিখেছেন—

সতীর্ত্বাং কপিশাং সৈন্যৈব বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ
উৎকলা দর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ॥

কাঁসাই নদী পুরুলিয়া জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী ঝালদা থানার জাবর পাহাড় থেকে বহু পার্বত্য জলধারা সংগ্রহ করে ঝালদা, গড়জয়পুর, পুরুলিয়া, পুঞ্চা মানবাজার ইত্যাদি থানাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পুরুলিয়া বাঁকুড়ার সীমানা বরাবর কয়েক মাইল প্রবাহিত হয়ে বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার পরেশনাথ, সারংগড়ে অম্বিকা নগরের কাছে কুমারী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেখান থেকে ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তমলুকের দক্ষিণে কেলেঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে হলদী নদী নামে পরিচিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কাঁসাইএর প্রবাহ খুব ঢালু, মাইলে প্রায় ৪০ ফুট, চওড়া ২৭০০ ফুট, নদী খাদ ১৫ থেকে ২০ ফুট মোট দৈর্ঘ্য ১৭১ মাইল। এর উপনদী সন্ধু পাতলই, কুমারী ইত্যাদি। অম্বিকানগর কংসাবতী কুমারীর মিলনস্থলে মুকুটমণিপুরে কংসাবতী জলাধার। এই নদীটি পুরুলিয়া জেলার প্রধান নদী। বর্ষাছাড়া অধিকাংশ সময়ই এতে জল থাকে না। জেলায় অনেক পুরাক্ষেত্র এই নদীর কূলে অবস্থিত। জেলার লোকসংস্কৃতির অনেকটাই জুড়ে আছে এই নদী। তাই পুরুলিয়া জেলা ও কাঁসাই নদী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের থেকে অন্যকে আলাদা করা যায় না।

(২) **কুমারী**— এটি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। প্রাগৈতিহাসিক পরিচয় এর সমগ্র নদীখাতে। এই অঞ্চলের বিখ্যাত জৈন নিদর্শনগুলি এর দুই তীরে। অযোধ্যা পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। মুকুটমণিপুর কংসাবতী জলাধারের নিকট কাঁসাই নদীতে এর মিলনস্থল। এর উপনদী টাটকো, নেংসাই হনুমাতা, আমরুহাসা, চাকা, জাম, যমুনা ইত্যাদি। বড়উরমার কাছে কুমারী নদীর উপর সেচ বিভাগের একটি জলাধার আছে। তাই নদীর জল ব্যাপক হারে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(৩) **দামোদর**— সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট উঁচু ছোটনাগপুরের পালামৌ জেলার টোরির কাছে, খামারপৎ ও বীরজংগা পাহাড় থেকে সৃষ্ট সোনাজড়িয়া প্রসাবনই দামোদরের উৎপত্তিস্থল। ডালটনের মতে দা-মুন্ডা বা মুন্ডাদের জল থেকে দামোদর নামের উদ্ভব। সাঁওতাল মুন্ডাদের কাছে এই নদ ছিল দেওনদ বা দেবনদ। উৎসের কাছাকাছি দামোদরের খাত খুবই অসমান, উচু-নীচু, কোথও হ্রদ, কোথাও জলাশয় কোথাও জলপ্রপাত সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। ঝাড়খন্ডের রাজরাপ্পায় এর সঙ্গে ভেড়ানদী মিলেছে। প্রধান উপনদী বরাকর। দিশেরগড়ের কাছে এর সঙ্গে মিলেছে। এই নদীটি সাঁওতালডি থেকে পাঞ্চেৎ পর্য্যন্ত এই জেলাতে অবস্থান করছে। বিখ্যাত তেলকুপির মন্দির ও তৈলকম্প বন্দর এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এখন তা পাঞ্চেৎ জলাধারের গর্ভে। এটি জেলার একমাত্র নাব্য নদী। পুরুলিয়ার পর দামোদর বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে চাঁচাই গ্রামের কাছে মুন্ডেশ্বরীর মধ্য দিয়ে রূপনারায়ণে এসে পড়েছে। চীনের

হোয়াং-হোর-মত একসময় এই নদীটিকে বিশাল বন্যার কারণে দুঃখের নদী বলা হতো।

(৪) **দারকেশ্বর**— এর অন্য নাম ধলকিশোর বা ঢলকিশোর। প্রাচীন গ্রন্থে দ্বারিকেশ বা দ্বারিক নামেও প্রচলিত এই নদী। উৎপত্তি পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানার তিলাবনী পাহাড়ের কাছে। ধল্যাকিশোর ও দুধভরিয়া এই দুই জলধারার মিলিত রূপ দারকেশ্বর। এই নদীর উপনদীগুলি যথাক্রমে ডাংরা, অড়কষা, কাঁসাচোরা, গন্ধেশ্বরী ইত্যাদি। এই নদীটি বাঁকুড়া জেলাতেই অধিক প্রবাহিত। এর উপকূলে বহু প্রত্নস্থল বিদ্যামান পুরুলিয়ার অপর নদী শিলাবতী এর সঙ্গে মিশেছে।

(৫) **শিলাবতী**— অপর নাম শিলাই। এই নদীর প্রবাহে প্রচুর শিলা বা পাথরের আধিক্য। তাই হয়তো এব নাম শিলাবতী। বাঁকুড়ার শিলাবতীকে নিয়ে বহু লোক গাথা প্রচলিত আছে। শিলাবতী দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মিশেছে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার কাছে। এই দুই নদীর মিলিত স্রোতের নাম রূপনারায়ণ।

(৬) **সুবর্ণরেখা**— এর উৎপত্তি ঝাড়খন্ডের রাঁচী জেলার নাগড়া, সোনারডি গ্রামের কাছে। এর অববাহিকা অঞ্চল অধিকাংশই ঝাড়খণ্ড প্রদেশে। পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম থেকে দক্ষিণ দিকে তুলিন থেকে সুইসার নিকট দিয়ে বয়ে গেছে। তারপর আতনা স্টেশনের কাছে এই জেলা ছেড়ে ঝাড়খণ্ডে ঢুকেছে। এই নদীতে সোনা পাওয়া যায়। লৌক কাহিনীটি এইপ্রকার। বহুদিন আগে এখানে একবার অনাবৃষ্টি হওয়ায় বিশাল খরা দেখা দেয়। এই অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্থ অধিবাসীরা জলের আশায় ইন্দ্রদেবতার আরাধনা করেন। ইন্দ্র তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বলেন তোদের এই অঞ্চলে আমি স্বর্ণবৃষ্টি করে দিচ্ছি, যাতে তোদের কোন অভাব না থাকে। সেই থেকে এই অঞ্চলের নদী যথা টাটকো, সোনা ও সুবর্ণরেখা নদীগুলিতে সোনা পাওয়া যায়। সারাদিন কাজ করলে একজনের পেট চালানোর মতো সোনা আহরণ করা যায়। এই নদী অনেকটা পথ ঝাডখন্ড প্রদেশে প্রবাহিত হওয়ার পর মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং পরে তা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

(৭) **টাটকো**— ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে জন্ম। বান্দোয়ান-মানবাজারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জামতোড়িয়ার কাছে যমুনা নদীতে মিশে পরে মিশ্রিত জলধারা কুমারী নদীতে মিশেছে। মূল স্রোতটি দলমা পাহাড়ের উপকণ্ঠ হতে নির্গত। যাত্রা পথে বন্দোয়ানের পাহাড়ের অনেক ছোট ছোট জলধারা ঝরণা, জোড় মিশে একে নদীর রূপ দিয়েছে। এই নদীতে সোনা পাওয়া যায়। অনেক দরিদ্র মানুষ এই নদীর বালী ধুয়ে সোনা সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সারাদিন বালি ধুলে একদিনের মজুরীর মত সোনা সংগৃহীত হয়।

এছাড়াও পুরুলিয়া জেলাতে অজস্র ছোটোনদী ও জোড় আছে সেগুলিকে সেচবিভাগ ও কৃষিসেচবিভাগ বাঁধ দিয়ে সেচের কাজের উপযোগী করে তুলেছে। গড়ে উঠেছে বহু পর্যটন স্থল।

জেলার নদী, জোড় ও ঝরণার উৎপত্তিস্থল

বান্দোয়ানের পাহাড় ও দলমা রেঞ্জ ও কুইলাপাল পাহাড় অঞ্চল— টটকো, নেংসাই, সোনানদী কুমড়া, বুড়িঝরণা, লাউপাল, দোয়াশিনি যমুনা।

ঝালদা পাহাড়— কংসাবতী, সালদা, সেপাই।

অযোধ্যা পাহাড় ও তৎ সংলগ্ন পাহাড়— কুমারী, হনুমাতা, আমরুহামা, বাঁদু শাঁখা, যমুনা, রুপাই, কাররু, কাঁরিয়র, মাগুসাই, সাহারাজোড়, কয়রাবেড়া, কুলবেড়া, নহড়াহাড়া, তুরগা, বাহ্মনি কিষ্টবাজার, ফুলঝোর ইত্যাদি।

বরাবাজারের পাহাড়— কেঁররো জেলার অন্যান্য পাহাড় থেকেও যে সমস্ত নদী জোড় বেরিয়েছে সেগুলি যে সব অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাদের নাম এই প্রকার ঃ—

বেকো — কাশীপুর
মাজরা — কাশীপুর
ডাংরা — কাশীপুর
লিপানিয়া জোড়
তারাগনিয়া জোড় পুরুলিয়া মফস্বল/হুটমুড়া
গোলামারা জোড়
পাতলাই
মৌতোড় জোড়
চেলিয়ামা বাঁদামৌতোড়
বাঁদা জোড়
চাকা
মানবাজার
জাম
পারগা — পুন্দাগের খটঙ্গা পাহাড়
পৈতাজোড় — পুঞ্চা
ফুটিহারি — হুড়া
হড়াই
কু শটাঁড়/আনাড়া
গুয়াই
রামচন্দ্রপুরজোড় — মুরাডী
যমুনা জোড় — পুরুলিয়া

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যমুনা নামে এই জেলায় একাধিক নদী বা জোড়ের নাম আছে। একটি বাঁন্দোয়ানের কুইলাপালে, একটি বেড়াদাতে কুমারী নদীতে মিশেছে। একটি পুরুলিয়া শহরের নিকট দিয়ে বয়ে গেছে। মানুষের দেহের শিরা উপশিরার মত পুরুলিয়া জেলার ১৭০টি পঞ্চায়েত এলাকা ও ৩টি পৌরসভার মধ্য দি্য়ে অসংখ্য নদী ও জোড় বয়ে চলেছে। এই জলধারাকে ব্যবহার করে খরাপ্রবণ এই জেলার জলসমস্যার অনেকখানি মেটাবার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা আরও ব্যপকভাবে হলে, হয়ত একদিন আমরা এই জেলাকেও বলতে পারব "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা।"

তথ্য

১। শ্রী শক্তি সেনগুপ্ত
২। শ্রী বিজয় পাণ্ডা
৩। শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ
৪। শ্রী নন্দন দত্ত

রুক্ষ বুকে জলের বান, সাহেব বাঁধ

(নিবারণ সায়র)

শ্যামল কিশোর তেওয়ারী

মায়াবী প্রাকৃতিক পরিবেশে সুভাষ পার্ক সংলগ্ন ওয়াচ টাওয়ারের পাশে রৌদ্দুরে পিঠ দিয়ে সারাটা বেলা জলের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। অলস, অনিমেষ রোদ মেঘের খেলায় বেলা বাড়ে। সূর্য ক্রমে ঢলে পড়ে, রং বদলায় লেকের জল। অস্তগামী সূর্য যখন ভ্রু সন্ধির উজ্জ্বল টিপের মতো আকার নিয়ে সারা পশ্চিমাকাশে বেদনা বিধুর দৃশ্যের অবতারণা করে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে, বলে যায়—'আবার আসিব ফিরে', ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে লেকের পাড়ে অনুভবী প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ, যারা সারাদিনের কর্মমুখর চাঞ্চল্যের পরে একটু অন্য জগতের সন্ধানে রাখে তাদের নিরলস প্রয়াস, তারা মুগ্ধ হয়ে দেখে প্রকৃতির সে পালা বদলের মুহূর্ত। রং বদলায় লেকের জলে সাথে সাথে হয়ত অনেকের মনেরও রং বদলায় অথবা বদলায় না।

বিশাল এলাকার বিস্তৃতি নিয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে সাহেব বাঁধ, পোশাকি নাম যার—নিবারণ সায়র। আর ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো তারই পাশে রয়েছে জেলার গৌরব জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮২ এবং অন্য পার্শ্বে সুভাষ পার্ক যার প্রতিষ্ঠা ১৯৭৫। বিজ্ঞান কেন্দ্রের পাশে রয়েছে একটি সুশৃঙ্খল মাড়োয়ারি যুব প্রতিষ্ঠান। সায়রের আরেক দিকে শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সেকালের দানবীর ও শিক্ষাপ্রেমী মহান ব্যক্তিত্ব হরিপদ দাঁর দানে সাহিত্য মন্দির নামে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। পরে ১৯২৭ সাল হতে তা হরিপদ সাহিত্য মন্দির নামে অভিহিত হয়। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিও সাহেব বাঁধের পাড়ে অবস্থিত। সাহেব বাঁধের অন্য পাড়ে রয়েছে সিংহানিয়া নার্সিংহোম, লায়ন্স ক্লাব পরিচালিত চক্ষু হাসপাতাল প্রভৃতি। পুরুলিয়া শহরের বাসস্ট্যান্ড হতে প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বুকে দুটি দ্বীপ নিয়ে সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে শুয়ে আছে শহরের গৌরব এই সাহেব বাঁধ, যার পাশে অলস মুহূর্তে একটু বসলে মনে হয় পাহাড় হয়ত হাতের মুঠোয় নেই, রয়েছে একটু দূরে, যাদের নাম অযোধ্যা, গোর্গাবুরু। জঙ্গল হয়তো চোখের সামনে নেই, রয়েছে ঠিক একই রকম দূরে-হয় দুয়ারসিনী নয় সুতান। তবুও মনে হয় তারা আছে এবং অতি কাছে মনের আনাচে কানাচে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যেটুকু সবুজায়ন হয়েছে এবং হরিপদ সাহিত্য মন্দির হতে জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার দু-পাশে যে বিশাল বিশাল অতি প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে,

যার ছায়া নিয়তই লেকের জলে পড়ে, মৃদু ঢেউয়ে দোল খায়, তা দোল দেয় মনেও—সৃষ্টি করে অনুপম অনুরণন। ভোরের আলো ফোটার আগে এবং সাথে সাথে চারিদিকে প্রাতঃভ্রমণকারী নারী পুরুষদের নীরব পদচারণা এবং কোকিল, দোয়েল, বেনেবউ, ফিঙে ও ভিন্ দেশ থেকে উড়ে আসা পরিযায়ী পাখিদের প্রভাত বন্দনা দ্বীপভূমির আশেপাশে প্রকৃতিকে বিভোর করে তোলে। যদিও ছন্দপতনের মতো মাঝে মধ্যে হেঁকে বা ডেকে ওঠে শালিক, চড়াই আর হাঁড়িচাঁচারা।

ঘটনার ইতিবৃত্ত শুরু আজ হতে প্রায় দেড়শো বছর আগে। সেদিন ছিল না আজকের মতো পরিবেশবিদদের দাপট, ছিল না এ সম্পর্কে সচেতনতাও। ভূমিপুত্রদের কাজ ছিল গাছ কেটে গ্রাসাচ্ছাদন করা। রুক্ষ জলহীন জমি ছিল কৃষির অনুপযোগী। জনসংখ্যা আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল তবুও চাষহীন রুক্ষ জমির দরুন প্রায়ই হত চূড়ান্ত খাদ্যাভাব। অবিভক্ত মানভূম জেলার তৎকালীন কালেক্টার কর্ণেল টিকলে জলকষ্ট দূর করার জন্য পুরুলিয়া জেলের কয়েদিদের দিয়ে দীর্ঘ পাঁচবছর প্রচেষ্টায় তৈরি করান আজকের এই সাহেব বাঁধ। পঞ্চকোট রাজের দেওয়া একটি পুকুরকে মাঝে রেখে কাটা হয় এই বিশাল বাঁধ। কাজ শেষ হয় ১৮৪৩ সালে। সময় ও সাল নিয়ে এ সম্পর্কে ভিন্ন মতও শোনা যায়। কেউ বলেন কাজ শুরু হয় ১৮৩৮ সালে এবং শেষ হয় ১৮৪৩ এ আবার কেউ বলেন শুরু ১৮৪৩ এ এবং শেষ হয় ১৮৪৮ সালে। সাহেবকে ভালোবেসে মানভূমবাসীরা এর নাম দেন সাহেব বাঁধ। অজস্র কয়েদির শাবল, গাঁইতি ও কোদালের অমরত্ব পেলেন টিকলে সাহেব কিন্তু যাঁদের ঘাম ঝরা পরিশ্রমে এ বাঁধ তৈরি হয়, পুরুলিয়া জেলের সেই সব তৎকালীন কয়েদিদের নাম পাওয়া যায় না। ইতিহাসের এইরূপ পুনরাবৃত্তি বার বার দেখতে আমরা অভ্যস্ত। বিশাল অট্টালিকা হতে প্রাচীন স্থপতি-কোথাও শ্রমিকের নাম নেই, নেই তাঁদের ইতিবৃত্ত আর ইতিহাস। যমুনা তীরে তাজমহল সবাই দেখে, যুগ যুগ ধরে তাজমহল দিয়েছে কবিদের প্রেরণা, অমরত্ব পেয়েছে মমতাজ-শাহাজাহানের প্রেম কিন্তু কোথাও নেই তাঁদের নাম-যাঁরা গড়েছিল এই তাজমহল।

সাহেব বাঁধের উন্নয়ন নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে কখনো কখনো কাজ হলেও উপযুক্ত ভাবনা চিন্তা সহ দীর্ঘ মেয়াদী সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে তেমন কোনো প্রয়াস আগে হয় নি। ফলে বিশাল এই জলাধারের কিছুটা অংশ মজে যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে এর সার্বিক উন্নতির পরিকল্পনা শুরু হয় যার সঠিক রূপ পায় এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই। জাতীয় সরোবর হিসেবে এটিকে চিহ্নিত করার প্রয়াসও চলে। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রী দেবপ্রসাদের জানা (আই.এ.এস) জেলা শাসক ও জেলা সমাহর্ত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই এ পরিকল্পনায় বেগ আসে। নিজে সাহিত্য সংস্কৃতিমনা হওয়ার সুবাদে এবং এক অনুভবী প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ হওয়ায় তিনি শুধুমাত্র এর সৌন্দর্য্যয়নেই মনোনিবেশ করেন না, শুধুমাত্র এর চারিপাশে সবুজায়নের পরিকল্পনাই নেন না, এর মজে যাওয়া অংশ পুনরুদ্ধার করে আবর্জনা আসার পথ বন্ধ করেন এবং তাঁরই উদ্যোগে সারা সরোবর জুড়ে যত্রতত্র জমে থাকা কচুরীপানা ও শ্যাওলা তোলার বন্দোবস্ত হয়। এ কাজে পুরুলিয়া পৌরবিভাগের এক বিশাল সহযোগিতা ও অবদান রয়েছে কারণ তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পন্ন হয়। ২০ই আগস্ট ২০০১ এ তাঁর দপ্তর হতে প্রকাশিত 'সাহেব বাঁধ, এপ্রোজেক্ট' পুস্তিকা হতে তাঁর এই শুভপ্রচেষ্টার অনেক কিছুই আমরা জানতে পারি। মানুষের হাতে গড়া আয়তনে ও গভীরতায় এই বিশাল জলাধারটি রাজ্যের অনুরূপ কয়েকটির

অন্যতম। রাজ্য সরকারও অন্যতম বিশাল জলাধার হিসেবে শুধু একে স্বীকৃতিই দেন নি, এর উন্নয়নে গতি আনায় সচেষ্ট হয়েছেন। ৮৬ একর জায়গা জুড়ে এ বাঁধের যে এলাকা তার মধ্যে জল রয়েছে প্রায় ৭৬ একর জায়গা জুড়ে। উপরোক্ত প্রোজেক্ট রিপোর্ট হতে জানা যায় যে বর্ষার আগে যখন শহরে দারুণ দাবদাহ ও জলাভাব থাকে, তখন পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ শহরের প্রায় এক লক্ষ লোকের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৭ লক্ষ গ্যালন জল এই জলাধার হতে সরবরাহ করেন। সেই সময় এই জলাধারের জলের পরিমাণ থাকে প্রায় ৮.৫ লক্ষ মিটার কিউব বা ১৮৫ মিলিয়ন গ্যালন (ফেব্রুয়ারি হতে জুন পর্যন্ত)। বর্ষাকালে এটি যখন পরিপূর্ণতা পায় তখন তার মোট জলের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৮ লক্ষ মিটার কিউব—অর্থাৎ ৪০০ মিলিয়ন গ্যালন। আকাশের বৃষ্টি সরাসরি গ্রহণ, প্রাকৃতিক কারণে এর আভ্যন্তরীণ ঝর্ণা, দীর্ঘ পাড় বেয়ে বয়ে যাওয়া বৃষ্টির জলের আহরণ এই জলাধারের বিশাল আয়তনের জলের উৎস। এর পাড়ের পরিমাণ প্রায় ৪ বর্গ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ অংশ গ্রানাইটের ন্যায় কঠিন পাথুরে জমি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

সুভাষপার্কটি বনবিভাগের দায়িত্বে আসার পর এর শুধু সৌন্দর্যায়নই হয়নি—হয়েছে সবুজায়নও। সুন্দর বাগান, বাহারি ফুল, গোলাপ বাগ, একটু দূরের কমল উদ্যান, সবুজ ঘাসের লন এবং বিস্তৃত জলরেখার বুক চিরে দ্বীপভূমি পর্যন্ত ২৫০ মিটার দীর্ঘ পথের দুপাশে ছোট ছোট গাছ, লাল মোরাম এবং দ্বীপের ওয়াচ টাওয়ারটি এর এক অনুপম সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। দ্বীপভূমিতে এবং পার্কের বাগানে ইতস্তত সাজানো রয়েছে কংক্রিটের বসার ঠাঁই। একটু নির্জনতার সন্ধানে বা একটু প্রকৃতিতে আবগাহনের জন্য যাঁরা এখানে ছুটে আসেন, তাঁরা বেশ কিছু সময়ের পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যান। একটু নষ্টালজিক হতে বা নষ্টালজিয়ার আহ্বানে সাড়া দিতে তাই ছুটে আসতে হয় বারে বার।

সুভাষ পার্কটি মোট ৩.০৭ একর জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে এই শহরের এক ঝাঁক তরুণ উঠতি যুবক সাহিত্য পাগল হয়ে উঠেছিল। এখানেই প্রতি অপরাহ্নে আর সন্ধ্যেয় বসতো তাদের সাহিত্যবাসর। সত্তরের সেই অস্থির দিনগুলিতে যখন সারা বাংলা রক্তাক্ত আন্দোলনে জ্বলছে, তখন নতুন কিছু গড়বার ভাবনায় কবি মনস্ক এই ছেলেরা এখানেই বসে তৈরি করেছিল তাঁদের সাহিত্য সংগঠন। যা আজ পুরুলিয়া জেলার এক গর্বিত নাম। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে তাঁদের অনেকেরই নাম আজ তাঁদের এই পরিণত বয়সে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বাংলার কবি জীবনানন্দের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় এই দ্বীপভূমিতে। দিনটি ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০০২ সাল। রূপসী বাংলার কবিকে আমরা পেলাম রূপসী সায়রের ক্রোড়ে। এ এক অপরূপ নান্দনিক সংযোজন। এই দ্বীপটিতে যে ওয়াচ টাওয়ারটি রয়েছে তাতে এক নজরে পুরো জলাশয়টির সৌন্দর্যকে দেখা যায়। নীল আকাশের ছায়া পড়ে যেখানে সায়রের জল হয়েছে আরো গভীর নীল, সেখানে ভেসে বেড়ায় ভিন দেশ হতে উড়ে আসা অজস্র পরিযায়ী পাখি। যারা অনেকেই শীতশেষে আর ফিরে যায় না, সায়রকে ভালোবেসে রয়ে যায় এখানেই। অজস্র স্থানীয় ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উড়ে আসা পাখিরাও রয়েছে এখানে। নীচে সেসব পাখিদের কিছু বিবরণ দেওয়া হল।

পরিযায়ী পাখির নাম	যেখান হতে আসে
গানহিল	দক্ষিণ ভারত
গুরগুরা	ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ও এ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল।
ডুবডুবি	শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তান
ডিগহঙ্ক	উত্তর ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া।
কেরা	সাইবেরিয়া
কর্মা	পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ
ফালমুরগী	শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশ
লালকোষঞ, ডুমার	বালুচিস্থান।
পিহো, পিছয়া	শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ।

সাহেব বাঁধের দ্বিতীয় দ্বীপভূমিটি প্রথম দ্বীপ ভূমি হতে প্রায় ১০০ মিটার দূরে। এটি ঝোপঝাড়ে ভর্তি ও দুর্গম। সবুজ গাছ এবং সুদীর্ঘ ঘাসে ঢাকা এই দ্বীপভূমিতে অসংখ্য পাখি বাস করে। অজস্র সাদা বকের ঝাঁক সবুজের ওপর শ্বেত বিন্দুর ন্যায় বসে থেকে এ দ্বীপভূমিকে আকর্ষণের এক অনন্য নয়নাভিরাম মাত্রায় নিয়ে যায়। সুভাষ পার্কের এছাড়া একটি ওয়াইলড্ লাইফ মিউজিয়ামও রয়েছে। জেলার বন্য জীবন, হাতির দাঁত, বন্য জন্তুর চামড়া এবং বন্য জীবনের অজস্র ছবি সম্বলিত এই মিউজিয়ামটি ভ্রমণপিপাসু মানুষের একটি বাড়তি আকর্ষণ। সাহেব বাঁধের উত্তর পূর্ব পাড়ে রয়েছে জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র। সারা দেশের অনুরূপ ২১টি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অন্যতম এটি। তবে দেশের সর্বপ্রথম। এটি স্থাপিত হয় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে। জেলার মানুষের বিজ্ঞান মনস্কতার উন্নতিকল্পে এই শুভপ্রয়াসের দায়িত্বে রয়েছে একটি স্বশাসিত সংস্থা, যার নাম ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্ সায়েন্স মিউজিয়াম, কলকাতা। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্গত এটি। তিনটি গ্যালারি বিশিষ্ট এই জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, এখানের লোক সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অনেক আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক জিনিস লক্ষ করা যায় যা জ্ঞানপিপাসু জনেদের দেয় অভিনব পরিতৃপ্তি। কেন্দ্রটিতে কিছু জীবজন্তু, জ্যান্ত অজগর, বিজ্ঞানের নানা আকর্ষণীয় কৌশল সম্বলিত শিশুদের জন্য মজার জিনিস ও অন্যান্য ছোট ছোট মজার খেলা খেলার সামগ্রী রয়েছে। কেন্দ্রটির একটি নিজস্ব ভ্রাম্যমান শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষামূলক বাস (মোবাইল সায়েন্স এক্‌জিবিশান বাস) রয়েছে যাতে ২৪টি বিভিন্ন মডেল আছে এবং তা নিয়ে এই বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে প্রদর্শনী করতে যান। উদ্দেশ্য, গ্রামের মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করা। এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি সাজানো সুদৃশ্য অডিটোরিয়াম রয়েছে। জেনারেটর, মঞ্চ , মাইক্রোফোন প্রভৃতি সব কিছুর সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই অডিটোরিয়ামে বহু আলোচনা সভা, সায়েন্স সেমিনার, বিজ্ঞান কর্মশালা, বিজ্ঞান ভিত্তিক ফিল্ম শো অনুষ্ঠিত হয়। গঠনমূলক কোনো সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যও খুব কম ভাড়ায় সব সুযোগ সুবিধাসহ এই অডিটোরিয়ামটি প্রয়োজনে ভাড়াও দেওয়া হয়। অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে অতি পরিচ্ছন্ন এবং শহরের এক প্রান্তে প্রকৃতির কোলে অবস্থিত এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটি জেলার গৌরব।

সাহেব বাঁধ তথা নিবারণ সায়রের সৌন্দর্যায়ন, সবুজায়ন, জলের বিশুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা, এর আয়তন বৃদ্ধি ও তাকে সুরক্ষা করা ও সর্বোপরি এর পাড়কে সুগঠিত রেখে যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ হতে এর জলকে রক্ষার করার কাজ জেলা প্রশাসন—পুরুলিয়া পৌরসভা এবং জনগণের অকুণ্ঠ

সহযোগিতায় চালিয়ে যাচ্ছেন। পৌরসভার বন্দোবস্তে নির্দিষ্ট অর্থ জমার বিনিময়ে মাছ ধরার সুযোগ রয়েছে। অচিরেই ওয়াটার স্পোর্টসের (জলক্রীড়া) ব্যবস্থা হবে। বিগত ২রা জানুয়ারি, ২০০৩ হতে পুরসভার উদ্যোগে পাঁচটি প্যাডেল বোট এর দক্ষিণপ্রান্তে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় জলবিহারের জন্য এ বোটগুলি প্রতিদিনই পাওয়া যায়। বাঁধের পাড়ে যে বিশাল সারি দেওয়া অবৈধ গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ ছিল, প্রশাসনিক উদ্যোগে তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জল দূষিত করার যাবতীয় প্রক্রিয়া কঠোর হাতে বন্ধ করা হয়েছে। লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত যাতে কোনো ভাবেই জল দূষিত না হয়। স্নান, কাপড়কাচা, গোরু-মোষ ধোয়া প্রভৃতি বন্ধের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুরুলিয়া জেলার দায়িত্ব গ্রহণের পরেই জেলা শাসক শ্রী দেবপ্রসাদ জানা এই সরোবরের উন্নতিকল্পে প্রয়াস শুরু করেন। জেলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের নামাঙ্কিত এই নিবারণ সরোবরের উন্নয়নকে শ্রী জানা তাঁর আড়াই বৎসর দায়িত্ব কালের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য বহু প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এবং বহু সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতির বিকাশমূলক কাজ-কর্মের ফাঁকেও অক্লান্ত চেষ্টায় এগিয়ে নিয়ে যান এবং এর পরিপূর্ণ রূপরেখা তৈরি করে এই জেলায় অন্যান্য বহু কীর্তির মধ্যে একটি স্মরণীয় কীর্তি রেখে যান।

ন্যাশনাল লেক কনজারভেশান প্লানে যে প্রোজেক্ট নেওয়া হয় তাতে চারটি সরোবরের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা নেওয়া হয। সরোবরগুলি হল (১) রবীন্দ্র সরোবর (২) সুভাষ সরোবর (৩) মিরিক লেক এবং (৪) সাহেব বাঁধ তথা নিবারণ সায়র। স্থির হয় মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটকে অনুরোধ করা হবে সি. এম. ডি., এ-এর স্যাথে আলোচনাক্রমে যেন প্রোজেক্টটি তৈরি করা হয় এবং তা যেন কার্যকর করা হয় মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট, জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে। এ ব্যাপাবে সি. এম. ডি. এ-এর বিশেষ সচিবের পত্র নং-১৮৩(৮) / সি. এম. ডি.-এ (প্রেজেক্ট) / বিবিধ-৪/৯৩ তারিখ ০৯.০৮.২০০১ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রী জানা এ ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে লেগে থাকেন এবং বিভিন্ন সময়ে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, আরবান ডেভলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ডিভিশন্যাল কমিশনার বর্ধমান বিভাগ প্রভৃতির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে, প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে বারংবার যাতায়াত করে, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন সময়ে আমন্ত্রণ করে এই বাঁধটি পরিদর্শন করান এবং শেষ পর্যন্ত এর সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৩.৭৯ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে জাতীয় সরোবর সংরক্ষণ প্রকল্পখাতে এই নিবন্ধটি লেখা পর্যন্ত এই জেলা পেতে চলেছে। এ তথ্যটি কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভোলাপমেন্ট অথারিটির পক্ষ হতে আরবান ডেভোল্যাপমেন্ট দপ্তরের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠি হতে আমরা জানতে পারি। চিঠিটির নং-১১৭/ কে. এম. ডি. এ / উন্নয়ন / বিবিধ-৪ / ৯৩ (পিটি-১) তাং-১৬.০৭.২০০২।

এ নিবন্ধ লেখা শেষ হচ্ছে জুলাই ২০০৩ এর প্রথম সপ্তাহে। সাহেব বাঁধ তথা নিবারণ সায়রের অনেক উন্নতি ঘটবে। সকলের প্রচেষ্টায় জাতীয় সরোবরের মর্যাদা নিয়ে একদিন এর পরিকল্পিত রূপরেখার সার্থকতা আসবে। ভ্রমণপিপাসু মন নিয়ে যাঁরা এই প্রান্তিক জেলাটিতে আসেন তাঁরা এখানের অনেক বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখবেন কীভাবে আকাশের ছায়া নিবারণ সায়রের গভীর নিথর

জলে পড়ে। রাতের উপুড় আকাশে যখন থাকবে অজস্র নীহারিকার দীপাবলী, তার ছায়া পড়বে এর জলে আর মৃদু ঢেউয়ে দোল খাবে সে তারামণ্ডলী। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে অসংখ্য পাখি এর দ্বীপভূমি হতে কলকণ্ঠে সূর্যকে জানাবে বন্দনা। শীতের কোনো অলস দুপুরে অথবা গ্রীষ্মের কোনো গৈরিক অপরাহ্নে একান্তে নিভৃতে হয়ত কোন দুটি মন খুঁজে পাবে এই প্রকৃতির বুকে তাদের ঠিকানা আর মিলনের সুর। পাড়ে বসে স্ফটিকস্বচ্ছ জলে গোড়ালী ডুবিয়ে একটি একটি করে নুড়ি পাথর ছুঁড়বে এর জলে অথবা প্যাডেল বোটে চড়ে গাইবে মান্না দের সেই বিখ্যাত কালজয়ী গান—'এই শহর থেকে আরো অনেক দূরে / চলো কোথাও চলে যাই / ওই আকাশটাকে শুধু কাছে রেখে / মনটাকে কোথাও হারাই।' বোহেমিয়ান মনে রবি ঠাকুরের শেষের কবিতার নায়কের মতো হয়তো কোন অমিত রে, পাশে লাবণ্য থাক বা না থাক বলে উঠবে—"Blow gently over my garden / Wind of the southern sea / The hour my love cometh and calleth me."

হয়তো আমরা এইসব দেখে যেতে পারবো না, তবু মনে প্রাণে আশা করবো আগামী প্রজন্ম সৌন্দর্যপিপাসু মনে এর গভীর নিথর জলে চোখ রেখে কোনো অলস মুহূর্তেও ভাববে তাঁদের কথা—যাঁরা রেখে দিয়ে গেল একটু সুখের সন্ধানে বা একটু নির্জনতার খোঁজে-র উৎসস্বরূপ তাঁদের তিল তিল করে দেয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এই ঐতিহাসিক সায়র।

স্বাস্থ্য পরিষেবা : সমাজসেবা

পুরুলিয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিবর্তন

ডাঃ কিরীটীভূষণ সিনহা

কথাতেই আছে স্বাস্থ্যই সম্পদ—একথা চিরসত্য। এই গণযুগে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই গণচেতনার যুগ সার্থকতা লাভ করবে। আমাদের এই লাল মাটির জেলা পুরুলিয়াও আজ জাতীয় প্রগতির পথের পথিক। হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোনো জেলার সমৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে। পুরুলিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্রম-বিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে কতগুলি বিশেষ দিককে চিহ্নিত করে বর্ণনা করলে এর অগ্রগতি, জনসাধারণের চাহিদার প্রতিফলন এবং আগামী পরিকল্পনার বিষয়গুলি পরিস্ফুটিত হবে। সুতরাং এই প্রবন্ধে আমরা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব—(১) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য (রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা) সরকারি ও বেসরকারি

সারণি-১ সরকারিস্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো (১৯৫৬ সালে)

জেলাস্তরের পরিকাঠামো	ব্লকস্তরের পরিকাঠামো	ব্লকস্তরের নীচের পরিকাঠামো		মন্তব্য
		প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	
সদর হাসপাতাল পুরুলিয়া	জেলা বোর্ড পরিচালিত ডিসপেনসারি (১৬টি)	নাই	নাই	জনস্বাস্থ্য প্রতিরোধী কর্মসূচির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। হোমিয়োপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক কিছু ডিসেপেনসারি ছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমগ্র রাজ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই জেলার প্রতিটি ব্লক সদরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (১৫/১০ শয্যার হাসপাতাল) এবং ৪৬টি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৪ শয্যার হাসপাতাল) তৈরির সিদ্ধান্ত করা হয়। ছয় ও সাতের দশকে এই হাসপাতালগুলি জনসাধারণের সাধারণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীলতা লাভ করে। বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচিগুলির সফল রূপায়ণের সাথে সাথে রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এগুলি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সাতের দশকের প্রথমদিকে প্রতিটি ব্লকে একটি / দুইটি ন্যূনতম চাহিদা কর্মসূচির (Minimum Need Programme) বাড়ি এবং পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির জন্য প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে গ্রামীণ জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Rural Family Welfare Centre) খোলা হয়।

সারণি-২ সরকারিস্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো (সাতের দশকের শেষে)

জেলাস্তরের পরিকাঠামো	ব্লকস্তরের পরিকাঠামো	ব্লকস্তরের নীচের পরিকাঠামো		মন্তব্য
		প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	
সদর হাসপাতাল পুরুলিয়া	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (২০টি) গ্রামীণ জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (২০টি)	সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৪৬টি)	ন্যূনতম চাহিদা কর্মসূচি গৃহ	জনস্বাস্থ্য প্রতিরোধী কর্মসূচিগুলি আলাদাভাবে ভাড়াবাড়ি হতে পরিচালিত হত।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় আটের দশকে (১৯৮৪)। জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়। প্রতি ৫০০০ (তফশিলি উপজাতি এলাকার ক্ষেত্রে ৩০০০) জনসংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট হয় একটি করে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র (Sub-Centre)। প্রতি ২৫-৩০ হাজার জনসংখ্যার জন্য এক-একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রতিটি কমিউনিটি ব্লকে একটি করে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিহ্নিত হয়। পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয় কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রেও—যে সকল কর্মী এতদিন পর্যন্ত একটিমাত্র কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদেরকে বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নির্দিষ্ট করে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের কাজের সাথে যুক্ত করা হয়। নতুনভাবে নিয়োগ করা হয় মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের। জাতীয় ও রাজ্যস্তরের এই কর্মসূচির সফল রূপদানের জন্য আমাদের এই জেলায় তৈরি হয় ৩৮৫টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, ৫৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ২০টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য এগিয়ে আসে India Population Project - IV। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চারটি জেলায়—পুরুলিয়া,'বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমানে এই প্রকল্প নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের টাকায় ১৬৯টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র (প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে) ৭টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণসহ সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবর্ধন ও ২০টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবর্ধন করা হয়। তৈরি হয় নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্য নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, পুরুলিয়া। প্রতি ১০০০ জন সংখ্যাপিছু একজন দাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৫টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে/কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (মানবাজার, হুড়া, কোটশীলা, বাঁশগড় ও হারমাড্ডি,) উন্নীত করা হয়। মহকুমা শহর রঘুনাথপুরে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরি হয়। IPP-IV প্রকল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানকে একলাফে অনেকটা উপরে পৌঁছে দেয়। পাশাপাশি একথা অনস্বীকার্য যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সঠিক স্থান নির্ধারণের ব্যর্থতা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। জনসাধারণের মধ্যে সরকারি সম্পত্তির প্রতি মালিকানা সৃষ্টির অনুভূতি তৈরির ব্যর্থতার জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কখনই জনসাধারণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চমানে পৌঁছোতে পারেনি।

সারণি-৩ সরকারিস্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো IPP-IV প্রকল্পে					
জেলা স্তরের পরিকাঠামো	মহকুমা স্তরের পরিকাঠামো	ব্লক স্তরের পরিকাঠামো	ব্লক স্তরের নীচের পরিকাঠামো		মন্তব্য
			প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	
* সদর হাসপাতাল পুরুলিয়া * নার্সিং ট্রেনিং স্কুল পুরুলিয়া	*স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, রঘুনাথপুর	*পাঁচটি গ্রামীণ / কমিউনিটি হাসপাতাল *পনেরোটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৭৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩৮৫টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	১৪৩টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ভাড়া বাড়িতে চালানো হয়

নব্বই-এর দশকের গোড়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোর পর্যালোচনা করতে গিয়ে রাজ্য সরকার অনুভব করেন চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে রুগির চাপ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ক্রমবর্ধমান। মধ্যবর্তী স্তরের হাসপাতালগুলিতে (গ্রামীণ হাসপাতাল/ মহকুমা হাসপাতাল /জেলা হাসপাতাল) রুগির ভীড় তুলনামূলকভাবে কম। কারণ হিসাবে মধ্যবর্তী স্তরের হাসপাতালগুলি একদিকে যেমন পরিকাঠামোর অভাব (ঘরবাড়ি ও যন্ত্রপাতি) পরিলক্ষিত হয়, পাশাপাশি অভাব অনুভূত হয় দক্ষ চিকিৎসক (Specialist) এবং দক্ষ কর্মীর। মধ্যবর্তী স্তরে এই হাসপাতালগুলির উন্নতি ঘটাতে পারলে একদিকে যেমন মেডিক্যাল কলেজগুলির ভীড়কে কমানো যাবে (উন্নতমানের দক্ষ পরিষেবার উন্নত পঠনপাঠনের মান ও গবেষণার জন্য যা জরুরি) অন্যদিকে সাধারণ মানুষও স্বল্প দূরত্বের মধ্যে পাবে দক্ষ চিকিৎসা পরিষেবা—এই রকম লক্ষ্য নিয়েই ১৯৯৩ সালে ৭০১ কোটি টাকার বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প—স্টেট হেলথ সিস্টেম ডেভলপমেন্ট—২ নেওয়া হয়।

মধ্যবর্তী স্তরের হাসপাতালগুলিতে এক অত্যাধুনিক দক্ষ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পুরুলিয়া জেলায় সদরহাসপাতাল পুরুলিয়া, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল রঘুনাথপুর এবং পাঁচটি গ্রামীণ/কমিউনিটি হাসপাতাল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকল্পের গৃহীত মূল বিষয়গুলি হল—

(১) হাসপাতালের ঘরবাড়ির নবনির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিমার্জন।

(২) আধুনিক চিকিৎসার জন্য যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্র ক্রয়।

(৩) বর্জ্য পদার্থের স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়াকরণ।

(৪) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি—(ক) এম্বুলেন্স পরিষেবা (খ) টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারকম প্রভৃতি।

(৫) রেফারেল পরিষেবা—প্রতিটি স্তরের হাসপাতালের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য Feedback ব্যবস্থা।

(৬) হাসপাতালগুলিতে ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।

(৭) রোগের নজরদারি (Disease Surveillance)

(৮) Health Management Information System (HMIS)

(৯) কর্মীর প্রশিক্ষণ—Referral, Disease Surveillance, Waste Management, HMIS, IEC, Clinical Training Managment Training প্রভৃতি।

(১০) চুক্তিভিত্তিক দক্ষ চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীর নিয়োগ

(১১) তথ্য, শিক্ষা ও জনসংযোগ (IEC) ব্যবস্থা।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প রূপায়ণের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলির মান বৃদ্ধি পায় এবং এগুলি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে নীচের সারনীগুলিতে একনজরে লক্ষ করা যায় প্রকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ও তার সুফল।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পে হাসপাতাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন

(ক) হাসপাতাল ঘরবাড়ি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

হাসপাতালের নাম	প্রকল্প গ্রহণের পূর্ববর্তী অবস্থা	প্রকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা	প্রকল্প ব্যয় (টাকা)	প্রকল্পের সুফল
মানবাজার গ্রামীণ হাসপাতাল	সংস্কারযোগ্য সকল বিভাগ	হাসপাতালের বহিঃ বিভাগ অন্তঃ বিভাগ ও অন্যান্য ঘরবাড়ির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬০ লক্ষ	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাসপাতালবাড়িতে স্বাস্থ্য পরিষেবা
হুড়া গ্রামীণ হাসপাতাল	ভগ্নপ্রায় সংস্কারযোগ্য হাসপাতালবাড়ি ও কর্মীদের কোয়ার্টার। নতুন কমপ্লেক্সে অচালু হাসপাতালবাড়ি	নতুন হাসপাতাল বাড়ীতে গ্রামীণ হাসপাতাল চালু করা সহ সমস্ত বাড়ির ব্যাপক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫৪.৭ লক্ষ	প্রশস্ত ঝকঝকে নতুন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা
কোটশিলা গ্রামীণ হাসপাতাল	সংস্কারযোগ্য হাসপাতাল-বাড়ি নতুন হাসপাতালের অচালু অবস্থা	হাসপাতালবাড়ি ও কর্মীদের কোয়াটারের সংস্কার সহ নতুন ভবনে হাসপাতাল চালু করা	৫৯ লক্ষ	প্রশস্ত ঝকঝকে নতুন হাসপাতাল চালু
বাঁশগড় কমিউনিটি হেলথ সেন্টার	সংস্কারযোগ্য সকল বিভাগ	হাসপাতালবাড়ির সংস্কার	৩৩.৫ লক্ষ	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে হাসপাতাল চালু
হারমাড্ডি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার	নতুন বাড়ির অচালু অবস্থাসহ সংস্কারযোগ্য হাসপাতালবাড়ি	হাসপাতালবাড়ির ব্যাপক সংস্কারসহ নতুন বাড়িতে হাসপাতাল চালু করা	৫২.৫ লক্ষ	প্রশস্ত পরিবেশে ঝকঝকে চালু হাসপাতালবাড়ি
রঘুনাথপুর মহকুমা হাসপাতাল	অপরিসর স্থানে হাসপাতালের চালু অবস্থা	নতুন বহিঃবিভাগ অন্তঃবিভাগ ও অস্ত্রোপচার কক্ষের ব্যাপক সংস্কারসহ কর্মীদের কোয়াটারের সংস্কার	৮০.৬ লক্ষ	প্রশস্ত পরিবেশে নতুন বহিঃবিভাগসহ ঝকঝকে হাসপাতাল
পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল	অপরিসর স্থানে ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলিতে হাসপাতালের চালু অবস্থা	নতুন বহিঃবিভাগ অন্তঃবিভাগের বাড়ি নির্মাণসহ সম্পূর্ণ সংস্কার	৩৩০ লক্ষ	হাসপাতাল পরিবেশের আমূল পরিবর্তন। প্রশস্ত ঝকঝকে আধুনিক হাসপাতাল বাড়িগুলি চালু।

হাসপাতালের নাম	প্রকল্প গ্রহণের পূর্ববর্তী অবস্থা	প্রকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা	প্রকল্পের সুফল
(খ) আধুনিক চিকিৎসার জন্য যন্ত্রপাতি			
মানবাজার / হুড়া / কোটশিলা গ্রামীণ হাসপাতাল বাঁশগড়/ হারমাডিড কমিউনিটি হেলথ সেন্টার	পুরানো অপ্রতুল যন্ত্রপাতি, আধুনিক রোগনির্ণয় যন্ত্রপাতির অভাব	প্রসব কক্ষ এবং অস্ত্রোপচার কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্রয়। আধুনিক রোগনির্ণয়ের জন্য সাধারণ রক্ত, মূত্র, মল পরীক্ষার ব্যবস্থা, এক্সরে মেশিনের ব্যবস্থা।	আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগনির্ণয় ও উন্নতমানের পরিষেবা প্রদান
রঘুনাথপুর মহকুমা হাসপাতাল	পুরানো অপ্রতুল যন্ত্রপাতি, আধুনিক রোগনির্ণয় যন্ত্রপাতির অভাব	রোগনির্ণয়, প্রসব করা এবং অস্ত্রোপচার কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্রয়। এক্সরে এবং আলট্রা সোনোগ্রাফির ব্যবস্থা	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাসপাতালবাড়িতে স্বাস্থ্য পরিষেবা
পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল	পুরানো যন্ত্রপাতি/আধুনিক রোগনির্ণয় যন্ত্রপাতির অভাব	আধুনিক রোগনির্ণয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার এক্সরে, আলট্রা-সোনোগ্রাফি, ইকো-কার্ডিওগ্রাফি, অটোএনালাইজার প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ অস্ত্রোপচার কক্ষ	আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা
(গ) বর্জ্য পদার্থের স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়াকরণ			
প্রকল্পের অধীনস্থ সকল হাসপাতাল	যত্রতত্র ছড়ানো অপরিষ্কার হাসপাতাল	(১) বিধিসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য পদার্থের শ্রেণীবিভাজন, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ (লাল, নীল ও কালো ব্যাগের ব্যবহার)। (২) হাসপাতাল পরিষ্কার চুক্তি ভিত্তিতে সংস্থা নিয়োগ।	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর প্রতিটি হাসপাতাল পরিবেশ
(ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি (অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা)			
অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাভুক্ত হাসপাতাল	অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার আগে রুগীর স্থানান্তরকরণের গড় সময় (৫০ কিমি দূরত্বের ক্ষেত্রে)	অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার পর রুগির স্থানান্তরকরণের গড় সময় (৫০ কিমি. দূরত্বের ক্ষেত্রে)	পরিষেবা ভোক্তার অর্থনৈতিক সাশ্রয় (%)
প্রকল্পের অধীনস্থ ৭টি হাসপাতাল	২ ঘন্টা ১৫ মিনিট	১ ঘন্টা ১০ মিনিট	৬০%

এতদ উন্নতি সত্ত্বেও মনে হয় ঘরবাড়ি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় প্রভৃতি আরও সুষ্ঠুভাবে ঘটাতে পারলে আমরা এই বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় হাসপাতালগুলিতে আরও সুফল ভোগ করতে পারব।

পুরুলিয়া মানসিক আরোগ্য প্রতিষ্ঠান

জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর একটি উন্নতির ফলক ১৯৯৩ সালে পুরুলিয়ায় ১৯০ শয্যাবিশিষ্ট মানসিক আরোগ্য প্রতিষ্ঠানের স্থাপন। মানসিক রুগির চিকিৎসা এবং অপরাধী নয় এমন মানসিক রুগির চিকিৎসার স্থান হিসাবে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র জেলার নয় সমগ্র রাজ্যের মানসিক রুগিদের চিকিৎসার স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আগামী দিনে আমাদের কাছে রয়েছে জার্মান অনুদানে রাজ্য সরকারের —Basic Health Project। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য আবার সুযোগ রয়েছে কিছু ঘরবাড়ি নির্মাণ। যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণের বিগত প্রকল্পগুলির অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে সাবধানে। ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিক বাস্তব অবস্থানসহ উন্নতমানের নির্ণয়, উন্নতমানের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্র ক্রয় এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের সাথে সাথে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারিক প্রয়োগই এই প্রকল্পের সার্থকতা এনে দিতে পারে। পৌঁছে দিতে পারে স্বাস্থ্যসূচকগুলিকে উচ্চগ্রামে যা হতে পারে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত, প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সঠিক সমন্বয়ে পুরুলিয়া জেলাতে এটা ঘটাই অভিপ্রেত। না হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী আরেকটা প্রকল্পের জন্য।

জনস্বাস্থ্য সমস্যা ও সমাধান

প্রাকস্বাধীনতা যুগে জনস্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে কোনো সংগঠিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল না। কেবলমাত্র একটি হাসপাতাল সমাজের নামমাত্র শ্রেণীর চিকিৎসার চাহিদা মেটাত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সারা দেশে বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে পুরুলিয়া জেলাতেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অগ্রগতি শুরু হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ম্যালেরিয়ার মোকাবিলার জন্য ১৯৫৫ সালে নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (NMCP), ১৯৫৮ সালে উচ্ছেদ কর্মসূচি (NMEP) ১৯৭৭ সালে পরিবর্তিত কর্মসূচি (MPO) এবং ১৯৯৯ সালে প্রতিরোধী কর্মসূচি (NAMP), নেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিও এগিয়ে চলে বির্বতনের মধ্যে ১৯৫২ সালে পরিবার পরিকল্পনা (FP), কর্মসূচি, ১৯৬৭ সালে লক্ষ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা, ১৯৭০ সালে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা (MCH Service), ১৯৭৮ সালে টিকাকরণ কর্মসূচি (EPI), ওই একই বছরে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি (FW), হিসাবে ঘোষণা, ১৯৮৪ সালে সামগ্রিক টিকাকরণ কর্মসূচি (UIP), শিশুদের আন্ত্রিক প্রতিরোধে ORT-র প্রচলন। কর্মসূচি নতুনরূপে চেহারা পায় ১৯৯২-৯৩ সালে শিশুসুরক্ষা ও নিরাপদ মাতৃত্ব (CSSM) কর্মসূচিতে। বর্তমান প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচি (RCH), CSSM কর্মসূচি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত রূপান্তর।

সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির সফল রূপায়ণের জন্য জনস্বাস্থ্যর উন্নতি লক্ষণীয়। গুটিবসন্ত (১৯৭৭) এবং গিনিয়া ওয়ার্ম (১৯৯৮) উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে। পোলিও নির্মূলিকরণের পথে। কুষ্ঠ ও ফাইলেরিয়া আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দূরীভূত হবে। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্তের মধ্যে। জন সংখ্যার বৃদ্ধির হার এবং শিশুমৃত্যুর হার ক্রমশ নিম্নমুখী। জনস্বাস্থ্যের এইসব সাফল্যের প্রতিফলন দেখা যায় জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকের তুলনামূলক বিচারে।

স্বাস্থ্য সূচকের অগ্রগতি

সূচক	দেশ / রাজ্য / পুরুলিয়া জেলা	১৯৫১	১৯৮১	২০০১
১) জন্মকালীন গড় আয়ুষ্কাল (Life Expectancy at birth)	ভারত	৩৬.৭	৫৪.০	৬৪.৬
	পশ্চিমবঙ্গ	৪৩.২	৫৮.১	৬৮.২
	পুরুলিয়া	৩৯.৮	৫৫.২	৬৫.১
২) জন্মহার (CBR)	ভারত	৪০.৮	৩৩.৯	২৬.০
	পশ্চিমবঙ্গ	৩৩.৩	২৭.৭	২১.৩
	পুরুলিয়া	৩৭.৫	৩২.২	২৪.৮
৩) মৃত্যুহার (CDR)	ভারত	২৫.০	১২.৫	৮.৭
	পশ্চিমবঙ্গ	২০.৬	১১.২	৭.৮
	পুরুলিয়া	২৩.২	১১.৮	৮.২
৪) শিশুমৃত্যু হার (১ বছর পর্যন্ত) (IMR)	ভারত	১৪৬	১১০	৭০
	পশ্চিমবঙ্গ	১০৮	৮০	৫১
	পুরুলিয়া	১১৮	৮৬	৫৫
৫) ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা	ভারত	৭৫০ লক্ষ	২৭ লক্ষ	২২ লক্ষ
	পশ্চিমবঙ্গ	১২ লক্ষ	৬১৫১২	৭৩৭২০
	পুরুলিয়া	-	২৩৬৩৫	২২৫৬৫
৬) কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা (প্রতি দশ হাজারে)	ভারত	৩৮.১	৫৭.৩	৩.৭৪
	পশ্চিমবঙ্গ	-	৬১.৮	৪.০৩
	পুরুলিয়া	-	৩৩.৫	৮.৭২
৭) পোলিও আক্রান্তের সংখ্যা	ভারত	-	৩৯৭০৯	২৬৫
	পশ্চিমবঙ্গ			০৩
	পুরুলিয়া			০০

জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচকের উন্নতির এই সাফল্য প্রমাণ করে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে অন্যান্য দপ্তরগুলির বিশেষ করে পঞ্চায়েত, সাধারণ প্রশাসন, নিবিড় শিশু বিকাশ প্রকল্প, শিক্ষা, কৃষি, গ্রামীণ বিকাশ, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়। একবিংশ শতাব্দীর দোর-গোড়ায় এই সাফল্যের কথা মাথায় রেখেও এটা অনস্বীকার্য যে আমাদের জেলায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুহার রাজ্য ও দেশের উন্নত জেলাগুলির চেয়ে কিছুটা বেশি। তাই বলা যায় জনস্বাস্থ্যের এই উন্নতি সাধারণ জনসাধারণের একটা অংশের চাহিদা মিটিয়েছে ঠিকই কিন্তু সামগ্রিক উন্নতির জন্য আগামী দিনগুলোতে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

জেলার প্রধান জনস্বাস্থ্যের রোগগুলিকে এককভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় ৬০-৭০-এর দশকের ম্যালেরিয়ার প্রার্দুভাব হ্রাস পেলেও আটের দশকের শেষার্ধ থেকে ম্যালেরিয়ার পুনরায় উর্দ্ধমুখী। জেলার অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন ব্লকগুলি—বাঘমুণ্ডি, আড়ষা, বলরামপুর, ঝালদা - ১নং এবং ঝালদা - ২নং (২) বান্দোয়ান ব্লক এবং (৩) নেতুড়িয়ার পাঞ্চেৎ পাহাড়

সংলগ্ন এলাকাগুলি বিশেষভাবে ম্যালেরিয়া প্রবণ—ম্যালেরিয়া রোগীর মধ্যে 'ফ্যালসিপে রাম' পরজীবি (জীবনঘাতী) আধিক্য, উপসর্গবিহীন ম্যালেরিয়া রোগী এবং ঔষধের অকার্য্যকারিতা (Drug Resistance) আগামী দিনে জেলার ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে জ্বর হলেই রক্তপরীক্ষাসহ সঠিক মাত্রায় ক্লোরোকুইন বড়ি খাওয়া, যেখানে-সেখানে জমা জল না রাখা এবং শোবার সময় মশারির ব্যবহারই কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা দেশের মধ্যে সর্বাধিক মৃত্যুহার জনিত জনস্বাস্থ্য ব্যাধি। পুরুলিয়াতে বিষয়টা ব্যতিক্রম নয়। বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ মোটামুটিভাবে এগোলেও কর্মসূচি গতিলাভ করে "DOT" চিকিৎসা শুরু হওয়ার সাথে সাথে। দূরতম / দরিদ্রতম এলাকাগুলিতে রুগির সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা ঔষধের অকার্যকারিতা (Drug Resistance) আগামী দিনে এই কর্মসূচি সফল রূপায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে—তাই বিষয়গুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য প্রয়োজন।

* তিন সপ্তাহ ধরে ঘুসঘুসে জ্বর (অন্য কোনো কারণ ছাড়া) থাকলে যক্ষ্মার রোগের পূর্বাভাব বলে ভাবা যেতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির থুতু পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া একান্ত কর্তব্য। প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থুথু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। থুথুতে যক্ষ্মার জীবাণুর সনাক্তকরণই (বুকের ছবি নয়) যক্ষ্মা রোগকে নির্ণয় করে।

AIDS

HIV / AIDS সমস্যা সারা দেশে বেশ দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়লেও পুরুলিয়া জেলাতে এটা এখন বিশেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। সময়মত HIV / AIDS নিয়ে জনশিক্ষা, রক্তসঞ্চালনের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকাঠামোর প্রয়োগ এবং সংযত জীবনযাত্রাই আমাদের জেলাকে এই রোগের ভয়াবহতা থেকে দূরে রাখতে পারে। জেলায় সরকারি উদ্যোগে স্বেচ্ছা পরামর্শ দান ও পরীক্ষা-কেন্দ্র (VCTC) চালু হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচি চলছে। সমস্যা সমাধানে অন্যান্য সরকারি দপ্তর, ক্লাব ও সংগঠনগুলি সর্বোপরি জনসাধারণকে আরও একটু এগিয়ে আসতে হবে।

আন্ত্রিক

জলবাহিত রোগগুলির বিশেষত আন্ত্রিক (G. E.) কলেরা, হেপাটাইটিস্ এবং টাইফয়েডের নিয়ন্ত্রণে জেলার অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিষ্কার জলের উৎসের ব্যবহার, সঠিক জনচেতনা এবং শৌচাগারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারই একদিকে যেমন আন্ত্রিকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাকে কমিয়েছে তেমনই হ্রাস হয়েছে আন্ত্রিকজনিত মৃত্যু। ব্যাপকভাবে শৌচাগারের ব্যবহারের জনচেতনাকে তুলে ধরতে পারলে জলবাহিত রোগগুলিকে আমরা এই জেলায় আরও কমিয়ে ফেলতে পারব। আলোচনা করা দরকার জনস্বাস্থ্যের সেই দুটো রোগের কথা যেটা একান্তভাবেই এই জেলায় প্রকট-(১) কুষ্ঠ এবং (২) ফাইলেরিয়া।

কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গতিলাভ করে ১৯৮২ সালে MDT প্রবর্তনের সাথে সাথে, প্রতি দশহাজারে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই কর্মসূচী বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাথে একীকরণ করে দেওয়া হয়। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির (TLM, GMLF, GLRA) এবং পঃবঙ্গ কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কুষ্ঠরোগীর আশু শনাক্তকরণ (Early detection) এবং M.D.T পদ্ধতিতে

সম্পূর্ণ চিকিৎসাই এই রোগকে জেলা থেকে দূরীভূত করবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। বর্তমানে এই জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কমে প্রতি দশ হাজারে ৫.৬ হয়েছে। আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যাকে প্রতি দশহাজারে এক-এর নীচে নামিয়ে আনতে হবে।

ফাইলেরিয়া

১৯৯৪ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী এই জেলার প্রতি ১০০ জন জনসংখ্যার ১৬ জন ফাইলোরিয়া রোগে আক্রান্ত এবং প্রতি ১০০ জন জনসংখ্যার ১০ জনের রক্তে ফাইলোরিয়ার জীবাণু বর্তমান। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ১৯৯৫ সাল থেকে গৃহীত 'মাস ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশন' (Mass Drug Distribution) কর্মসূচি নেওয়া হয় (ভারতের আরও ১২ জেলাসহ)। এই কর্মসূচির সুফল জেলা পেতে শুরু করেছে। ফাইলেরিয়ার নতুন রুগির সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। জনচেতনা বৃদ্ধি, মশারীর ব্যবহার এবং আক্রান্ত রুগীর পুনর্বাসন কর্মসূচি ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণে আরো গতি আনতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র সংক্রামিত রোগের নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবলেই চলবে না, আমাদের মাথায় রাখতে হবে 'মধুমেহ' (Diabetes), উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগ (Hypertension) এবং দুর্ঘটনা (Accident)-এর মতো অসংক্রামিত বিষয়গুলির কথা যা বর্তমানে আমাদের রোগবিন্যাস সূচির আক্রান্ত এবং মৃত্যুহারের একটা বিশেষ অংশ দখল করে রেখেছে। খেয়াল রাখতে হবে জনস্বাস্থ্য উন্নতির সাথে আমাদের গড় আয়ুষ্কাল বাড়ছে, বাড়ছে ৫০ ঊর্ধ্বের জনসংখ্যা। সুতরাং বার্ধক্যজনিত অসুখের চিকিৎসাকে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচি

জেলায় জনস্বাস্থ্যের আলোচনা শেষ করব অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচিকে উল্লেখ করে। আমাদের জেলায় ৫০ বছর ঊর্ধ্বে অন্ধব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি হয়েছে। প্রায় প্রতিবছর ১২-১৩ হাজার ছানি অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে।

তবুও এই কর্মসূচিকে আমাদের সফল রূপায়ণের জন্য ব্লকস্তরে বেস ক্যাম্পের মাধ্যমে ছানি অপারেশনের উপর জোর দিতে হবে।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য হেলথ কর্মসূচি

স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা যে-কোনো জেলার স্বাস্থ্য কর্মসূচির একটা অঙ্গ। সুখের কথা যে, স্বাভাবিক কর্মসূচিতে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথেও ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে জেলাতে প্রাথমিক স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

রক্তাল্পতা ক্রিমিজনিত পেটের অসুখ, ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তি, চর্মরোগ এবং দাঁতের অসুখই এই বয়সের শিশুদের প্রধান সমস্যা। বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে সফল রাখতে হলে এর ধারাবাহিকতাকে বিশেষভাবে বজায় রাখা প্রয়োজন।

ব্লকভিত্তিক ছানিজনিত অসুখে আক্রান্ত জনসংখ্যা (২০০০ সাল)

চাকলতোড়	—	১৮৮০	বান্দোয়ান	—	১১১০
কুস্তদৈব	—	২০৩৫	বরাবাজার	—	২০৯৩
পাড়া	—	২৫৩৮	বাঁশগড়	—	১৯২১
বান্দা	—	১১৬৯	পাথরাউ	—	২১৫৮
রঘুনাথপুর	—	১৮২১	ঝালদা	—	১২২৯
হারমাজি	—	১০২৪	কোটাপিলা	—	১৫৪০

ক্ষুরাডি	—	৯৭২	জয়পুর	—	১৯৭০
কাশীপুর	—	২৬৪৫	সিরকাবাদ	—	১০৭৫
হুড়া	—	১৩৬৫	পুরুলিয়া মিউ	—	১০৫৮
পুকা	—	১৬৫২	ঝালদা মিউ	—	৯৮৮
যানবাজার	—	১৭০২	রঘুনাথপুর মিউ	—	৩২১
বারী	—	১৫২১	আদ্রা	—	১৪৮
			মোট	—	৩৫১৩৫

জেলায় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি বর্তমানে প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির নবমোড়কের মাধ্যমে হাজির হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল বিষয়গুলি হল (১) মায়ের পরিচর্য্যা—প্রাক্-প্রসবকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তীকালে। নিরাপদ গর্ভপাতের বিষয়ও এর অন্তর্গত। (২) শিশুর পরিচর্যা—নবজাতকের পরিচর্যা টিকাকরণ, ভিটামিন 'এ' প্রতিষেধক, ডাইরিয়া প্রতিরোধে ORT, শ্বাসযন্ত্রের (ARI) অসুখের প্রতিরোধ এবং রক্তাল্পতার চিকিৎসা। (৩) সক্ষম দম্পতির পছন্দমত গর্ভনিরোধক বা সন্তানধারণের সম্যক ক্ষমতা সৃষ্টি। (৪) যৌননালীর সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং (৫) বয়ঃসন্ধিকালে সুস্বাস্থ্য-এই বিষয়গুলি প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্যের মুখ্য কর্মসূচি। আমাদের পুরুলিয়া জেলায় এই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য যে পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল (১) সামাজিক চাহিদাভিত্তিক কাজের মাত্রা নির্ধারণ (Target free approach based on community need) (২) পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ (De-centralised planning) (৩) গুণগত পরিষেবা (Quality care)-প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রকল্পে একদিকে যেমন সকল শ্রেণীর স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণ রয়েছে—ঠিক সেরকমই রয়েছে ধাইদের প্রশিক্ষণ গ্রামস্তরে ছোট ছোট দলে মহিলাদের প্রশিক্ষণ। আশা করা যায় এ সকল সম্মিলিত পদক্ষেপ আমাদের জেলায় মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হারকে হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

একনজরে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাম	স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের সংখ্যা	স্বাস্থ্য সরকারি বাড়িতে	উপকেন্দ্রের ভাড়া বাড়িতে
১।	বান্দা	২	কাড়া, নীলডি	১৫	৯	৬
২।	বান্দোয়ান	৩	চিরুডি*, লতাপাড়া,	১৬	১২	৪
৩।	বাঁশগড়*	৩	গুরুর নেকড়ে, মালতি	১৯	১১	৮
৪।	বরবাজার	২	কোরেঙ্গা, সিন্ধি*,	২২	১৩	৯
৫।	বারী	৪	বামনডিহা জার্মতোরিয়া	১৬	১২	৪
৬।	চাকলতোড়	৩	আক্রো, দিঘী, বসন্তপুর	১৮	১২	৬
৭।	হারমাড্ডি *	৩	লাগদা, পিচান্দী,	১৬	১০	৬
৮।	হুড়া*	৩	বেলকুড়ি রায়বধি*,	২১	১৪	৭
৯।	জয়পুর	৩	ভাসুরিয়া, বড়তোরিয়া,	১৭	১১	৬
১০।	ঝালদা	২	চাটুমাদার, লঘুড়কা*,	১৮	১৩	৫
১১।	কল্লোলী	৪	খেরিপিরা, বড়গ্রাম,	৩২	১৮	১৪
১২।	কোটশিলা*	২	দাড়িকুড়ি, সিধি, ইলু*,	২০	১২	৮

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাম	স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের সংখ্যা	স্বাস্থ্য সরকারি বাড়িতে	উপকেন্দ্রের ভাড়া বাড়িতে
১৩।	কুস্তাউর	২	মাহাতোমারা, তালাজুড়ি*,	২০	১২	৮
১৪।	মুরাডি	২	ক্রোসজুড়ি*, আগরডি,	১২	৯	৩
১৫।	যানবাজার*	২	কাচাবস্তুনি, বেগুনকোদর*,	২৪	১৩	১১
১৬।	পাড়া	৩	খটংগা, হুটমুড়া*, চয়নপুর,	২৫	১৪	১১
১৭।	পুঞ্চা	৩	সাতুড়ি*, বালিতোড়া,	১৭	১৪	৩
১৮।	পাথরডি	৩	পায়রাচালি, কুদা, নডিহা*,	১৯	১২	৭
১৯।	রঘুনাথপুর	২	অশুড়বধি, ফুরসাবাদ,	১৬	১০	৬
২০।	সিরকাবাদ	২	নওগড, আনন্দদীপ*,	২২	১১	১১
২১।	রঘুনাথপুর* স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (মহকুমা হাসপাতাল)		বাগদা, ক্ষেবেঙ্গ, তনতুড়ি*, অযোধ্যা*, বিলতোড়া*, বাবুগ্রাম, আড়ষা*, কাটাডি			
২২।	সদব হাসপাতাল* পুরুলিয়া					

[1] বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের আয়ত্তাধীন হাসপাতাল।

[2] প্রকল্পে তৈরি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

[3] জার্মান প্রকল্পে/রাজ্য সরকাব পবিকল্পিত আগামী দিনের ১০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

প্রসঙ্গ কুষ্ঠরোগ ঃ প্রেক্ষাপট পুরুলিয়া

সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরচন্দ্রিকা

সুরলোকে বিরাজ করছে তখন অসীম শান্তি। মহামুনি দধীচির তনুত্যাগজনিত অস্থি দিয়ে নির্মিত মারণাস্ত্র বজ্রের দ্বারা নিহত স্বর্গবিজয়ী অসুর বৃত্র। স্বর্গ পুনরাধিকারের আনন্দে দেবগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র পালন করছেন বিজয় মহোৎসব। নৃত্যাঙ্গনে নৃত্যরতা অপসরাগণ, সোমরসের ধারা বইছে সহস্র বর্ত্তিকা উদ্ভাসিত আনন্দ যামিনীতে। দেবরাজ এবং দেবগণ সকলেই প্রমত্ত।

পরদিন প্রাতঃকালে দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন রাজসভায়। সভাসদ্দের উপস্থিতি আজ অপেক্ষাকৃত কম। সোমপানের প্রভাবে চক্ষু যেন সম্পূর্ণভাবে উন্মীলিত হচ্ছে না। কাটেনি শরীরের অবসাদও। তবুও দেবরাজ প্রসন্নচিত্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন সভাসদ্দের দিকে। সকলেই স্মিতহাস্যে অভিবাদন জানালেন। এমন সময় সভাগৃহের অদূরে শোনা গেল বীণার ঝঙ্কার। ক্রমশ তা নিকটবর্তী হল। এ ঝঙ্কার ভগবান নারায়ণের বন্দনায় বন্দিত। সভাগৃহে প্রবেশ করলেন দেবর্ষি নারদ। দেবরাজ এবং দেবগণ সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন দেবর্ষিকে। দেবরাজ ইন্দ্রের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করলেন দেবর্ষি নারদ। স্বয়ং দেবরাজ এবং সভাসদ্গণ উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। পরিবর্তিত হয়ে গেল সভার চিত্র।

দেবরাজ ইন্দ্র জানতে চাইলেন দেবর্ষি নারদের আগমনের কারণ। দেবর্ষি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, "প্রভু মর্ত্যলোকের দিকে তাকান। মনুষ্যজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু। কিন্তু ব্যাধি নিরাময়ের বা প্রতিকারের কোন শাস্ত্র মর্ত্যলোকে এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই, অজস্র মানব আজ নানাবিধ ব্যাধিতে পীড়িত। তার প্রতিকারের জন্য দেবরাজকে আবেদন জানাই"। স্মিত হাসলেন দেবরাজ। বললেন, "মুনিবর, মর্ত্যবাসী আর্যগণের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা আমার রয়েছে। সমাজ এবং পৃথিবীর কল্যাণে তাঁরা চতুর্বেদ রচনা করেছেন। কিন্তু মানুষের ব্যাধি নিরাময় এবং আয়ু বর্ধনের কোনো শাস্ত্র এ যাবৎ রচিত হয়নি। মর্ত্যলোকে এ শাস্ত্র আমি দান করবো এবং তা পরিগণিত হবে পঞ্চম বেদরূপে। আয়ুর্বেদ।" অভিবাদন জানিয়ে প্রস্থান করলেন দেবর্ষি নারদ। পৃথিবীর কল্যাণে মনুষ্যকূলকে আয়ুর্বেদের জ্ঞান দান করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এ কাহিনী অবশ্য পৌরাণিক।

আয়ুর্বেদে কুষ্ঠরোগ

আজ থেকে প্রায় তিনহাজার বছর আগে রচিত আয়ুর্বেদেও রয়েছে কুষ্ঠরোগের উল্লেখ। অবশ্য কুষ্ঠ মানে সেখানে চর্মরোগ, সকলপ্রকার চর্মরোগই কুষ্ঠরোগ। আজ আমরা কুষ্ঠ বলতে যা বুঝি, ইংরেজিতে যা Leprosy, তা মূলত আয়ুর্বেদে "মহাকুষ্ঠ" এবং পরবর্তীকালে লোককথায়

"গলিত কুষ্ঠ" হিসেবেই পরিচিত। মূলত "কুষ্ঠ" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ "কুশনটী" থেকে যার অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া বা খেয়ে নেওয়া। প্রতিটি রোগেরই নিজস্ব একটি ধর্ম আছে। কুষ্ঠরোগের ধর্ম হল, সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা না হলে আকৃতির মধ্যে বিকৃতি ঘটানো। এই অঙ্গবিকৃতিই হল "কুষ্ঠ" নামকরণটির মূল প্রতিপাদ্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আয়ুর্বেদে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ এবং উপসর্গের আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে। উল্লেখ আছে দুইপ্রকার চিকিৎসার (১) তিনপ্রকার তেল—মহামারিচাদি, সোমরাজি এবং চালমুগরা তেল দিয়ে ক্ষতস্থানে এবং সারা শরীরে মালিশ করা এবং (২) মঞ্জিষ্টাদি ক্বাথ, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, গুগ্গুলু, অমৃতভাল্যতক, অভলেহ এবং রসসিন্দুর সেবন করা।

(সমসাময়িককালে আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলির সঠিক প্রয়োগ আমি দেখিনি। এ বিষয়ে বর্তমানকালে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বলেও আমি শুনিনি। তাই এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি না। তবে, আমার কৈশোরে ১৯৬৮-৭২ সালের মধ্যে আমি আমার কয়েকজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত প্রতিবেশীকে চালমুগরা তেল ব্যবহার করতে দেখেছি। কুষ্ঠরোগের প্রথম এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ড্যাপসোন্ আবিষ্কারের আগে চালমুগরা তেলের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল।)

আয়ুর্বেদ ছাড়াও ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে কুষ্ঠরোগের বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে দ্বারকা থেকে কোনারকে এসেছিলেন রোগমুক্তির জন্য। চন্দ্রভাগা নদীর জলে স্নান করে সূর্যপ্রণাম এবং নানাবিধ ভেষজ সেবনের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়েছিলেন শাম্ব। এছাড়া 'চরক' এবং 'সুশ্রুত' সংহিতায় আমরা কুষ্ঠরোগের উল্লেখ পাই। বাইবেলেও উল্লেখ রয়েছে কুষ্ঠরোগের। যিশুখ্রিস্টের স্পর্শে এবং আলিঙ্গনে কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়েছিলেন কয়েকজন কুষ্ঠরোগী। আজ সারা পৃথিবীব্যাপী খ্রিস্টান মিশনারিদের কুষ্ঠরোগের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার মূল প্রেরণা বাইবেল বর্ণিত সেই ঘটনা।

কুষ্ঠরোগ : বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য

● কুষ্ঠরোগ একটি জীবাণুর আক্রমণ এবং সংক্রমণের ফল। জীবাণুটির নাম, মাইকোব্যাক্টেরিয়াম্ লেপ্রি।

● সকল কুষ্ঠরোগীই সংক্রামক নন। ৮০-৮৫ শতাংশই হল অসংক্রামক। বাকি ১৫-২০ শতাংশ রোগী সংক্রামক।

● সংক্রমণ ঘটলেই রোগ হয় না। কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব ঘটলে তবেই কুষ্ঠরোগ হতে পারে।

● সংক্রামক কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক লক্ষণ :

—মসৃণ, তৈলাক্ত ও চক্‌চকে মুখমণ্ডল ও শরীরের ত্বক।

—কানের লতি মোটা ও লালচে হওয়া। কানের চারপাশও মোটা ও লালচে হতে পারে।

—সারা শরীরে অসংখ্য ছাই রঙের অথবা লালচে/তামাটে দাগ হওয়া।

● অসংক্রামক কুষ্টরোগের প্রাথমিক লক্ষণ:

—মাথার উপরিভাগ বাদ দিয়ে, শরীরের যে কোন স্থানে চুলকানিহীন, অসাড় দাগ।

—দাগগুলিতে লোম থাকে না, ঘাম হয় না।

—হাত-পায়ে অসাড়তা, ঝিন্‌ঝিনি এবং দুর্বলতা।

● সংক্রামক কুষ্ঠরোগী এক বছর এবং অসংক্রামক রোগী মাত্র ছমাস ওষুধ খেলেই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে যায়।

● রোগের শুরুতেই চিকিৎসা নিলে রোগ তাড়াতাড়ি সারে, কোনোরকম অঙ্গবিকৃতি হয় না এবং জটিলতা দেখা দেয় না।

● যে-কোনো সরকারি হাসপাতাল/চিকিৎসাকেন্দ্রে কুষ্ঠরোগের ওষুধ এবং পরামর্শ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

● চিকিৎসা চলাকালীন রোগী তার বাড়িতে/পেশাতেই থাকবেন। আলাদা থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

● অঙ্গবিকৃতি চিকিৎসায় অবহেলা বা দেরি করার পরিণাম। এর সঙ্গে সংক্রমনশীলতার কোন সম্পর্ক নেই। বিকলাঙ্গ রোগীও সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে, অঙ্গবিকৃতি নিয়েই সমাজে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন। তাদের দ্বারা বা তাদের তৈরি জিনিষপত্রের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ ছড়ায় না।

কুষ্ঠরোগ : সামাজিক সংস্কার

এত প্রাচীন একটা রোগ কিন্তু আবহমানকাল ধরে রয়েই গেছে পৃথিবীর বুকে। রোগটি অতি প্রাচীন কিন্তু সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি এসেছে ১৯৫০ সালে। যাইহোক, আগেই বলেছি, প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা না হলে এই রোগটি অঙ্গবিকৃতি ঘটায়। তাই সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক চিকিৎসা না থাকায় রোগাক্রান্তদের অঙ্গবিকৃতি প্রায় অনিবার্যই ছিল, যা থেকে জন্ম নিয়েছে ভয়, ঘৃণা এবং পরিবার ও সমাজ থেকে রোগীদের দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা। আরোপিত হয়েছে অনেক সামাজিক বিধি নিষেধ। পরিবারে কুষ্ঠরোগী থাকলে, সেই পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া পুকুরে স্নান করা, কুয়োতে জল তোলা, মন্দিরে পূজো দেওয়া, এ সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল কুষ্ঠীরোগীদের জন্য। গ্রামের শেষপ্রান্তে, নদীর পাড়ে বা শ্মশানের ধারে একটি বা কয়েকটি কুঁড়েঘর মানেই অবধারিতভাবে তা কুষ্ঠরোগীদের বাসস্থান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ অবস্থাটা চলে এসেছে বিংশ শতাব্দীর সাতটি দশক পর্যন্ত।

প্রেক্ষাপট পুরুলিয়া

নানাবিধ ভেষজ-চিকিৎসা পুরুলিয়ার বুকে চিরকালই ছিল। পাহাড়-বন-জঙ্গল সমৃদ্ধ পুরুলিয়ার মাটিতে জন্মাত অনেক ঔষধি যার ব্যবহার জানতেন আদিবাসী এবং প্রাচীন অধিবাসীরা, যা এখন প্রায় লুপ্ত। বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদের প্রয়োগ তৎকালীন দুর্গম, আদিবাসী-অধ্যুষিত পুরুলিয়ায় হয়েছিল কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। কিন্তু কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব যে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে তা ইতিহাসসম্মত। অন্ততঃ গত প্রায় দুই শতক ধরে। মানভূমের প্রবাদ হল—ঠুঁটা (বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগী), শুখা (খরা) এবং ভুখা (ক্ষুধার্ত) এই তিন নিয়ে মানভূম। যদিও এই জেলায় বিশেষত লালমাটি—কাঁকরযুক্ত দক্ষিনবঙ্গীয় অঞ্চল—পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম—জঙ্গলমহল সন্নিহিত মেদিনীপুর, এই অঞ্চলে কুষ্ঠরোগের হার তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জেলার থেকে অনেক বেশি। এর কোন নির্দিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। মনে করা হয়, মূল কারণ হল অপুষ্টি। অপর একটি কারণ সম্বন্ধে অবহিত করেছেন কলকাতার University College of Medicine-এর সদ্যপ্রয়াত গবেষক, অধ্যাপক ডাঃ এ. এন. চক্রবর্তী। তা হল, কুষ্ঠরোগের জীবাণু লালমাটিতে বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। যদিও তাঁর গবেষণা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তিনি প্রয়াত হন। আর শারীরবৃত্তীয় কারণ অনুধাবন করলে ধারণা করা যায় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের শরীরে কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব, যার জন্য কুষ্ঠরোগ সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। সবমিলিয়ে

প্রায় গত দুই শতাব্দী ধরে পুরুলিয়ায় কুষ্ঠরোগের ধারাবাহিকতা।

প্রেক্ষাপট পুরুলিয়া (মানভূম) : স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ

এবার আমরা প্রবেশ করি ইতিহাসের গর্ভগৃহে। আগেই বলেছি চিকিৎসা না হলে কুষ্ঠরোগের ধর্ম অনুযায়ী আকৃতির মধ্যে আসে বিকৃতি। বিকলাঙ্গ মানুষ হন বাস্তুচ্যুত—ঘর থেকে বিতাড়িত। এইসব অসহায়, গৃহহীন, বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগীর দল সমাজ এবং সংসার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আসতে থাকলেন পুরুলিয়া শহরের দিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঝুপড়ি তৈরি করে মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ যাদের লক্ষ্য। সেটা ১৮৫৫ সাল। অনেক কুষ্ঠরোগী তখন বাসা বেঁধেছেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু শহরে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কায়, ইংরেজ শাসকের আদেশে পুড়িয়ে দেওয়া হল তাদের ঝুপড়িগুলো। অতঃপর এগিয়ে এলেন জার্মান খ্রিস্টধর্ম প্রচারক পাদরি রেভারেণ্ড ওফ্‌মান। তার নিরলস প্রচেষ্টায় শহরের পশ্চিমদিকে ১৮৮৮ সালে তৈরি হল এশিয়ার বৃহত্তম কুষ্ঠাশ্রম দি লেপ্রোসি মিশন। ১৮৮৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা শুধু পুরুলিয়া জেলাই নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের কুষ্ঠরোগীদের সেবা করে এসেছে। বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, পরীক্ষাগার, স্বাস্থ্য-শিক্ষাকেন্দ্র, শল্যচিকিৎসা, চক্ষুচিকিৎসা, ক্ষতনিরাময় বিভাগ—সবই রয়েছে এখানে। ১৯৮২ সালে এটি ৩৪০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত হয়। ১৯৯৮ সালে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয় "সেলফ্ কেয়ার ইউনিটের" (স্বযত্ন-পদ্ধতি বিভাগ)। আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটির মূলকেন্দ্র লণ্ডন। লেপ্রোসি মিশনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, প্রশাসকগণ যেমন ডাঃ কক্‌রেন (পিতা-পুত্র উভয়েই) , ডাঃ থঙ্গরাজ, ডাঃ জেম্‌স ব্রাউন, ডঃ এ্যাণ্ডারসন, ডঃ ওয়াল্টার, মিঃ ভি. পি. দাস এবং তাঁর পুত্র সদ্যপ্রয়াত অনিল দাস, মিঃ পি. কে. রায়, মিঃ এডগার, রেভারেণ্ড প্যারোটী, জিন্ ওয়াট্‌সন—এরা সকলেই নানাভাবে পুরুলিয়া লেপ্রোসি মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ডাঃ শ্রীমতী কিরণ সরকার যিনি 'দিদি' নামে সমধিক পরিচিতা, গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে লেপ্রোসি মিশন, পুরুলিয়াতে সেবারতা।

লেপ্রোসি মিশন ছাড়াও জেলাতে স্বদেশীয়দের উদ্যোগে কুষ্ঠরোগীদের সেবা এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রভূত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

"১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ এ ব্যাপারে বহু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। ৩/১২/১৯৩৫ অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী মানভূমে কুষ্ঠরোগ প্রতিকার সম্পর্কিত এক মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগীদের আশ্রয়স্থলের জন্য জনসাধারণ ও সরকারের কাছে আবেদন জানান। তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন জীমূতবাহন সেন ও নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ঠিক এই সময়েই মানভূমের ডেপুটি কমিশনার হয়ে আসেন, শ্রী এ. এন. সেনাপতি। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় নব কুষ্ঠনিবাস গড়ে ওঠে। কেতিকার জমিদার শশধর চৌধুরি দান করেন ১২ বিঘা জমি। ঝগড়ু মাহাত নামের জনৈক কুষ্ঠরোগীর ছিল ৬০ মণ ধানের জমি, গন্ধু বাগদী ও জোরণ মাহাত এই কাজে দান করেছিলেন তাদের সম্পত্তি। অর্থ দিয়ে যারা সাহায্য করলেন : রায়সাহেব প্রেমচাঁদ মোদক (৩০০০·০০ টাকা), আইনজীবী ললিতকিশোর মিত্র ও তাঁর স্ত্রী (১০০০·০০), মিঃ মিড্‌লটন (১০০০·০০), পুরুলিয়া পুরসভা (১০০০·০০) তৎকালীন স্বায়ত্তশাসক মন্ত্রী (২০০০·০০), আবগারি বিভাগের অধ্যক্ষ (সংগৃহীত ৫৭৩৬·০০), সর্বমোট সংগৃহীত ২০১৪৮ টাকা ১৪ আনা ২ পয়সা থেকে ১৬০ জন রোগী রাখার জন্য ১১০০০·০০ টাকা খরচ করে আশ্রম গৃহ তৈরি হল। নব কুষ্ঠনিবাসের উদ্বোধন হল ১২.৫.১৯৩৭। সেই নব কুষ্ঠনিবাস এখনও আছে। এটি কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র।

তাঁরাই সেখানে চাষ করছেন ধান, সবজি সবকিছুই। পুরুষ ৮৬ জন ও মহিলা ৪৬ মিলিয়ে মোট ১৩২ জন সেরে যাওয়া কুষ্ঠরোগী আছেন এখন সেখানে। সরকারিভাবে বছরে অনুদান পাওয়া যায় ৩ লক্ষ টাকা।" *(আমাদের পুরুলিয়া: অমিয়কুমার সেনগুপ্ত)।*

(পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সাল থেকে কংসাবতী নদীর গ্রাসে পড়ে নবকুষ্ঠনিবাসের অনেকগুলি ঘরবাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অত্যন্ত ত্রাসের মধ্যে থাকেন এখানকার অধিবাসীরা। নতুন গৃহনির্মাণের জন্য সাংসদ শ্রী বীরসিংহ মাহাত পাঁচলক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। তৎকালীন জেলাশাসক এই প্রবন্ধের লেখককে একটি সমীক্ষা করে নবকুষ্ঠনিবাসের উন্নতির জন্য একটি প্রতিবেদন পেশ করতে অনুরোধ করেন। বর্ত্তমান লেখক জেলা কুষ্ঠ আধিকারিকের সাথে আশ্রম পরিদর্শন করে জেলাশাসকের কাছে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন। তাতে নবকুষ্ঠনিবাসের বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অন্ধ কুষ্ঠরোগীদের জন্য এক গুচ্ছ সুবিধাদানের ব্যাবস্থা ছাড়াও নদীর গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে নবকুষ্ঠনিবাসের ৮০ বিঘা জমিতে আশ্রমের স্থানান্তকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, এটি একটি উৎপাদনশীল পুর্নবাসনকেন্দ্রে পরিবর্তিত করার কথাও বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি রূপায়ণের আগ্রহ এবং উদ্যোগ কোন স্তরেই দেখা যায়নি।)

স্বাধীনতা উত্তরকালে পুরুলিয়াতে আরো দুটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। প্রথমটি ভারতবর্ষে পদ্ধতিগতভাবে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির পথিকৃৎ সংস্থা গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রোসি ফাউণ্ডেশনের (মূল কেন্দ্র—ওয়ার্ধা) শাখা, বলরামপুর কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ১৯৭৭ সালে এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় মূলত সংস্থার তৎকালীন সঞ্চালক, বিশিষ্ট কুষ্ঠ গবেষক, পদ্মশ্রী ডাঃ বিশ্বরঞ্জন চ্যাটার্জির উদ্যোগে। পরবর্ত্তীকালে সংস্থার সুযোগ্য সঞ্চালক সদ্য প্রয়াত শ্রী এস. পি. তারে এবং প্রকলপ-অধিকর্ত্তা শ্রীসুধাকর বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। বর্তমানে জার্মান লেপ্রোসী রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন বলরামপুর কেন্দ্রের অর্ধেক ব্যায় ভার বহন করছেন। বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর ও বরাবাজার ব্লকের ৩৪১টি গ্রামের প্রায় ৩,০০,০০০ জনসমষ্টির মধ্যে সংস্থার কাজকর্ম বিস্তৃত। ২৮টি গ্রামীণ চিকিৎসাকেন্দ্র এবং সংস্থার কার্যালয় বলরামপুরে বহির্বিভাগের চিকিৎসার মাধ্যমে প্রায় ১৭০০০ কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হয়েছেন। এছাড়া বলরামপুরে আছে একটি দশ শয্যার হাসপাতাল। আছে ল্যাবোরেটরি এবং ফিজিয়োথেরাপি বিভাগ। সংস্থার কর্মীদের জনসম্পর্ক বিশেষ শ্রদ্ধার দাবি রাখে। এদের আর দুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং জনচেতনা বৃদ্ধির জন্য লোকসংস্কৃতি এবং লোক-মাধ্যমের ব্যবহার। পুতুল নাচ, নাটিকা, ঝুমুর সংগীত ও কুষ্ঠকীর্তনের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রচারে এঁরা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আজ এই অনুষ্ঠানগুলো সরকারি আনুকুল্যে সারা জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে—পরবর্তীকালে যা স্বাক্ষরতা, বনসৃজন, স্বয়ংসিদ্ধা, পরিবার-পরিকল্পনা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রসারিত হয়েছে। দ্বিতীয় কৃতিত্ব হল, সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রায় ১৫০টি পরিবার এবং ১১২ জন ছাত্রসমাজে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত হয়েছেন। গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রোসি ফাউণ্ডেশন আগামী ২০০৪ সাল থেকে জেলায় সংশোধিত যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এছাড়া সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য একটি এক্স-রে ক্লিনিক, সাধারণ লেবোরেটরি এবং চক্ষুচিকিৎসা কেন্দ্রের কথাও গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা হচ্ছে। এ সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজন অনেকগুলি নতুন গৃহনির্মাণের। সাংসদ শ্রী বীরসিংহ মাহাত নির্মাণ কার্যের জন্য তাঁর স্থানীয় উন্নয়ন তহবিল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। কুষ্ঠনির্মূলন কার্যক্রমে

তাঁর এই অবদান প্রশংসার দাবি রাখে।

দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি হল আদ্রা লেপ্রোসি প্রোজেক্ট। এটি স্থাপিত হয় ১৯৮০ সালে। দক্ষিণপূর্ব রেলের মহিলা সংগঠন (South-Eastern Railway Womens' Organisation)-এর দান করা ১.৫ একর জমিতে আদ্রার সন্নিকটে মণিপুরে গড়ে ওঠে এই সংস্থাটি। জার্মান লেপ্রোসি রিলিফ এ্যাসোসিয়েশনের অর্থানুকূল্যে সংস্থাটি পরিচালিত হত। কাশীপুর এবং রঘুনাথপুর-২ ব্লকের ১৩৬টি গ্রামে ১,৩২,০০০ জনসংখ্যায় এদের কাজকর্ম বিস্তৃত ছিল। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়।

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার এবং পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলনে নিয়োজিত সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ কুষ্ঠকল্যাণ পরিষদের সদর দফ্তর আদ্রার মণিপুরে। এটি মূলত ছিন্নমূল কুষ্ঠরোগীদের সংস্থা। বিভিন্ন কলোনীর কুষ্ঠাক্রান্ত অধিবাসীদের এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য এঁরা সচেষ্ট। এ ছাড়া, আদ্রার মণিপুরে জার্মান লেপ্রোসি রিলিফ এ্যাসোসিয়েশনের দান করা জমি এবং বাড়িতে, মণিপুরে লেপ্রোসি রিহ্যাসবলিটেশেন সেণ্টার একটি বৃদ্ধাশ্রম, শিক্ষায়তন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রূপায়িত করতে চলেছেন। এই উদ্যোগের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হলেন সাংসদ শ্রী বাসুদেব আচারিয়া মহাশয়।

মণিপুর, সিমনপুর এবং যমুনাবাঁধে আছে তিনটি কলোনি। নবকুষ্ঠ নিবাস সমেত এই চারটি জায়গাতে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, তাদের পরিবার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে প্রায় ২৫০০ জন লোক বাস করেন।

বেসরকারি উদ্যোগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এবং পুরুলিয়া জেলার গর্বের সংস্থা হল পদ্মশ্রী ডাঃ বিশ্বরঞ্জন চ্যাটার্জির লেপ্রোসি ফিল্ড রিসার্চ ইউনিট।

এটি ঝালদাতে অবস্থিত। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪, এই ২০ বছর ডা. চ্যাটার্জি নিরলসভাবে গবেষণা করে গেছেন এখানকার ল্যাবোরেটরিতে। প্রাথমিকভাবে গবেষণাগারের সমস্ত খরচ বহন করত আমেরিকার জন্ হপকিন্স্ ইউনিভার্সিটি। পরবর্তীকালে দি লেপ্রোসি মিশ্রন ইন্টারন্যাশন্যাল, লন্ডন এর দায়িত্ব নেয় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে সমস্ত রকম আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্য কোন সরকারই, ডাঃ চ্যাটার্জীর গবেষণা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও আর্থিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন নি। অর্থাভাবে তখন থেকে গবেষণার সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যাইহোক, ডা. চ্যাটার্জির উল্লেখযোগ্য দুটি আবিষ্কার হল, কুষ্ঠরোগের জীবাণুর কৃত্রিম মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি (Culture of Leprosy bacillus in artificial media) এবং কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ভ্যাক্সিন্। দুটি আবিষ্কারের পদ্ধতিই আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নানাবিধ জটিলতার কারণে দুটি আবিষ্কারই এখনও বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃতির অপেক্ষায়।

প্রেক্ষাপট পুরুলিয়া : শাসকীয় কার্যক্রম

এরপর আসি সরকারি উদ্যোগের কথায়। পৃথিবীর যে কোন দেশের মতোই কুষ্ঠরোগ এবং কুষ্ঠ নির্মূলনের কাজ প্রথমে হয়েছে বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে। পরবর্তীকালে তা ব্যাপকতা পেয়েছে সরকারি কার্য্যক্রমের মাধ্যমে।

১৯৫৫ সালে সর্বভারতীয় স্তরে কুষ্ঠরোগ নির্মূলনের জন্য গঠিত হয় জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম। গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশন প্রবর্তিত কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সর্বেক্ষণ, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং চিকিৎসা জাতীয় কার্যক্রমে গৃহীত হয়। প্রাথমিকভাবে দেশের যে সমস্ত জেলাতে কুষ্ঠরোগীর হার বেশি সেই সমস্ত জেলাতেই কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়। পুরুলিয়া জেলা

অবধারিতভাবে পড়ে তার মধ্যে। ধীর লয়ে শুরু হয় কাজ—একটিমাত্র ঔষধ, ড্যাপসোন্‌ নিয়ে। অন্যদিকে সংস্কার, ভয়, ঘৃণার জন্য অত্যন্ত কমসংখ্যক কুষ্ঠকর্মী দিয়ে, মূলত তা ছিল প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র-কেন্দ্রিক। পরবর্তীকালে জেলাতে গঠিত হয় পাঁচটি কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। মানবাজার, রঘুনাথপুর, বলরামপুর, হুড়া এবং পুরুলিয়া সদর। এর সঙ্গে তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিয়ে জেলার সমস্ত গ্রামে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের কাজ নিবিড়ভাবে শুরু হয়ে যায়।

১৯৮২ সালে 'কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ' কর্মসূচি 'কুষ্ঠ নির্মূলন' কর্মসূচিতে উন্নীত হয়। শুরু হয় বহুবিধ ওষুধ প্রয়োগে চিকিৎসা। প্রথমে শুধু সংক্রামক রোগীদেরই এই পদ্ধতিতে নিয়ে আসা হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে সমস্ত কুষ্ঠ রোগীদের (সংক্রামক এবং অসংক্রামক) Multidrug treatment-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Dapsone, Rifampicin এবং Lampreme—এই তিনটি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। Multidrug treatment-এর সুবিধা হল, সংক্রামক রোগী একবছর এবং অসংক্রামক রোগী ছ'মাসের মধ্যেই সেরে যায়। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা নিলে অঙ্গবিকৃতি হয় না। যার ফলে ১৯৮২ থেকে ২০০২-এর মধ্যে রোগীর সংখ্যা দ্রুতভাবে কমে যেতে থাকে। ১৯৮২ সালে যেখানে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ছিল ৩৩৭ জন, সেখানে ২০০২ সালে কমে দাঁড়ায় ৯·৩৮ জনে। কিন্তু মুশকিল হল, নতুন রোগীর সংখ্যা গত দশ বছরে গড়ে একই থেকে যায়। সারণি দ্রষ্টব্য।

—ঃ সারণি ঃ—

বর্ষ	জনসংখ্যা (খসড়াকৃত)	বৎসরান্তে পুঞ্জীকৃত রোগী	প্রকোপ মাত্রা (১০,০০০)	বৎসরান্তে নতুন রোগী	অঙ্গ-বিকৃতি (শতাংশ)	শিশু (শতাংশ)
১৯৮২-'৮৩	১৮,৯৪,০০৯	২৭,৮২৩	১৪৬·৯০	৪,৬৯৬	১৩·২০	১৭·৯০
১৯৮৩-'৮৪	১৯,১৮,৭০৪	৩৪,০৫৭	১৭৭·৫০	৮,২৭৪	১১·৪	১৪·৯০
১৯৮৪-'৮৫	১৯,৪৩,৩৯৯	৩০,৭৪৪	১৫৮·২	৫,০৭১	১১·৯৬	২১·৩৮
১৯৮৫-'৮৬	১৯,৬৮,০৯৪	২৬,৭৯১	১৩৬·১০	৬,৪৪৫	৭·৭০	১৬·৮৭
১৯৮৬-'৮৭	১৯,৯২,২৭৮	১৯,৫৯৯	৯৮·৩০	৫,৯৮৮	৩·৯৯	১৭·৫৭
১৯৮৭-'৮৮	২০,১৭,৪৮৪	১২,৬১৯	৬২·৫৫	৫,৩৮১	৩·৪৬	১৭·৭৫
১৯৮৮-'৮৯	২০,৪২,১৭৯	১২,০৪০	৫৮·৯৬	৫,৪৬৭	৩·৫৯	১৮·২৫
১৯৮৯-'৯০	২০,৬৬,৮৭৪	১০,০২৪	৪৮·৫০	৪,০৭৫	২·৪৫	১৭·৭৯
১৯৯০-'৯১	২২,২৪,৫৭৭	৯,০২১	৪০·৫৫	৪,২০১	৩·৩১	১৮·৮৮
১৯৯১-'৯২	২২,৬১,৬৫৫	৮,৪৮৫	৩৮·৫১	৩,৭৫৫	২·৭৪	১৮·০০
১৯৯২-'৯৩	২৩,০৩,০০০	৭,৫৭৬	৩৩·০০	৩,৮৩২	২·৬৬	১১·৮৬
১৯৯৩-'৯৪	২৩,৪৫,০০০	৬,২৩৮	২৬·৬০	৩,৫৫১	১·৭৫	২১·২৯
১৯৯৪-'৯৫	২৩,৮৫,০০০	৫,৮৯৭	২৪·৭৩	৪,০৯৮	৩·১৫	২৩·৩৫
১৯৯৫-'৯৬	২৪,২২,০০০	৫,১৮৮	২১·৪২	৪,৬৬৩	২·৩২	২৩·৪৪
১৯৯৬-'৯৭	২৪,৫৮,০০০	৪,৯৬১	২০·১৮	৪,৪৮৮	২·১৪	২০·৫৯

১৯৯৭-'৯৮	২৫,৪৯,০০০	২,৬০৭	১০·২৩	৩,৭৪০	২·৬২	২০·১১
১৯৯৮-'৯৯	২৫,৮৬,০০০	৩,৩২৩	১২·৮৫	৬,১৩৪	১·৮৯	১৭·৪৮
১৯৯৯-'২০০০	২৫,৮৪,৪৯৮	৪,৯৩৮	১৯·১১	৬,৫৭৮	১·৯২	১৯·১৪
২০০০-'২০০১	২৫,৩৫,৭২২	১,৮৯০	৭·৪৫	৪,৩১৯	৩·০৬	১৮·৯৬
২০০১-'২০০২	২৫,৬৬,৩৪৮	২,৪০৬	৯·৩৮	৪,৭৪৩	১·৫৪	২০·৪১

* গত ১০ বৎসরে নতুন রোগীর গড় হার ১০,০০০ জনসংখ্যায় ১৮ জন

** গত ১০ বৎসরে নতুন রোগীর গড় সংখ্যা, প্রতি বৎসর—৪৫৪০ জন

১৯৯০ সালে কুষ্ঠ নির্মূলনের কাজে গতি আনার জন্য এবং সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য ২০০০ সালের মধ্যে কুষ্টরোগ নির্মূলীকরণের জন্য জেলা কুষ্ঠ সমিতি গঠিত হয়। জেলাশাসক হন পদাধিকারবলে তার সভাপতি।

পরবর্তীকালে নির্মূলীকরণের লক্ষ্যমাত্রা ২০০৫-এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং লক্ষ্য ধার্য করা হয় প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় ১ জন কুষ্ঠরোগী যাতে এই রোগটি আর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে পরিগণিত না হয়। Eradication Programme পরিবর্তিত হয় Elimination programme-এ। নির্মূলনের দিকে লক্ষ রেখে পরিবর্তিত কুষ্ঠ দূরীকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে (Modified Leprosy Elimination Campaign) ব্যাপক প্রচার ও কুষ্ঠরোগ নির্ণয়ের কর্মসূচি পালন করা হয়।

'একীকরণ' এবং কুষ্ঠ বিভাগের বিলুপ্তিকরণ

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কুষ্ঠ নির্মূলনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সরকারি স্তরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তা হল সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে কুষ্ঠ বিভাগের একীকরণ (Integration)। এতদিন কুষ্ঠরোগের জন্য আলাদা বিভাগ, চিকিৎসক এবং কুষ্ঠকর্মী, ক্লিনিক এবং হাসপাতাল ছিল। এরপর এই আলাদা বিভাগ আর থাকল না। ২০০১ সাল থেকে ধাপে ধাপে সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষিত করে কুষ্ঠরোগের কাজে নিয়োজিত করা হয়। ২০০২ সাল থেকে তাদের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এপ্রিল ২০০৩ থেকে সমস্ত কুষ্ঠকর্মীকে সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগ করে কুষ্ঠবিভাগে তুলে দেওয়া হয়। রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা চলে আসে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাযিত্বে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে চিকিৎসার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এরপর সংস্থাগুলি সহায়ক হিসাবে সাহায্য করবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া যাবে দেশের সর্বত্র, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে। মাসে একদিন নয়, প্রতিদিন; আলাদাভাবে নয়, সবার সাথে। অপর দিকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি স্বআরোপিত দায়িত্ব নিয়েছে অঙ্গবিকৃতি প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং জনচেতনা প্রসারের। এছাড়া লেপ্রোসি মিশনে রয়েছে শল্যচিকিৎসা এবং চক্ষুচিকিৎসার ব্যাবস্থা।

তবে এই একীকরণের ফলে কয়েকটা অসুবিধাও হবে। প্রথমত, সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ হয়েছে মাত্র তিনদিন। এটা পর্যাপ্ত নয়। দ্বিতীয়ত, গ্রাম-পর্যায়ে কুষ্ঠরোগের যে প্রচার হত, integration-এর ফলে তাতে অবশ্যই ভাঁটা পড়বে। যার ফলে প্রাথমিক লক্ষণ না জানার জন্য

অনেকেই চিকিৎসায় আসবেন অনেক দেরি করে। তাতে যেমন অঙ্গবিকৃতির আশঙ্কা থাকবে, তেমনই সমাজে সংক্রমণের রেশ ফল্গুনদীর মতো প্রবাহিত হতে থাকবে। আর গত তিনবছর বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়মিত শরীর-পরীক্ষা না (Survey) হওয়ার জন্য হঠাৎ করে রোগীর সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে কমে গেলেও অনির্ণীত রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। গত ডিসেম্বর '২০০২-তে চেলিয়ামা ব্লকে, বান্দা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত সাঁওতালডি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে জার্মান লেপ্রোসি রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন এবং জেলাস্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে যে Survey হয়েছে, তাতে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় ৩০ জন কুষ্ঠরোগী সনাক্ত হয়েছেন। এটা কিন্তু অশনিসঙ্কেত।

উপসংহার

সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের সাথে কুষ্ঠবিভাগের একীকরণ (Functional and structural integration)-এর সুবিধা এবং কয়েকটি অসুবিধার কথা আগেই বলেছি। একীকরণের প্রধান শর্ত হল, সমস্ত কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, বিশেষ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা, ক্ষত-নিরাময়ের চিকিৎসা, অসাড় পায়ের জন্য বিশেষ ধরনের জুতোর সরবরাহ, স্বাস্থ্যশিক্ষা, জনচেতনার প্রসার এবং অবশ্যই পুনর্বাসন। এই আবশ্যিক শর্তগুলি বর্তমানে জেলার সরকারি ব্যবস্থাপনায় কতটা সম্ভব, সে সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকেই যায়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে কী কাজ করবে তার কোন দিক্‌নির্দেশ নেই। একটা সংশয় রয়েই গেছে। লেপ্রোসি মিশন, পুরুলিয়া হোম এণ্ড হস্‌পিটাল স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টায় এখন সম্পূর্ণভাবে দাতব্য-প্রতিষ্ঠান আর নয়। এমনকি কুষ্ঠাক্রান্ত শিশুদের স্কুলটিও ওরা বন্ধ করে দিয়েছিল, যা সদ্য-প্রাক্তন জেলাশাসক শ্রী দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় Assembly of God Church School অধিগ্রহণ করে এবং পরিচালনায় সম্মত হয়। জেলাতে কুষ্ঠকল্যাণ কর্মসূচি রূপায়ণে শ্রীজানার পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আদ্রা লেপ্রোসি প্রোজেক্ট বন্ধ হওয়ার জন্য মণিপুর লেপ্রোসি কলোনির বাসিন্দারা চিকিৎসাহীনতায় ভুগছেন। সরকারি পরিকাঠামো এখানে পৌঁছয় না। প্রশাসনের প্রয়োজন এদিকে দৃষ্টি ফেরানো।

গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রোসি ফাউণ্ডেশন্ এখনও তাদের কাজ, যা সম্পূর্ণ দাতব্য, চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও সংস্থাটির এখন প্রচণ্ড অর্থাভাব।

অন্যদিকে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে কুষ্ঠরোগের ক্ষত-নিরাময়, অঙ্গবিকৃতি-প্রতিরোধ, হাসপাতাল সুবিধা এবং পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে, তার সাথে অন্য একটি বা দুটি স্বাস্থ্যসমস্যা, যেমন, যক্ষ্মা বা ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যস্ত করলে একদিকে যেমন জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নতি হয়, তেমনি তাদের অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতা সঠিকভাবে জনসেবার কাজে লাগানো যায়। জেলাতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগকে উৎসাহদানের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

পরিশেষে বলি, কুষ্ঠ নির্মূলনের পথে আমরা অনেক পথ হেঁটেছি সাফল্যের সঙ্গে। সমাজে কুষ্ঠকর্মী আজ অবহেলিত নন—সম্মানিত। কুষ্ঠ হয়েছে এই কারণেই, সাধারণত আজ কেউ আর গৃহচ্যুত হন না—চিকিৎসা করান, বাড়িতেই থাকেন। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আজ অনেক বেশী। কিন্তু নোতুন কুষ্ঠ রোগীর হার কম হয়নি। সরকারি নথিতে যা দেখানো হয়েছে এবং হচ্ছে তা Deliberate Administrative Elimination উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশাসনিক নির্মূলন, অথচ প্রয়োজন Epidemiological Elimination-এর, যা হতে সময় লাগবে বিশেষ করে পুরুলিয়া

জেলাতে আরো বেশ কিছু বছর। আর তার জন্য এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্নভাবে জনচেতনা উন্নত করার কাজ, সকল স্বেচ্ছাসেবী এবং সরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েৎ, নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এর জন্য জেলা-প্রশাসনকে আগামী দশ বছরের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নিতে হবে এবং রাজনীতিও লালফিতার বাঁধনে না রেখে তা কার্যকর করতে হবে। তবেই আবহমান কাল ধরে কুষ্ঠপীড়িত জেলা পুরুলিয়ায় কুষ্ঠরোগ আর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে হয়তো থাকবে না। আমাদের চোখের সামনে ভাসুক এক কুষ্ঠমুক্ত পুরুলিয়াব ছবি।

পুরুলিয়ার ভেষজ গাছ-গাছড়া

শ্যামল গোস্বামী

প্রকৃতির এক লীলাভূমি আমাদের এই পুরুলিয়া। এখানকার পাহাড়, টিলা, ডুংরি, ডাঙ্গা যেমন প্রকৃতিকে এক স্বকীয়তা দান করেছে অন্যদিকে তেমনি ঐসব স্থানগুলি ভেষজ উদ্ভিদের উৎসস্থল। এখানকার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে অনেক ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ উদ্ভিদ জন্মায় যেগুলি আমাদের নানান রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশতটি ভেষজ গুণান্বিত প্রজাতির উদ্ভিদ ভেষজ চিকিৎসা জগতে স্বীকৃতি অর্জন করেছে এগুলির মধ্যে শতাধিক উদ্ভিদ জন্মে পুরুলিয়ার পঞ্চকোট ও বাঘমুণ্ডি পাহাড়ে। এইসব উদ্ভিদগুলিকে যদি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে জেলার মানুষ অতি অল্প ব্যয়ে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে যে মুক্তি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেইসব উদ্ভিদকে কাজে লাগাতে হবে।

জেলার ভেষজ গাছ-গাছড়া নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিতুড়িয়া থানার চালমারা গ্রাম নিবাসী নিত্যানন্দ সিংহ মহাশয় জানালেন তাঁর দুই পুরুষ ধরে পঞ্চকোট পাহাড় তথা অন্যস্থান থেকে প্রাপ্ত গাছ-গাছড়া দিয়ে নিজেরা বিভিন্ন রোগের ঔষধ তৈরি করে আসছেন। তিনি অতি কম খরচে স্থানীয় মানুষদের সর্দি, কাশি, হাঁপানি, ঘা, চুলকানি, বদহজম প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উপশম করছেন। বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি যেভাবে মানুষের উপকার করে আসছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। তিনি বিভিন্ন রোগের আলোচনা করতে গিয়ে বায়ুগুল্ম রোগের কথা আমাদের বললেন। এটি মূলতঃ একটি পেটের রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে মনে হয় যেন একটি বিরাট কচ্ছপাকৃতির বায়ু পিণ্ড ওপরের দিকে উঠছে এবং তখন যে যন্ত্রণা হয় তা মৃত্যু যন্ত্রণায় সামিল। অ্যালোপ্যাথি মতে এই রোগের মুক্তি অতি সহজ সাধ্য নয়। কিন্তু ভেষজ গাছ-গাছড়া দিয়ে তাঁরই তৈরি সারিবাদি রিষ্ট এই রোগের একটি মহৌষধ। বেশ কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদ এবং পঞ্চ সারক চুন ও হিংলা ঘটক চূর্ণ দিয়ে এই ঔষধ তৈরি হয়। তেমনি আরেকটি মারাত্মক রোগ মেয়েদের রক্তপ্রদর। অ্যালোপাথি চিকিৎসায় এতে অস্ত্রোপ্রচার ছাড়া গতি নেই। কিন্তু নিত্যানন্দ বাবু জানালেন তাঁর আবিষ্কৃত 'রক্তপ্রদারক চূর্ণ' এই রোগের একটি মহৌষধ। যে সব ভেষজ উদ্ভিদ দিয়ে এটি তৈরি হয় সেগুলি হল-গোখুর, ডুমুর, লোদ, কুরচি ও অশোক গাছের ছাল। তিনি আরো কথায় কথায় জানালেন হাঁপানি বা দম রোগেরও তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ চিকিৎসা করে আসছেন এবং প্রচুর

লোক এ রোগটি থেকে তাঁর দ্বারা মুক্তি পেয়েছেন। যে সব গাছ-গাছালি দিয়ে তিনি হাঁপানির ঔষধ তৈরি করেন সেগুলি হল-কাঁচা আমলকি, কাঁকালী, হিরা কাঁকালী, কৃষ্ণগুরু, মেধা, মহামেধা, কুড়, কাঁকড়া সিংগি, যষ্ঠি মধু, বংশলোচন, পিপুল, দারুচিনি, ছোট এলাচ, নাগেশ্বর কুল, অশ্বগন্ধা, পারুল ছাল, বেল ছাল, গামার ছাল, শ্বেত বেড়ালা, শালপানি, মুগানি, মাসানি, চাকুলে, গোখুরা, বৃহতি কণ্ট কিয়ারী, ভুঁই আমলা, ভুঁই কুমড়া, হরিতকি, শটি, মোথা, পূর্ণলতা, নীল শালুক এবং বাসক ছাল। এতগুলি যে উদ্ভিদের কথা তিনি বললেন তার প্রায় সবগুলিই তিনি পেয়ে যান স্থানীয় পঞ্চকোট পাহাড় থেকে। লিখিত ভেষজ উদ্ভিদগুলি একত্রিত করে তিনি তৈরি করেন 'বাসাকন্টকারিষ্ট' যা দম বা হাঁপানির মহৌষধ।

নিতুড়িয়া গ্রামের আরেক প্রখ্যাত কবিরাজ হলেন শচিদানন্দ চক্রবর্তী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জণ্ডিস রোগের চিকিৎসা করে আসছেন আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে। এই রোগে যে গাছটিকে তিনি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করেন সেটি হল কামিনী কাঞ্চন গাছের ছাল। এই গাছের ছাল তিনি রোদ্রে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নেন, তার পরে দধি ও চিঁড়ের সঙ্গে রোগীকে খেতে দেন। স্থানীয় গ্রামগুলি থেকে প্রচুর ব্যক্তি এই রোগের ঔষধ নিতে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই আসে। প্রায় কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা এই রোগের ঔষধ দিয়ে আসছেন। এই রকমই এক প্রখ্যাত কবিরাজ হলেন চেলিয়ামা গ্রামের চিত্তরঞ্জন দত্ত। তিনি সুগার রোগের ঔষধ দিয়ে থাকেন। ঔষধে ব্যবহৃত গাছটির কথা জানতে চাইলে তিনি জানালেন সেটির নাম সুগার পাতা যেটি মূলতঃ শুশুনিয়া, বাঘমুণ্ডি, পঞ্চকোট পাহাড়ে পাওয়া যায়। গাছটির পাতা শুকনো করে গুঁড়িয়ে ঔষধ তৈরি করা হয় সঙ্গে রোগীকে দিতে হয় মেতি গুড়ো এই দুটি ভেষজ গুণসমৃদ্ধ ঔষধ। সুগার রোগীকে তিনমাস প্রয়োগ করলে রোগ নির্মূল হয়ে যায় এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অনুরূপভাবে পুরুলিয়ার কাশীপুর, টাড়া, শাঁকড়া, রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে জণ্ডিস, কুকুরে কামড়া, সর্দি, হাঁপানি বাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ভেষজ ঔষধ দেওয়া হয়।

এমন যেসব ভেষজ গুণসমৃদ্ধ উদ্ভিদ পুরুলিয়ার যত্রতত্র পাওয়া যায় সেগুলির নাম এবং গুণাগুণ নিচে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল—

(১) নিম—এটি পুরুলিয়ার একটি অতি সহজলভ্য উদ্ভিদ। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই নিম গাছ চোখে পড়ে। নিমগাছের পাতা, ছাল, ফুল, ফল সবই ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর ঔষধি গুণ অসাধারণ। রক্ত শোধক হিসেবে এটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্বপ্নদোষ জনিত রোগে ২২-২৫ কোটা নিম ছালের রাস কাঁচা দুধে মিশিয়ে খেতে হবে। ডায়াবিটিস রোগেও এটি দারুণ উপকারী। এক্ষেত্রে ১০ থেকে ৫টি গোলমরিচ এর সঙ্গে ১০টি নিমপাতা চিবিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত প্রস্রাব এবং চুলকানিতে চার থেকে পাঁচটি নিমপাতা এবং কাঁচা হলুদ বেটে খেতে হবে। যদি লিভার জনিত ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে ১ গ্রাম নিমছাল, ১ গ্রাম আমলকি গুঁড়া, কাঁচা হলুদ বাঁটা মিশ্রিত করে খেতে হবে। জণ্ডিসেও নিমপাতা ব্যবহৃত হয়। ২০-২২ ফোঁটা মধুর সঙ্গে প্রায় ২০০-৩০০ মিঃ গ্রাঃ নিমপাতার গুঁড়ো মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া ঘুষঘুষে জ্বরেও নিমপাতার ব্যবহার করা চলে। সেক্ষেত্রে ১টি মকরধ্বজ বড়ির সঙ্গে নিমপাতার গুঁড়ো (আন্দাজ ২০০ মিঃ গ্রাম) খেতে হবে।

(২) তুলসীপাতা—তুলসীপাতা নানা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরেই তুলসী গাছ পাওয়া যায় এবং তুলসীতলা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে পড়ে। আসলে তুলসী গাছের বহুমুখী উপযোগিতার কথা ভেবেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা তুলসী

গাছের পূজো আর্চা করে থাকেন। তুলসী গাছে জল ঢালা তাই আমাদের গৃহস্থ জীবনের ধর্ম। 'মেটেরিয়া মেডিকা' গ্রন্থে এই গাছটিকে তাই সর্বোৎকৃষ্ট গাছ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর উপকার বলে শেষ করা যায় না। তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালালে এবং চারপাশে প্রদক্ষিণ করলে অপূর্ব মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়। তাছাড়াও কার্তিক মাসে যদি প্রতিদিন সকালেই খালি পেটে দু-তিনটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায় তবে তো পেটের কোন রোগই হবে না। তুলসীর পাতা বীজানু নাশক। তাই অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে জলে বা খাবারে তুলসীপাতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া রক্ত পরিশোধনে ও তুলসীপাতার রস ব্যবহৃত হয়। দাঁতের ব্যথাতেও তুলসীপাতার রস উপকারী।

(৩) কুইলাখাড়া বা কুলেখাড়া বা তালমাখনা—এ গাছটি পুরুলিয়া গ্রামগঞ্জে যত্র তত্র পাওয়া যায়। গাছটি প্রশাখাহীন প্রধান শাখা রোমশ হয়ে থাকে। গাছটিতে কাঁটা থাকে। এটিরও গুণাবলী অনেক। পাতার রস যদি ৪-৫ চা-চামচ খাওয়া হয় তাহলে শোথ রোগ দূরীভূত হয়। জণ্ডিস রোগে যদি রক্তাল্পতা হয় তাহলে এর রস দুবেলা খেতে হবে। কুইলাখাড়ার রস ২-৪ চা-চামচ খেলে অনিদ্রা রোগ দূরীভূত হয়। পাথুরী রোগেও এটির রস দারুণ উপকারী। এক্ষেত্রে ½ চা চামচ গাছের রস ১ কাপ জলে গুলে খেতে হবে।

(৪) অশ্বত্থ গাছ—এটিও পুরুলিয়ার একটি অতি পরিচিত বৃক্ষ। এর পাতা একদিকে ছাগল, ভেড়ার খাদ্য হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি এর ছাল, ফল, নানা রোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১০ গ্রাম অশ্বত্থ গাছের ছাল ও ২ গ্রাম এর কুঁড়ি ২ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ চামচ চিনি মিশ্রিত করে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া পিত্ত ও রক্তের দোষেও এই গাছের ছাল সিদ্ধ করে মধু দিয়ে সেবন করতে হবে। এই গাছের ছাল পুড়িয়ে গুড়ো করে যদি পোড়া ঘায়ে লেপন করা যায় তাহলে ঘা শুকিয়ে যায়।

(৫) অশোক গাছ—এই গাছটি অতিরিক্ত পরিমাণ দেখা না গেলেও অনেক গ্রামেই চোখে পড়ে বর্তমানে এটি রোপন করা হচ্ছে এবং মানুষ এর গুরুত্ব এখন বুঝতে পারছে। ধাতুরোগ, রক্তপ্রদর, প্রস্রাব বন্ধে এটি ব্যবহৃত হয়। অশোক গাছের ছাল জলে সিদ্ধ করে পরপর ৫ দিন খেলে উপকার পাওয়া যায়।

(৬) অর্জুন গাছ—এটি পুরুলিয়ার একটি অতি পরিচিত বৃক্ষ। টি বি ও হৃদ রোগে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ১ কাপ দুধে ১ চামচ অর্জুন ছাল গুঁড়ো করে ১ চামচ চিনি মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এভাবে এটি খেতে হবে ১ মাস ধরে। প্রস্রাবের কষ্ট হলে এর ছাল সিদ্ধ করে একটু একটু করে কয়েকবার পান করতে হবে। তাছাড়া হাড় ভাঙ্গাতেও অর্জুন ছাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৭) কলাগাছ—এটিও পুরুলিয়ার একটি সহজলভ্য উদ্ভিদ এবং অতি উপকারী উদ্ভিদ এর সবুজপাতার রস, মোচা, থোড় সবই প্রয়োজনীয়। কলাপাতার রস নানাবিধ রোগ যেমন—সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, আমাশয়, অ্যাসিড গ্যাস, লিভারের দোষ প্রভৃতি সারাতে ব্যবহৃত হয়। কলাগাছের সবুজ পাতা বেঁটে খাওয়া বিধেয়। শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে কলাপাতার রস লাগালে উপকার পাওয়া যায়। প্লুরিসি, ক্ষয়রোগ বা থুথুর সঙ্গে যদি রক্ত বের হয়ে থাকে তাতেও কলাপাতার তাজা সবুজ রস খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি কামড়ে যদি হুল ফুটিয়ে দেয় তাহলে উক্ত স্থানে কলাপাতা বেঁটে লাগালে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার কলাগাছ চাষ অতিসহজ, একটু মেহনত করে লাগিয়ে দিলে আর দেখতে হয় না আপনা আপনি বাড়তে থাকে।

(৮) যজ্ঞডুমুর—পঞ্চকোট পাহাড়, বাঘমুণ্ডি পাহাড়, মুড়াবাগের জঙ্গল তথা গ্রাম গঞ্জের নানাস্থানেই এই গাছটি দেখা যায়। এই গাছের ফলের রস প্রদররোগ, রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহৃত হয়।

(৯) আকন্দ—এই গাছটি পুরুলিয়ার ঝোপ ঝাড়ে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এর ফুল ও পাতা ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ। শরীরের কোন অংশ ফুলে উঠলে পাতা বেঁধে রাখলে ফোলা অতি অল্প সময়েই কমে যায়। এই গাছ থেকে যে দুধ বের হয় তা পোকা দাঁতের গোড়াতে লাগালে উপশম হয়। তাছাড়া গেঁটে বাত ও শূল বেদনায় এর পাতা উপকারী।

(১০) সর্পগন্ধা—পুরুলিয়ার বিভিন্ন উচ্চস্থানে বিশেষতঃ পাহাড়, টিলায় এই গাছটি জন্মে। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দীর্ঘ চার হাজার বৎসর ধরে এটি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গাছটি ৭০-৭৫ সেমি লম্বা হয়। এই গাছের শেকড়ে বিশেষ কয়েকটি কারীয় পদার্থ আছে যেমন-Ajamaline, Ajonalinine, Serpentina, Ajnalicine ইত্যাদি। এই গাছটির ছাল, বীজ এবং ফুল ঔষধ তৈরিতে কাজে লাগে। মেয়েদের নানান রোগে গাছটির ব্যবহার হয়ে থাকে। মেয়েদের মাসিক স্রাবের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে তাছাড়া মেয়েদের বাধক, শুটকি রোগ, সাদাস্রাব, অসময়ে স্রাব প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয়। মানসিক রোগে এই গাছটির বহুল ব্যবহার আছে। তাছাড়া রক্তচাপ কমানোতেও কাজে লাগে।

(১১) গাঁদাল পাতা—পুরুলিয়ার গ্রামগঞ্জে প্রায় অধিকাংশ ঘরেই এই গাছটির দেখা মেলে। এটি একটি লতানো গাছ। সর্দিতে এটি দারুণ উপকারী, তাছাড়া অজীর্ণ রোগে এবং পেটের নানান রোগে এটি ব্যবহৃত হয়।

(১২) আমলকী—পাহাড়ী জঙ্গলে এর অবস্থান। তাছাড়া সাধারণ মাটিতেও জন্মে। এককালে দান্দুয়ার বনে, পঞ্চকোট পাহাড়ে প্রচুর এই গাছ দেখা যেত, বর্তমানে কমে আসছে। এর কাঁচা ফল নানান রোগে ব্যবহৃত হয়। একগ্লাস মিছরির জলে ২ চামচ আমলকী ফলের রস মিশ্রিত করে পান করলে প্রস্রাবের জ্বালা দূরীভূত হয়। অসময়ে চুল ওঠা তথা চুল পেকে গেলে কাঁচা আমলকী বেঁটে নারকেল তেলে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন মাখলে দারুণ উপকার হয়। তাছাড়া শ্বেত প্রদরে পাকা আমলকী বীজের গুঁড়ো ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ২ চামচ কাঁচা আমলকীর রস, ২ চামচ হেলেঞ্চা রসের সঙ্গে মিশ্রিত করে রোজ একবার করে ১০-১২ দিন ব্যবহার করতে হবে।

(১৩) হরিতকি—পুরুলিয়ায় আঞ্চলিক ভাষায় একে হত্তকী বলে। প্রায় সমস্ত পাহাড়ী এলাকায় গাছটি দেখা যায়। পায়খানা অপরিষ্কার হলে এটি ১০ গ্রাম পরিমাণ গুঁড়ো করে জলে মিশ্রিত করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। বমিভাব ঘোচাতেও এটি ব্যবহৃত হয়। সামান্য মধুসহ সেক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া পাথুরি রোগে হরিতকির বীজ দুধে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ১৫ দিন ব্যবহার করতে হবে।

(১৪) বহড়া—পাড়া থানার একটি গ্রামের নামই বহড়া। নাম থেকে সহজেই অনুমেয় এককালে ঐ গ্রামে অজস্র বহড়া গাছ ছিল। বর্তমানে যে নেই তা নয়, তবে ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। বহড়ার শাঁস ডালিমের রসসহ সেবন করলে কৃমি ভালো হয়। তাছাড়া কাশি ও হাঁপানিতেও এটি কাজে লাগে।

(১৫) শিউলি—পুরুলিয়ার গ্রামগঞ্জে ঘরে ঘরে আগে শিউলি গাছ শোভা পেত। শরতে শিউলি ফুলে ভরে উঠত আঙ্গিনা। বর্তমানে এ দৃশ্য যেন ধীরে ধীরে কমে আসছে তবুও এখন অনেকেই শখ করে শিউলি গাছ লাগাচ্ছেন। শিউলির পাতা, ছাল ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ।

ম্যালেরিয়া রোগে শিউলি গাছের রস উপকারী। আদা ও শিউলিপাতা সমান পরিমামে থেঁতো করে প্রতিদিন আধকাপ করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। মূলতঃ ৭-১০দিন খেতে হবে। বাত ও শ্লেষ্মায় এই গাছের পাতা ও শেকড় উপকারী।

(১৬) শিমূল—এটি পুরুলিয়ার বনে জঙ্গলে দেখা যায়। এটিও ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ। এর ছাল বেঁটে ব্রনোর উপরে লাগালে ব্রন সেরে যায়। রক্তপিত্ততেও এটি ভীষণ উপকারী। এক্ষেত্রে ১ চামচ মধুসহ শিমূল ফুলের গুঁড়ো আধ চামচ পরিমাণ ৭ দিন নিয়মিত ১ বার করে খেতে হবে।

(১৭) বাসক— পুরুলিয়াতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে ‘যেথায় করে বাসক বাস, / সেথায় কভু না হয় কাশ’ এখানে কাশ অর্থে সর্দি কাশি। পুরান কাশি এবং শ্বাস কষ্টে বাসক উপকারী। ১ গ্রাম পরিমাণ বাসক ছালের গুঁড়ো ১ চামচ মধুসহ রোজ ১ বার করে ১ মাস খেতে হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত কাশি হলে ২৫ গ্রাম মিছরী, ৫টি পিপুল, ৮টি লবঙ্গ, ১০টি গোল মরিচ, ৩ গ্রাম কণ্টিকারী এবং ১০টি বাসক গাছের পাতা ৫০০ গ্রাম হলে সিদ্ধ করে ১ কাপ মতো তৈরি করে ঠাণ্ডা করে খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

(১৮) কালমেঘ—শীতল জলা জমিতে এই গাছটি জন্মে। পুরুলিয়ার গ্রামগঞ্জে খেতের আলে, পুকুর পাড়ে এই ভেষজ গাছটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা ও কৃমিতে এটি দারুণ উপকারী। এক্ষেত্রে শিশুদের ৫টি করে পাতা প্রত্যহ সকালে ১ মাস নিয়মিত খেতে হবে। ম্যালেরিয়া রোগেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(১৯) থানকুনি—স্যাঁতস্যাতে জমিতে বিশেষ করে পুকুর পাড়ে, কুয়োর পাড়ে এটি জন্মে। পেটের রোগে এর পাতা দারুণ উপকারী। প্রতিদিন সকালে ৫-৭টি থানকুনি পাতা খালি পেটে চিবিয়ে খেলে পেটের কোন রোগ হয় না। তাছাড়া রক্তদোষে ও এটি ব্যবহৃত হয়।

(২০) হলুদ—বর্তমানে পুরুলিয়ার চাষীরা অনেকেই ব্যাপকভাবে হলুদ চাষ করছেন। এটি বাড়িতে সামান্য জমিতেও চাষ করা যায়। হলুদের ভেষজ গুণ অসাধারণ। লিভারের রোগে হলুদের রস উপকারী। সেক্ষেত্রে ১ চামচ হলুদের রস চিনি বা মধুসহ সেবন করতে হবে। স্বরভঙ্গেও হলুদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ২ গ্রাম হলুদ গুঁড়ো ১ গ্লাস গরম জলে মিশিয়ে খেতে হবে। কাঁচা হলুদের রস (২০-২৫ ফোঁটা) স্বল্প লবণ মিশিয়ে খেলে ক্রিমি রোগের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাছাড়া মুখ ও শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধিতেও কাঁচা হলুদ, মুসুর ডাল বাঁটা, দুধের সর মিশিয়ে মাখলে উপকার পাওয়া যায়।

(২১) পাথর কুচি—গ্রামগঞ্জের অনেকের বাড়িতেই এই গাছটির দেখা মেলে। পাতলা পায়খানায় ২টি পাতা লবণ মিশিয়ে খেলে উপকার মেলে। পাথর কুচি পাতার রস পিত্ত পাথুরির মহৌষধ তাছাড়া শরীরের কোনস্থান কেটে গেলে রক্তপাত হলে এই পাতার রস লাগালে সহজেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

(২২) অনন্ত মূল—মাঠা, অযোধ্যা, পঞ্চকোট পাহাড়ে এই গাছটি পাওয়া যায়। জিভের ঘা, আমাশয়, ধাতু দুর্বলতা, স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

(২৩) অপরাজিতা—এটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ। প্রায় প্রতিটি গ্রামগঞ্জেই এর দেখা পাওয়া যায়। অনেকেই বাড়িতে অপরাজিতা লাগান। এর পাতা বেঁটে কপালে লাগালে চোখে জল পড়া ও চোখ জ্বালা বন্ধ হয়। নীল অপরাজিতা শূল বেদনাতে কাজে লাগে।

(২৪) আদা—পুরুলিয়ার প্রান্তিক চাষীরা বর্তমানে পেঁয়াজ, রসুন, হলুদের সাথে সাথে আদারও চাষ করছেন এটি রন্ধন কার্যে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি ভেষজ দ্রব্য হিসেবেও

এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অথর্ব বেদে আদার উল্লেখ পাওয়া যায়। আদার বোটানিক্যাল নাম জিঞ্জিবার অকিসেনেল রক্স্। বৈদিক যুগে আদাকে ভক্ষণকারী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আদা খাদ্যবস্তু জীর্ণ করে থাকে। তাই মাংসে অধিক পরিমাণে আদা প্রয়োগ করা হয়। আদাতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, নানান লবণ, ভোলাটাইল অয়েল রয়েছে। আদার ভেষজ গুণ অসাধারণ। বসন্ত রোগে এটি উপকারী। ১ চামচ আদা ও ১ চামচ তুলসী পাতার রস খেলেই বসন্তের সব গুটি বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া সর্দি জ্বর, জটিল আমাশয়, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগেও আদা ব্যবহৃত হয়।

(২৫) রসুন—এটি পুরুলিয়ার একটি অতি সহজলভ্য ফসল। রসুনকে বলা হয় মর্তের অমৃত। এতে আছে ভিটামিন A, B, C, D এবং ক্যালসিয়াম, আয়রণ, আয়োডিন প্রভৃতি। এর উপকার বলে শেষ করা যায় না। বোলতা, বিছের কামড়ে রসুনের রস খুব উপকারী। তাছাড়া সর্দি কাশি, হাঁপানি, গলাজ্বালা, উচ্চ রক্তচাপ, নানান চর্মরোগ, ক্রিমি, বমি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতেও রসুনের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি রোগেই ব্যবহার বিধি রয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে জেনে ব্যবহার করাই বিধেয়।

এই প্রবন্ধে মাত্র ২৫টি ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ গাছ-গাছড়া নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল। আরো কত যে ভেষজ উদ্ভিদ এই পুরুলিয়ার পাহাড়-জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে তার হিসেব নেই। এইসব গাছ গাছড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস ছিল জেলার বিখ্যাত পঞ্চকোট পাহাড় এবং বাঘমুণ্ডি পাহাড়। বর্তমানে মানব সভ্যতার ক্রম উন্নতির যুগে এইসব পাহাড়ে গড়ে উঠছে নানান শিল্প, তারফলে গাছ গাছড়া যেমন কেটে ফেলা হচ্ছে তেমনি দুষিত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। তার ফলে অনেক মূল্যবান ভেষজ বৃক্ষই আজ বিলুপ্তির দিন গুনছে। কোথাও বা পাহাড় ডুংরি কেটে ফেলা হচ্ছে যা আগামী দিনে নিয়ে আসবে মানব জীবনে চরম সংকট। সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার সাথে সাথে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কাজে। আর তা না হলে আগামী প্রজন্মকে আমরা উপহার দিয়ে যাব এক ধূষর মরুভূমি যেখানে তাদের বেঁচে থাকা হবে মৃত্যুর সামিল।

ঋণ স্বীকার

(১) নিত্যানন্দ সিংহ
(২) শচীদানন্দ চক্রবর্তী
(৩) সুভাষ রায়-সম্পাদক অনৃজু-চেলিয়ামা-পুরুলিয়া
(৪) গাছ-গাছড়ায় রোগমুক্তি-কবিরাজ অমর মজুমদার, এস. মজুমদার এবং নকুলেশ্বর দাস
(৫) অনৃজু পত্রিকায় প্রকাশিত সব্যসাচী সেনগুপ্তের প্রবন্ধ-মানভূমের ভেষজ গাছ-গাছড়া
(৬) সঞ্জীব পণ্ডিত

ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটি, পুরুলিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কে. পি. সিংদেও

গত ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর এই পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অন্তর্ভুক্তির সময় এখানে Indian Red Cross Society সংস্থা ছিল না—শহরের জ্ঞানী ও গুণীজনের বিশেষ চিন্তা-ভাবনার তথা শহরবাসীর সহযোগিতায় গত ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া জেলাতে Indian Red Cross Society সংস্থাটি স্থাপিত হয়। তৎকালীন বিখ্যাত আইনজীবী শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। তিনি এবং বিখ্যাত আইনজীবী প্রয়াত অনিলকুমার বোস, বাদলচন্দ্র গোস্বামী, প্রয়াত ডা. প্রভাতকুমার মল্লিক, অলক চৌধুরি, দেবেশ মুখার্জি এবং অন্যান্য সমাজসেবীগণ সারা শহরবাসীকে এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতন করে তোলেন এবং এই সংস্থায় যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

বর্তমানে এই সংস্থার আজীবন সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০০ (চারিশত)। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হল দুঃস্থ-দরিদ্রকে সাহায্য করা। এই সংস্থাটি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থা এই জেলায় প্রতিষ্ঠার দিন হতে নিম্নরূপ কাজগুলো করে আসছে। এই সংস্থাটি পরিচালনার জন্য সরকার হতে কোনোরূপ অনুদান পাওয়া যায় নি—সংস্থার নিজস্ব তহবিল আছে—যাহা নিয়মানুযায়ী Bank-এ জমা থাকে এবং Managing Committee দ্বারা পরিচালিত হয়। খরচ-খরচার হিসেব রাখা হয় এবং প্রতি বৎসর C.A. দ্বারা Audit করানো হয়। নিম্নে বর্ণিত কাজগুলোর জন্য শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ডা. প্রভাতকুমার মল্লিকের অবদান অনস্বীকার্য।

কার্যাবলী :

গরিবকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য—দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য সাহায্য করা—খরা পরিস্থিতিতে জল এবং খাদ্য সরবরাহ যাহা পৌর এলাকায় করা হইয়াছে। চক্ষুশিবির (ছানি অপারেশনের জন্য) এবং পরে তাহাদিগকে চশমা প্রদান—স্বেচ্ছা রক্তদান প্রকল্প এবং এড্‌স প্রতিরোধের জন্য প্রচারকার্য—রঘুনাথপুর হাসপাতালের সম্মুখে একটি পুকুর খনন—যাহার নাম সালকাবাঁধ, সময় ১৯৮২ সাল। পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য একটি মোবাইল ইউনিট গঠন—খরা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ঝালদা অঞ্চলে কতকগুলো গ্রামে কূপ খনন—জেলায় অনেকগুলো কূপ খনন প্রয়োজনভিত্তিক— চাল, গম, দুধ, বিস্কুট, জামা-কাপড়, কম্বল বিতরণ—

প্রতিবেশীদিগকে প্রয়োজনানুসারে সাইকেল, হুইল-চেয়ার, কানের যন্ত্র, ক্র্যাচ ইত্যাদি বিলি করা— খরাপীড়িত অঞ্চলে উদ্ভুত রোগের চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা টিম গঠন করা—দেশের অন্যত্র খরা, বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাহা বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য করা ইত্যাদি।

দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা চলছিল—চিকিৎসার জন্য ব্যবহার্য অ্যাম্বুলেন্স অকেজো অবস্থায় পড়েছিল। বর্তমানে মাননীয় জেলাশাসক শ্রী দেবপ্রসাদ জানা মহাশয় এবং এই সংস্থার মাননীয় সম্পাদক শ্রী কে. পি. সিংদেও মহাশয়ের হস্তক্ষেপে এই সংস্থা পুনরায় উজ্জীবিত হয়। অ্যাম্বুলেন্স সারিয়ে সদর হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে (বর্তমানে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠরত)। বিখ্যাত ছৌ-নৃত্যশিল্পী প্রয়াত গম্ভীর সিং মুড়ার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য, বিদেশ থেকে আসার পর তাকে সংবর্ধনা— বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সিন্ধুবালা দেবীকে আর্থিক সাহায্য, সংবর্ধনা প্রভৃতি সেবামূলক কাজ করা হয়েছে। স্বেচ্ছা রক্তদান প্রকল্প, এড্‌স. ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারণ রোগের বিরুদ্ধে মেডিকেল টিম গঠন প্রভৃতি সেবামূলক কাজও উল্লেখযোগ্য।

আশা করি, এই সংস্থা জেলা প্রশাসনের এবং জনগণের সহযোগিতায় পুরো উদ্যমে এগিয়ে চলবে।

চিত্রকলা-ভাস্কর্য : সঙ্গীত : ক্রীড়া

রুক্ষ লাল কাঁকুরে মাটির দেশ পুরুলিয়া চিত্রে ও ভাস্কর্যে

ধ্রুব দাস

মানভূম অধুনা পুরুলিয়া জেলার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য কলার গোড়াপত্তনের কথা লিখতে গেলে তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্প ও সংস্কৃতির অবস্থান সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা না থাকলে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলে পরবর্তীতে বিদেশি শাসকদের বার বার পালা বদলে শিল্প ও সংস্কৃতির উপর যে প্রবল ধস নামে তাতে ভারতের শিল্প সৃষ্টির মূল কাঠামোই নড়বড়ে হয়ে যায়। তুর্কী মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের সুদীর্ঘ কাল জুড়ে (৯৯৮ খ্রিঃ-১৯৪৭ খ্রিঃ) ভারত ক্রমশ তার পুরাতন ঐতিহ্যের শিল্প কৌমার্য হারিয়েছে তার ফলস্বরূপ (১৪০০ খ্রিঃ-১৭৫০ খ্রিঃ) পাশ্চাত্যের চিত্র ও ভাস্কর্যে যে রেঁনেসাস (নবরজাগরণ) শুরু হয়েছিল তার ছিটেফোঁটাও এখানের শিল্পী মহলে প্রতিফলিত হয়নি।

পরিবর্তে এখানের শিল্পীরা সেই সময় শাসক শ্রেণীকে তুষ্ট রাখতে রাজস্থানী শৈলীতে মুঘল মিনিয়েচার ও অজন্তা ইলোরার অনুকরণের ছবি আঁকতে মগ্ন। সবই আলংকারিক সর্বস্ব চিত্র। যার ফলে বাস্তবধর্মী চিত্র ও ভাস্কর্যকলার একটি বিশাল অংশজুড়ে আজও অন্ধকার থেকে গেছে। এটা ভারতবর্ষের শিল্পীদের নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই শূন্যতাকে পূরণ করার যথেষ্ট সময়ও নষ্ট করা হয়েছে তবুও বাস্তব ধর্মী সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা অভাববোধ থেকে যায়, এ অবস্থায় সমকালীন চিত্র বা ভাস্কর্য কলায় 'সুররিয়ালিজমের' জোয়ারে গা ভাসানোটা ভারতের শিল্পজগতে আর একটা বড় ভুল।

তাবলে আধুনিক ও সমসাময়িক ধারার প্রবহমান গতিকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখানোও ঠিক হবে না।

আমাদের দেশে কেন্দ্র শাসিত প্রভাব অঙ্গরাজ্য বা আঞ্চলিক লোকশিল্পকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি সেদিন, তাই এলাকা ভিত্তিকে স্ব-স্ব ভাবধারায় সংস্কৃতি সেখানে থেমে আছে। মানভূম তথা অধুনা পুরুলিয়া জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলের শিল্পকর্মগুলিও সেই যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অত্যন্ত নিষ্ঠায় তার নিজস্ব শৈলী ও পরিকাঠামোর মানকে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এর প্রচুর নিদর্শনকে সহজেই চোখে পড়ে। শরতের শেষে কালী পুজোর সময় দিকে দিকে গৃহসজ্জার ধুম পড়ে যায়। এই অঞ্চলের নিজস্ব শৈলীতে আঁকা প্রত্যেকটি বাড়ির প্রাচীরগুলি ভরে ওঠে নানান সাজে। কোথাও তবু নক্সি, কোথাও পৌরাণিক তত্ত্বকে বিষয় করে জটিল ভাবধারায় আধারিত রকমারি চিত্র আবার কোথাও বা পশুপাখি ও জলজ প্রাণীদের বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি, তেমনই রয়েছে আধুনিক জীবন যাত্রার ওপর ভিত্তি করে কার্গিল যুদ্ধের ছবি অবাক হতে হয় এগুলির উপস্থাপনের ক্রিয়া-কৌশল দেখে। এবং আরো অবাক হওয়ার বিষয় হল এগুলির শিল্পী কোনো পুরুষ নয়। অতি সাধারণ বাড়ির মেয়ারাই অবসর সময়ে এগুলির প্রকৃত রূপকার। বিস্মিত হতে হয় প্রথাগত কোনো শিক্ষা ব্যতিরেকে যৎসামান্য উপকরণ নিয়ে আঁকা এই সমস্ত ফ্রেস্কোগুলি দেখে।

আশ্চর্য লাগে এগুলির রঙ বিন্যাসে একের পর এক রঙের মার্জিত ব্যবহারে পারস্পরিক রঙের যে বুনোট সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে। শেষে এক বিস্ময় থেকে যায় তাহল মোগল বা ব্রিটিশ শাসিত যুগের কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে কোনো ছবি না দেখে। এর মূল কারণ হয়তো সেদিনের নগর সভ্যতার চাক-চিক্কণের জৌলুসে অবহেলিত পাহাড় জঙ্গলের রুক্ষতা শাসককুলের নজর এড়িয়ে গেছে। এর কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকগণ কি ব্যাখ্যা করবেন জানি না। মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দিল্লির বাদশাহদের নির্মিত মসজিদ, স্মৃতিসৌধ তথা তোরণের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু মানভূম অঞ্চলে তেমন কোনো স্থাপত্যের নিদর্শন আমরা দেখতে পাই না। ভারত শাসন করলেও এই এলাকায় মেগলদের আগমন বহু পরে হওয়ায় হয়তো এর মূল কারণ। দুর্গম এলাকা বলেই মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পঞ্চকোট মহারাজ বলভদ্র শেখরের সময় থেকে মানভূম করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

আমরা জানি ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মতো ব্যয় বহুল নির্শন যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে সেই দেশের শাসককুলের ইতিহাস অথবা ধর্মীয় প্রভাবকে জনগণের মধ্যে সম্প্রসারণেরই মূল লক্ষ্য নিয়ে। সেদিক থেকে মানভূম একেবারে বঞ্চিত। এই এলাকার শৈল্পিক বিস্তৃতি গড়ে উঠেছে বারো মাসে তেরো পার্বণ তথা সামাজিক রীতি নীতি ও প্রথাকে কেন্দ্র করে। আবার কিছুটা পালা বদলের রূপান্তর ও এর কারণ বলা যেতে পারে। মানভূম জেলা ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত পরাধীন ও স্বাধীন ভারতেও এর ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন। প্রথমে বিহার পরে উড়িষ্যা আবার বিহার অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে এর অন্তর্ভুক্তির ফলে এই এলাকার ভাষা তথা সামাজিক প্রথাগুলির উপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। এতে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ মানভূম ছৌ-নৃত্যের উপর উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের পোশাকি ব্যবহার যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনই মানভূম ছৌ-নৃত্যের বেশভূষা ও ধ্রুপদী ধারা সেখানে প্রচলিত হয়েছে।

মোগল ও ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলে প্রাচীন মানভূমের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলা সমন্বিত যে কয়েকটি পুরাকীর্তি এ জেলায়—ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে— সেগুলির প্রায় সবই গৌড়ীয় স্থাপত্য তথা ভাস্কর্যকলারই পরম্পরা বলা হলে যথাক্রমে, তেলকূপী, পাকবিড়রা দেউলঘাটা ও বলরামপুরের টেরাকোটার মন্দির ও দেউলগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গ্রানাইট ও রকস্টোনের (Rock-Stone) যে সমস্ত মূর্তি রয়েছে এগুলি কিন্তু ভারতীয় পরম্পরার শৈলীতে অবধারিত ভাঙ্গবা গ্রামের মন্দিরটি ছিল এগুলির ব্যতিক্রম। অধুনা অবলুপ্ত এই মন্দিরটি বহু প্রাচীন সম্পূর্ণ পাথরে খোদাই এর নির্মাণ শৈলী ও কারুকার্য কলিঙ্গ ভাবাদর্শে আধারিত মন্দিরগুলির সঙ্গে তুলনীয়।

এ জেলার তৎকালীন মূর্তিসমূহ বিশেষ করে যেগুলি গ্রানাইট বা কষ্টিপাথরে খোদিত হয়েছিল সেইসকল মূর্তির ভাবভঙ্গী ও গঠনপ্রণালী গৌড়ীয় ভাবাদের্শে আধারিত যে নয় তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায়। কাজেই প্রশ্ন থেকে যায় মূর্তিগুলি কোনো বিশেষ এলাকার শিল্পীর আগমনে নির্মিত হয়েছিল না সেগুলি বাইরের থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এ তর্ক না করাই ভালো; তবে মূর্তিগুলি যে তৎকালীন স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত হয়নি এতে দ্বিমত থাকতে পারে না।

যাইহোক এভাবেই জনমানসে ধর্মীয় প্রচার মাধ্যমে নগর সভ্যতার প্রভাব এ জেলায় সেদিন প্রবেশ করে ও শিল্পসৃষ্টির তৎকালীন অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহালে সহায়তা করে। এতে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকলার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতের সঙ্গে মানভূম সংস্কৃতির পারস্পরিক মেল বন্ধনের উদ্ভব হয়, শুরু হয় এক মিশ্র ধারার। মাঝে মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতায় এর অগ্রগতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে।

মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলার শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করলে ভাল হয়। প্রথম অধ্যায় বলতে প্রাচীন মানভূম ও তার শিল্প ও সংস্কৃতি। যার বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় শিল্পরসের মূলস্রোতে গোড়ীয় ভাবধারায় প্রভাবিত সৃষ্টিসমূহ। দ্বিতীয় অধ্যায়টি মোগল ও বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শৈল্পিক দৈন্য ও জেলার ক্ষেত্রে আরো বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ শাসনের শেষদিকে চিত্র ও ভাস্কর্য ক্ষেত্রে এদেশে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও মানভূম জেলায় এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি অকস্মাৎ উর্বর হয়ে উঠতে শুরু করে। এই সময় যে কয়েকজন চিত্রশিল্পী পুরুলিয়া জেলার কলাজগৎকে ভারতীয় চিত্রকলার পরম্পরায় ছবি এঁকে চিত্রকলার মানকে সমৃদ্ধ করেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন *করালীচরণ নাগ ও *ফকির মাহালী, পরবর্তীতে পশুপতি নাগ, রাখাল চন্দ্র কুম্ভকার, নির্মল মুখোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, মহেশ দাস, হরিপদ মিস্ত্রি। এঁরা সাধারণ ভাবে জলরঙ ও টেম্পেরা মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন, তৎকালীন পূজাপার্বণ ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে আধার করে। ব্যতিক্রমী শিল্পী হিসেবে নির্মল মুখোপাধ্যায়ের Landscape-এ মানভূমের রাঙা পলাশ গাছের ছবি এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ ছবি দেখলে দর্শকের মনে আগুন লাগে। রঙের মার্জিত প্রয়োগ বিধি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। অনিল মুখোপাধ্যায়ের জলরঙ ও জাপানি পদ্ধতির ওয়াশে আঁকা ছবিগুলি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই উভয় শিল্পীর কাজগুলির মূল্যায়ণে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে চিত্রজগতের আঙ্গিককে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলাকে যুক্ত করতে এঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এই জেলার একমাত্র সাংস্কৃতিক মিলনের উৎসব বলতে রাস মেলায় তৎকালীন পুরুলিয়ার জেল-সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের প্রচেষ্টায় পুরুলিয়া জেলার কয়েক দিনের একটি অভূতপূর্ব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চার্লি নামক একজন দক্ষ চিত্রশিল্পীর হাজতবাস-কালীন আঁকা প্রচুর চিত্র এই প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ ছিল। এটাই সম্ভবত পুরুলিয়া জেলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম তেলরঙে আঁকা ছবির প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর প্রভাবে তেলরঙকে মাধ্যম করে ছবি আঁকার প্রবণতা শিক্ষানবীশ শিল্পী মহলে এক নতুন জোয়ার বয়ে নিয়ে আসে।

চিত্রশিল্পের কথা বাদ দিলে মূর্তিশিল্পের কথায় এলে বলা যায় অপেক্ষাকৃতভাবে মূর্তিশিল্পের প্রভাব চিত্রশিল্পের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এর মূল কারণ হিসেবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরুলিয়া জেলার ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর প্রচুর প্রতিমা নির্মাণের সুযোগ প্রতিমা-

শিল্পীগণ পেয়ে থাকেন।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এইসব শিল্পীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তাঁদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এদের মধ্যে থেকে অনেকেই প্রতিমা শিল্পী থেকে মূর্তিশিল্পী হয়ে ওঠার বাসনা নিয়ে কর্মে মনোযোগী হন।

তাছাড়া কাগজের মণ্ডে নির্মিত ছৌ-নৃত্যের মুখোশ তথা নানাবিধ গৃহসজ্জার কারুকৃতি এই জেলার একটি বিশেষ সম্পদ। এই শিল্পকর্মে ব্রতী মৃৎশিল্পীদের মধ্যে যাঁদের অবদানের কথা মনে রাখতেই হয় শিল্পী বনু সূত্রধর ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় ভোলানাথ ও শ্যাম সূত্রধর ছাড়াও বৈদ্যনাথ মিস্ত্রি, ফটিকচন্দ্র দাস, অবিনাশ সূত্রধর, শ্রীনাথ সহিস, বরদা কুম্ভকার ও তারিণী পাল উল্লেখযোগ্য। এঁদের কার্যকালের সময় কাল বলতে ১৯৩০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ধরা যেতে পারে।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে পুরুলিয়া জেলার চিত্র ও ভাস্কর্য কলায় এক নব যুগের সূচনা হয়। এ সময় এই জেলা সবে মাত্র পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে।

ইতিমধ্যে চিত্রকলাতে যুক্ত হয়েছে টেম্পেরা জলরঙ, প্যাস্টেল, তেলরঙ-এর ব্যবহার তেমনই মূর্তিশিল্পে এসেছে রূপান্তর। জীবন্ত হয়ে উঠেছে প্রতিমার বাহন সিংহ, মানব অবয়বে মহিষাসুর তার দানবীয় শক্তি নিয়ে দৌর্দণ্ডপ্রতাপে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ। দেবীর মুখমণ্ডল পটশিল্পের চিরাচরিত আদল থেকে রূপান্তরিত হয়েছে জীবন্ত সংহার রূপিনী মানবী মাতৃকা বেশে।

এভাবে অতি সন্তর্পণে ধর্মীয় আবেগের বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ক্রমশ শৈল্পিক উত্তরণ শিল্পীর জীবনে একটি কঠিন পরীক্ষা। একে Silent Revolutionও বলা যেতে পারে।

১৯৬১-৬২ সালের ঘটনাবহুল অংশকে বাদ দিলে পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃতিক ইতিহাস বিকৃত হয়ে পড়তে পারে। বছরটা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ এই উপলক্ষে "রবীন্দ্রশতাব্দী জয়ন্তী" কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় তেলরঙ, জলরঙ, স্কেচ ও মডেলিং প্রতিযোগিতা। প্রতি বিষয়ে ভিন্ন বিভাগ রাখা হয়েছিল। বিষয় ছিল কবিগুরুর প্রতিকৃতি। এ ধরনের প্রয়াস এ জেলায় এটাই সর্বপ্রথম। আয়োজকদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সমাবেশ অনুষ্ঠানটিকে আরো বর্ণাঢ্য করে তোলে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন অশোক চৌধুরী, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেদিনের জেলার ঐতিহ্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে যথাক্রমে তেলরঙ, পেন্সিল স্কেচ ও মডেলিং এই তিনটি বিভাগেই প্রথমস্থান অধিকার করেন প্রতিবেদক (শিল্পী ধ্রুব দাস) অন্যান্যদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যাঁরা অধিকার করেন তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে, অধ্যাপক সুষেণ দাস, অমিত বসু, বাসুদেব দাস, মমতা চ্যাটার্জি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখ যোগ্য।

১৯৬২-৬৩ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের বিষয়কে আধার করে রাজ্য ব্যাপী Poster-Competition-এ পুরুলিয়া জেলা প্রথম স্থান অধিকার করে, শিল্পী প্রতিবেদক নিজে। পর পর এই দুটি ঘটনা পুরুলিয়া জেলার চারুকলা ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ। যেহেতু এখান থেকে তৎকালীন শিল্পীরা তাদের মনে তাগিদে ছবি আঁকা বা শিল্পসৃষ্টির প্রকৃত মূল্যায়নকে বুঝে উঠতে সক্ষম হয়। অবহেলিত এই জেলার প্রতিক্ষেত্রে যেমন হয়েছে সেই ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটে যায় নিঃশব্দে।

জনমানসে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিল্পকে আরো কাছে টেনে নেয় জেলাবাসী। ১৯৬৫ সালে বিপুল উদ্যোগ নিয়ে আসে সরস্বতী সঙ্ঘ, শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী চিত্র ও ভাস্কর্য কলার এক

অনুপম প্রদর্শনী। স্ব-রচিত কবিতা-প্রদর্শনীও এতে যুক্ত হয়। এ ধরনের এক অভিনব প্রদর্শনীর দেখার সৌভাগ্য ঘটে সেদিনটিতে অনুষ্ঠিত স্থানীয় পৌরসভার গান্ধী হলে। উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ান শিল্পী নির্মল মুখোপাধ্যায়। এতে স্কেচ্‌, জল রঙ, প্যাস্টেল, তেল রঙ মাধ্যমে বাস্তব ধর্মী চিত্রকলা থেকে শুরু করে সুররিয়ালিজমের মিশ্র মাধ্যমসহ ভাস্কর্য দারু ও কারু শিল্পের এক অনবদ্য সমন্বয় সঙ্গম সেদিন এই জেলার মানুষ দেখেছিলেন। অনেকের কাছে সেই প্রদর্শনী আজও এক বিরল দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

যে শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে তাঁদের শিল্পকর্মসহ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাপস বসুমল্লিক, নির্মল মুখোপাধ্যায়, মমতা চ্যাটার্জি, মহেশ দাস মন্টু কর্মকার, স্নেহ সরাওগী, বিশ্বনাথ বুটালিয়া ও (ধ্রুব দাস) প্রতিবেদক।

স্ব-রচিত কবিতা প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে সমাদৃত হয় শ্যামরাজগড়িয়া প্রমোদ বেড়িয়া, বিজয় সারাওগী ও তরুণ দাশের কবিতা।

এই প্রদর্শনী পুরুলিয়া জেলার চিত্র ও ভাস্কর্য কলার ভিতকে আরো মজবুত করে কংক্রীটে পরিণত করে। জাতীয় স্তরে মান্যতা প্রাপ্তির এ যেন সঙ্গমস্থল। শিল্প দেওয়ালের কেবল গৃহসজ্জা ও প্রতিমা শিল্পের মধ্যে আর বন্দি হয়ে থাকলো না, রাতারাতি স্থান করে নিল ভারতীয় শিল্পরসের ধ্রুপদী স্রোতে।

এরপর ধেয়ে আসে সত্তরের দশক, দিকে দিকে নকশাল আন্দোলনের অশান্ত পরিবেশ। পুরুলিয়া জেলার শান্ত সমহিত নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে উঠলো কাল-বৈশাখীর ঝড়। বহু কিছুই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। এই ধ্বংসের স্তূপ থেকেই অঙ্কুরিত হল নব জীবনের। প্রতিষ্ঠা হল জেলার একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান "কলানিকেতনের" চিত্র ও ভাস্কর্যকলার বাস্তবধর্মী সৃষ্টি থেকে শুরু করে নিসর্গ শিল্প গবেষণায় সাদা জাগ্রত এই প্রতিষ্ঠান পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কলা নিকেতনে' নির্মিত অসংখ্য ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শোভা বৃদ্ধি করেছে। ভাস্কর্য শিল্পে গ্লাস ফাইবারকে মিডিয়া করে মূর্তি নির্মাণের কৌশল ভারতে সর্বপ্রথম এই প্রতিষ্ঠান থেকেই আবিষ্কৃত হয়। ত্রিপুরা সরকারের আমন্ত্রণে গ্লাস ফাইবার থেকে নির্মিত প্রায় চব্বিশ ফুট উচ্চতার রবীন্দ্রনাথের সর্বোচ্চ প্রতিকৃতিটি শিল্পী নির্মাণ করেন ১৯৮২ সালে। এটিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গ্লাস ফাইবারে সৃষ্টি প্রতিকৃতি। মূর্তিটি আগরতলার রবীন্দ্রকাননে আজও বহু মানুষের মন জয় করে চলেছে। পরবর্তীতে 'কলা নিকেতন' পুরুলিয়া জেলার মাটিতে সর্বপ্রথম ধাতু নির্মিত মূর্তি ও পাথর খোদাই মূর্তির অবতারণা করে ভাস্কর্য শিল্পের সমসাময়িক মূল্যায়নে আন্তজার্তিক সাম্যতার সারিতে পুরুলিয়ার চিত্রও ভাস্কর্যকলার অগ্রগতি-দেশ জুড়ে আজ এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

শুধু তাই নয় প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন ছোট বড় শিল্পীদের দিনরাত নিরলস পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে "ভারতে সর্বপ্রথম একক প্রচেষ্টায় শিল্পিকে গণমুখী করে তুলতে একটি ভ্রাম্যমান শিল্প প্রদর্শনী।"

"কলা নিকেতন" শীর্ষকে এর প্রদর্শনীর সংখ্যা প্রায় দুশোরও বেশি। কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ লক্ষ দর্শকের মন জয় করে চলেছে এই ভ্রাম্যমান শিল্প প্রদর্শন। এ ভাবেই অতি সন্তর্পণে পা ফেলে পুরুলিয়া জেলার চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্প শৈশব থেকে কৈশোর পরে যৌবনে উপনীত হয়ে তার নিজস্ব শিল্প গন্ধরস প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো একটির পর একটি পাপড়িকে মেলে ধরেছে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও পুরুলিয়া

দিলীপকুমার সিংহ

দেবলোকের দিকে উৎসর্গীকৃত মার্গসঙ্গীত নাড়ি নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে-বাঁধা ছিল। এ গান লোপ পেয়ে যায়। সে সময় ধ্রুপদ ধামারের মতো গানকেও দেশি সঙ্গীত বলা হ'ত। দেশি সঙ্গীতের গঠনেও নির্দিষ্টতা ছিল। ধ্রুপদের পর খেয়াল ঠুংরি মঞ্চ পেল। এদের গঠনেও আছে যৎপরোনাস্তি বিধি নিষেধ। এসব কারণেই সঙ্গীতের বড়োসড়ো এক শাস্ত্র তৈরি হল। লোকে বলে—শাস্ত্রীয় সঙ্গীত।

মানভূম বা পুরুলিয়ায় এখানের নিজস্ব লোকগীতি —ঝুমুর, টুসু, ভাদু, করম, জাওয়া, বাঁদনার মতো হাজারো গানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরও চর্চা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো খবর নেই কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পুরোটাই এ জেলার ভারতবিখ্যাত সব ধ্রুপদী শিল্পীদের আনাগোনা। ভারতবর্ষের সবটাই তখন রাজন্যবর্গের আওতায়। বিত্ত বৈভব সব তাঁদেরই। সুতরাং রুচি থাকলে এই মূল্যবান জিনিসটিকে আমন্ত্রণ জানাতে তাঁদের অসুবিধে ছিল না।

মহারাজা নিলমণি সিংদেও ১২৫১-১৮৯৮ সাল —পুরুলিয়ার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলার পক্ষ থেকে 'সিপাহী বিদ্রোহে' যাঁর সব থেকে বেশি অবদান— সেই মহারাজা নিলমণি সিংহের দরবারে যেমন ছিল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সমাদর তেমনই ছিল সঙ্গীত শিল্পীদেরও। সে সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী উস্তাদ 'খুদাবক্স' বহুবার এর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত জগৎচন্দ্র গোস্বামী বংশীবাদক পূরণ সিং চৌতাল, মৃদঙ্গ শিল্পী হারাধন গোস্বামী স্থায়ীভাবে বসবাস করে সঙ্গীত সৃষ্টি করতেন। নীলমণি সিংদেও উত্তর বিহার থেকে বেতিহা বা কথক ঘরানার ধ্রুপদ শিল্পী নীলমণি পাঠককে এনে সভাগায়ক করেছিলেন—দিয়েছিলেন বহু জমি সম্পত্তি। পরবর্তীকালে ঘোঙা গ্রামে নীলমণি পাঠকের বংশধর ও আত্মিয়েরা মানভূমে শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাটি বজায় রাখার বিষয়ে বেশকিছু দায়িত্ব পালন করেন। মহারাজা নীলমণি সিংহের আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সঙ্গীতে কিংবদন্তি পুরুষ 'যদুভট্টের পুরুলিয়ায় আগমণ। কাশীপুর রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশনা। মহারাজা তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা ছাড়াও বিশিষ্ট উপাধিভূষণে সম্মানিত করে তোলেন। যদুভট্ট নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখেন নি। কাশীপুরে পদার্পণ করার সময় তিনি পুরুলিয়ার শহর সন্নিকটস্থ ঘোঙা গ্রামে অল্পদিন অবস্থান করে কথক ঘরানার কিছু সুন্দর ধ্রুপদ সংগ্রহ করেন বলে কথিত হয়। যদুভট্ট তখন বর্ধমান মহারাজার সভাগায়ক। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হলে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে পুরুলিয়ার পাট ঝালদায় ভট্টাচার্য্য পরিবারে দীর্ঘদিন অবস্থান করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এলাকার লোকদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলেন। মহারাজ নীলমণি সিংহ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারের নজরবন্দি হিসেবে কলকাতায়

অবস্থানকালে একদিন (১৮৫৭ খ্রি:) স্বনামধন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে সুরবাহার যন্ত্রে দু'টি রাগ পরিবেশন করে শোনান। এতে প্রমাণ হয় যে বিখ্যাত উস্তাদদের আগমন ও শিল্প প্রদর্শন সঙ্গীত শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেরণা যোগাত।

রাজা জ্যোতিপ্রসাদ (১৯০১-১৯৩৮)— পরবর্তীকালে রাজা জ্যোতিপ্রসাদের আমলে তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় ভারত প্রসিদ্ধ উস্তাদ ওয়াজির আলী খাঁ পুরুলিয়ায় আগমন এবং পঞ্চকোট রাজদরবারে কয়েকটি অনুষ্ঠান করে যান। এরপর জ্যোতিপ্রসাদের আগ্রহ উপশাস্ত্রীয় গানের দিকে চলে যায়। নিয়ে আসেন সেকালের ঠুংরী গানের কিংবদন্তি মৈজুদ্দিন খাঁকে। সঙ্গে আসেন ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও—হার্মোনিয়মের যাদুকর। এঁরা কিছুদিন অবস্থান করেন। কাশীপুর ছাড়া সংলগ্ন রঘুনাথপুরের অনেকেরই এঁদের অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ হয়েছিল। পুজোপার্বন, অভিষেকের স্মারক দিবস ও পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে বহু নামী ও অনামা বাঈজিদের আগমন হত—রাজদরবারে। এঁদের মধ্যে সব থেকে দামি—মালকা পোখরাজ ও গওহরজান বাঈ। এঁরা একাধিক দিন অবস্থান করে সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন। এজন্য এঁদের গায়ন শৈলী নিয়ে তখনকার দিনে জন সাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ আলোচনা হত। জ্যোতি প্রসাদের আমলে - ধ্রুপদ গানের কথক ঘরানার শিল্পি হিসেবে শিবু পাঠক সভা গায়ক পদে ছিলেন কখনকার দিনে আচার্যের মতো।

রাজা কল্যাণী প্রসাদ (১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত) :— রাজা কল্যাণী প্রসাদের আমলে বেনারসের প্রখ্যাত শিল্পী—ইনি ঠুংরি, কাজরি, চৈতি পরিবেশন করতেন। এ ছাড়া সেকালের সবরকম গানে পারদর্শিনী কমলা ঝরিয়া দীর্ঘদিন অবস্থান করে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

পঞ্চকোট রাজাদের আয়োজিত এই সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলি তাঁদের নিজেদের পরিবারের, রঘুনাথপুর, পাড়া ও পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করত। লালসাহেবদের অনেকেই তব্‌লাবদনে ও ঠুংরী গায়নে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতেন। কাশীপুর ও রঘুনাথপুরের কতিপয় অনুশীলনী পরে পরে জনপ্রিয় বাঁশী ও হার্মোনিয়ম শিল্পী হয়ে ওঠেন। রাজপরিবারে রচিত মাতৃসঙ্গীত ও ভদ্রেশ্বরী নীতি রাজপরিবারে রচিত মাতৃসঙ্গীত ও ভদ্রেশ্বরী গীতির উপর ভৈরবী, খাম্বাজ, বাগেশ্বরী, বৃন্দাবনীসার, প্রভৃতি রাগের বিলক্ষণ ছায়াপাত ঘটে। পঞ্চকোট দরবারে অনুষ্ঠান করে ফিরে যাওয়ার পথে উস্তাদরা পুরুলিয়া শহরে আসর করে যেতেন - এতে সাধারণ শ্রোতারা উপকৃত হতেন।

আনুমানিক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে পুরুলিয়ায় দু'জন প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী—পশুপতি দাস (ধ্রুপদ) ও গঙ্গাধর পরামাণিক (পাখোয়াজ) সঙ্গীত শিল্পীদের শীর্ষে ওঠেন। তাঁদের গান ও বাজনার রীতিছিল অভিনব, গতানুগতিক ঢঙ যেন থম্‌কে যেতো। সে সময় কলকাতার ধ্রুপদ ধামার টপ্‌পা, খেয়াল ও বাংলা গানের বিশিষ্ট শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এস.ডি.ও. হয়ে পুরুলিয়ায় এলে পশুপতি গঙ্গাধরের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের মধ্যে সঙ্গীত নৈপুণ্যের হৃদ্যতাপূর্ণ ও প্রশংসাবাক্যের বিনিময় হয়।

এসময় বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী পুরুলিয়া শহরের সঙ্গীতমঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ইনি পুরুলিয়া শহর হয়ে প্রায়শই তাঁর প্রিয় শিষ্যা কমলাঝরিয়াকে গান শেখাতে ঝরিয়ায় যেতেন।

এর অল্‌পকালপরে পুরুলিয়ায় বেনারসঘরনার তবলাবাদক বুঁদিমিশ্র ও তস্যপুত্র কণ্ঠশিল্পী রামুমিশ্রের আগমন হয়। এঁরা কিছুকাল পুরুলিয়ায় থেকে শিক্ষকতার মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চাকে সমৃদ্ধ করেন।

পুরুলিয়ায় একমাত্র জলতরঙ্গ শিল্পী শিবপ্রসাদলাই যাঁর শিক্ষা বিষ্ণুপুরে, তাঁর বাজনায় মানুষকে

মোহিত করতেন কিন্তু ইনি কোনও ছাত্রছাত্রী রেখে যেতে পারেননি। এই সময়টিতে ঘোঙা গ্রামে প্রথমে কথক ঘরানার ধ্রুপদী শিবু পাঠকের কাছে বেশ কয়েকজনা তালিম নেন, এঁদের মধ্যে বসন্ত সরকার ও কালিপদ পাঠক তাঁদের জীবদ্দশায় বেশ কিছু আসর করে যান। ধ্রুপদের যুগের এই শেষভাগে আরো কয়েকজন ধ্রুপদের চর্চা করতেন - তাঁরা পশুপতি দাস শিষ্য ফনীন্দ্রভূষণ মজুমদার, রাধিকা গোস্বামী শিষ্য বিষ্ণুপদরায় ও কামদা মুখোপাধ্যায়। এঁদের সঙ্গে সঙ্গত করতেন গঙ্গাধর শিষ্য যোগদানন্দ দাস। পুঞ্চা গ্রামের সুকন্ঠ ধ্রুপদীয়া নীলকন্ঠ ঘোষ তৎকালীন উড়িষ্যার (অধুনা বিহার) রাজখর সোঁয়া এষ্টেটের সভা গায়ক রূপে কাটান পরে ইনি পুরুলিয়ায় রামকৃষ্ণ তারক মঠ আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সে সময় এঁর সঙ্গে পাখেয়াজ সঙ্গত করতেন ভোলুদাস। তারকমঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ওপানন্দ স্বয়ং ধ্রুপদ গাইতেন। পাখোয়াজের চর্চায় মগ্ন থাকতেন তস্য শিষ্য ত্রিদিবানন্দ গিরী। কেরোসিন বাতি ও টানাপাখার এই যুগে পুরুলিয়ায় অনেক সন্ধ্যা ধ্রুপদের উদাত্ত "ওঁ অনন্ত নারায়ণ হরি" আলাপে ও মৃদঙ্গের সুগম্ভীর আওয়াজে মন্দ্রিত হয়ে উঠত। পুরুলিয়ার লৌলাড়া গ্রামের অধিবাসী রাম চট্টোপাধ্যায় বেনারসের একজন বিশিষ্ট পাখোয়াজ শিক্ষক (নাম সংগ্রহ সম্ভব হয়নি) যিনি তখন কলকাতার নিমতলা স্ট্রিটে থাকতেন, তাঁর কাছে নিয়মিত পাখোয়াজ শিক্ষা করতেন। অধিক বয়সে এঁর প্রতিভু রাখার কথা মনে পড়লে শিক্ষাকতায় নেমে দেখেন ধ্রুপদের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ তারক মঠে শ্যামাপুজোর রাত্রে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতপিপাসুদের ভিড় হত। এই উপলক্ষে সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত সিয়ারাম তিয়াড়ি ও আরো অনেকে।

এরপর খেয়ালগানের প্রচারে পুরুলিয়ার দু'টি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রধান ভূমিকা নেয় একটি পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত বিদ্যালয় অন্যটি সারস্বত সঙ্গীত বিদ্যালয়। এর একটি জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামির সুকণ্ঠ শিষ্য নীলমণি সিংহকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিল।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে চাকদহ থেকে এনায়েৎখাঁ শিষ্য গোপী বল্লভ দে এলেন পুরুলিয়ায়। ইনি কিছুকাল এখানে কাটান ও অল্প কয়েকজনাকে সেতার শিক্ষা দিয়ে তারের যন্ত্র চর্চার ঘাটতি পূরণ করার উদ্যোগ নেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের ভূমিকা :

১৯৬০ ও ১৯৬১ সাল সরকারি উদ্যোগে, ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ সুরতীর্থ সঙ্গীত সংস্থার উদ্যোগে এবং ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত 'জলসা সঙ্গীত গোষ্ঠীর মাধ্যমে সারারাত্রির সঙ্গীতানুষ্ঠানে একই সঙ্গে একাধিক ভারতমান্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের অনুষ্ঠান শুনে পুরুলিয়া জেলাবাসী সঙ্গীত রসিকরা বিমোহিত। উনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রসাদ রাজন্যবর্গের দাক্ষিণ্যে জুটত মুষ্টিমেয়র ভাগ্যে, বিংশ শতাব্দীতে সেই আকর্ষণীয় বস্তুটি যেন গণতান্ত্রিক হয়ে মাইক্রোফোনের সুসহযোগিতায় প্রেক্ষাগৃহে অপেক্ষামান বহুজনার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে সুধাবর্ষণ করল। রাত্রি প্রভাত হলে সুরের মাদকতা ও আবার জেগে ওঠা পিপাসা নিয়ে শ্রোতারা বাড়ি যান।

"গীতবাদ্যং তথা নৃত্যং " এর তৃতীয়টির চর্চার অভাব পুরুলিয়ায় বিলক্ষণ ছিল কিন্তু বর্তমান দুই দশকে ভারতনাট্যম্, কথক, ওড়িশি এই তিনবিভাগে প্রশিক্ষণের বিস্তার হয়েছে।

সঙ্গীত উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এবং সঙ্গীতের উত্তমশিল্পীর অভাব নেই। আগেকার দিনের তুলনায় সঙ্গীত শিক্ষায় আগ্রহী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ কিন্তু তার সিংহভাগটাই ডিগ্রি ডিপ্লোমা অভিমুখী, পুরুলিয়া তার ব্যতিক্রম নয়।

পুরুলিয়া জেলার ক্রীড়াচর্চা

দয়াময় রায়

পুরুলিয়া জেলার জন্ম ১৯৫৬ সালে। মানভূমের অন্তরালে পুরুলিয়ার বেড়ে ওঠা ভাষার ভিত্তিতে মানভূমের অবলুপ্তি আর জেলা হিসেবে পুরুলিয়ার স্বীকৃতি। পুরুলিয়ার কোন আলোচনাই মানভূমের সত্ত্বা বিচ্ছিন্ন নয়, মানভূম ভারতের মানচিত্রে একটি মুছে যাওয়া নাম কিন্তু দক্ষিণ বাংলার (বঙ্গের) জেলায় তার পরিচিতি অমলিন। ক্রীড়াচর্চার ইতিহাসে পুরুলিয়া একটি ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল জেলা রূপে প্রতিভাত। খেলাধূলার ধারাবাহিক চর্চা মানভূমে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ১৯৩২ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে ক্রীড়াঙ্গনে মানভূম তার জায়গা নিয়েছে। আজ থেকে একশত এক বছর পূর্বে জেলার অন্যতম ক্রীড়া সংস্থা পুরুলিয়া টাউন ক্লাবের জন্ম (১৮০৩)। সময়ের ধারাপাতে হারিয়ে যায় বহু নাম। আবার তারই ভেতরে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে অনেক ক্রীড়া সংগঠক অমলিন থেকেছেন। টাউন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবর্ষে যারা নিরলস শ্রমের বিনিময়ে গড়ে তোলেন সংস্থাটি তারা হলেন সর্বশ্রী (১) প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, (২) ভোলানাথ ব্যানার্জী, (৩) সতীশ চন্দ্র ঘোষ, (৪) [illegible] (৫) বঙ্কিম বসু (৬) বিভূতি দত্ত প্রমুখ। বহু মানুষের একান্ত অনুরাগে ক্লাবটির জন্ম। এম.এস.এ গড়ে ওঠার ত্রিশ [illegible] টাউন ক্লাব খেলাধূলার জগতে সুবিদিত একটি ক্রীড়া সংস্থা।

ঠিক তেমনি আর [illegible] সালে গড়ে ওঠে আমডিহায়। বযেজ ফ্রেন্ডস ক্লাব সংক্ষেপে বি.এফ. সি। নডিহা আমডিহা অঞ্চলের কয়েকজন ক্রীড়ামোদা ব্যক্তিত্ব এই [illegible] আমডিহার জহরলাল বোসের বাড়িতে সেই সভা বসে। তখনের সেই উজ্জ্বল ব্যক্তি ওরা হলেন সর্বশ্রী (১) অমলকুমার [illegible] সকমার মিত্র, (৪) সনৎ কুমার মিত্র, (৫) সুধীর কুমার মিত্র, (৬) ভরতোষ দে, (৭) সন্তোষ কুমার দে, (৮) [illegible] কুণ্ডু, ([illegible] ভটাচার্য, (১০) সুনীল গুহ, (১১) প্রদোষ রঞ্জন সেন, (১২) শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী। প্রথমে ফুটবল খেলা ও সরস্বতী পূজাই এরা করতেন। বলা যায় ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ এই সময়কাল জেলার ফুটবলের ইতিহাসে বি.এফ.সি স্বর্ণযুগ। অন্যান্য ক্লাবগুলিও ভালো সংগঠন, ক্রীড়াচর্চা চালাচ্ছে। টাউন ক্লাব, নেতাজি ক্লাব, কেতিকাফুটবল ক্লাব, সাউথ ইষ্টান রেল তার মধ্যে অন্যতম। জেলার ক্লাবগুলির ইতিহাস ঐতিহ্য দীর্ঘ শুধু একটা রেখায়িত সিন্ধু দর্শন। সামগ্রিক রূপটি জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রবন্ধের মধ্যে সংগঠন-চর্চা আর সমস্যা ও সম্ভাবনার দিক তুলে ধরার প্রচেষ্টা।

পুরুলিয়া জেলার প্রাণপ্রিয় ক্রীড়া সংস্থাটি গড়ে উঠে ১৯৩২ সালে। নামকরণ করা হয় মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বা সংক্ষেপে M.S.A যাকে আবার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বা

সংক্ষেপে D.S.A বলা হয়। ১৯৩২ সালের আগে তখন মানভূমে অনেকগুলি ক্লাবের জন্ম হয়েছে। অসংগঠিতভাবে খেলাধূলা সারা জেলায় ছড়িয়ে। জেলার বিভিন্ন ক্লাবকে ক্রীড়াচর্চার মূলস্রোতে এনে তাদের উৎসাহী করে তুলতে সংগঠিত ক্রীড়া সংস্থা এম. এস.এ-র সৃষ্টি। মূল সংগঠনরূপে মানভূম জেলায় আত্মপ্রকাশ করে।

সংগঠনের কার্যবিধি বা নিয়মনীতি সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে বর্তমান বাসস্ট্যান্ডের উত্তর দিকে ইউনিয়ন ক্লাবে (এখন যেখানে তিব্বতী মার্কেট বসে) ২৯।৫।১৯৩২ সালে প্রথম সভা বসে। সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করেছেন---

(১) মিঃ এ.ই.ব্লুইট - এস পি. মানভূম।
(২) রায় সাহেব পি.এন. মুখার্জী - এস.ডি.ও.।
(৩) মিঃ সি. কে. রমন।
(৪) মিঃ বিসলে।
(৫) মিঃ বি. সেনগুপ্ত।
(৬) মিঃ বি. দত্ত ।
(৭) মিঃ হেমেন্দ্র কুমার মুখার্জী।
(৮) মিঃ পি.দাসগুপ্ত।
(৯) মিঃ এস.দাসগুপ্ত।
(১০) মিঃ বোধি সেনগুপ্ত।
(১১) মিঃ বি.সি. বোস।
(১২) মিঃ এ. সরকার।

২৯ মে ১৯৩২ সালের সেই ঐতিহাসিক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এম. এস. এ-তে নয়জন সাধারণ সদস্য ও ছয়জন কার্যকারী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হবে। তার মধ্যে একজন সভাপতি, দুজন সহ-সভাপতি, দুজন-যুগ্ম সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ থাকবেন।

এম. এস. এ গঠিত হবার পর তার সামগ্রিক পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মবিধি তৈরি করতে সাব কমিটি গঠন করা হল। সেই সাব কমিটির প্রস্তাবিত নীতি নিয়মের খসড়া পেশ করা হল ২৩।৭।১৯৩২ তারিখের সাধারণ সভায়। মিঃ এ. ই. ব্লুইট সেদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মানভূম জেলা ফুটবল লীগ চালু করার। তার জন্য পাঁচজনের ফুটবল সাব কমিটি করা হয় মিঃ এ.ই.ব্লুইট সভাপতি, মিঃ বি.দত্ত সম্পাদক ও মিঃ সি.কে. রমন, মিঃ বিসলে এবং মিঃ বি. সেনগুপ্ত সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩২ সালেই এড্হক কমিটি থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকারী কমিটি নির্বাচিত হয়। বিভিন্ন সংস্থার প্রধান, সরকারি প্রতিনিধি বা জেলার ক্রীড়া সংগঠক, তারা হলেন-

(1) District Commisioner of Manbhum	----Ex-officio President
(2) L.K.Mitra	---- Vice President
(3) A.E.Bluit	---- Vice President
(4) B.Sengupta	---- Joint Secretary
(5) B.Dutta	----- Joint Secretary
(6) D.K.Mitra	----- Tresurer

Members

(1) Head Master	Purulia Zilla School
(2) Head Master	Manbhum Victoria Institution, Purulia
(3) Chairman	Municipality, Purulia
(4) J.Acharia	Vice Chairman, District Board, Manbhum
(5) Sudhansu Sakhar Chatterjee	Namopara, Purulia
(6) A.K.Bose	Advocate, Purulia
(7) Babu Shaligram Maromari	Marchant, Purulia
(8) Mr.Beasley	

এম.এস.এর সদস্য ফি ধার্য করা হল ১টাকা, বাৎসরিক ক্লাব সদস্য অনুমোদনের জন্য শেষ তারিখ রাখা ছিল ১০।৮।১৯৩২। ওই বছরই ফুটবল খেলাকে জনপ্রিয় করে তুলতে জেলা সংগঠনের পরিচালনায় চারটি কাপের ব্যবস্থা করা হল। তার মধ্যে (১) টাউন ক্লাব কাপ (২) কমলা স্মৃতি শীল্ড, (৩) রাধিকারঞ্জন সরকার স্মৃতি কাপ ও (৪) সাহিত্য মন্দির কাপ। এর মধ্যে সাহিত্য মন্দির কাপ অনূর্ধ ১৬ বছর বয়সের ফুটবল প্রতিযোগিতা। বিশেষতঃ স্কুল পর্যায়ে ফুটবলে উৎসাহ দিতে এই আয়োজন। এছাড়া মিঃ এ.ই.ব্লুইটের সভাপতিত্বে ১৯৩৪ সালে আরও দুটি কাপের খেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৯৩৪ সালের মায়ারানী কাপ ফুটবলের জোয়ার আনে। আর এ বছরই পরিতোষ স্মৃতি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা চালু করা হয়, যার প্রবেশ ফি ছিল ৫ টাকা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল জেলা ক্রীড়া সংগঠনটি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্কুল পর্যায়ের ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ফুটবলে নব উন্মাদনা আনার চেষ্টা দিক চিহ্ন স্বরূপ। তখনও রাজ্য বা সর্বভারতীয় স্তরে সুব্রত মুখার্জী কাপ ফুটবল শুরু হয়নি। আজকের এই মিনি ডুরান্ডের জন্ম ১৯৬১ সালে পঃ বঙ্গে। ওই বছরই কলকাতার রানী রাসমনি হাইস্কুল রাজ্য ও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে এবং আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল রাজ্য পর্যায়ে রানার্স হয়। ফলে মানভূমের স্কুল ফুটবল চর্চা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। হয়তো বা প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল চালু হয় ১৯৩০ সালে, তার প্রভাব সারা পৃথিবীতে পড়েছিল। ১৯৩৭ সালে জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল প্রতিযোগিতা যেমন (১) মায়ারানী ক্লাব কাপ ও (২) কমলা স্মৃতি শীল্ড খেলার জন্য Indian Football Association-এর কাছে আবেদন করা হয়। এর ফলে খেলা দুটিই রাজ্য পর্যায়ের মর্যাদা লাভ করে। জেলার ফুটবলের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে বলেই ১৯৩৮ সালে রায় বাহাদুর শরৎ সেন স্মৃতি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মানভূম স্পোর্টস্ অ্যাসোসিয়েশন শুরুর লগ্ন থেকেই জেলার ক্রীড়াজগতে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তুলে ধরা হয় ফুটবলকে। তখন মাঠ বলতে দু'টি পুরুলিয়া শহরে। মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের মাঠ ও পুরুলিয়া জেল গ্রাউন্ড। দুটি মাঠেই খেলা হত। ঘেরা বলতে চটের। তাতেই দর্শক সমাগম হত প্রচুর।

১৯৩২ সালের এম. এস. এ এখন বিশাল আকার ধারণ করেছে। বহু নামাওঠা, আনন্দবেদনা, হাসিউল্লাসের মাঝখান দিয়ে এর পথ চলাকালের প্রবাহের মত ইউনিয়ন ক্লাব থেকে ক্রীড়া সংগঠন অফিসটি স্থানান্তরিত করা হয় হেমাঙ্গিনী স্কাউট হলে ৬০ এর দশকের গোড়ায়। হেমাঙ্গিনী স্কাউট হলটি বি.টি. সরকার রোডের উপর। যেখানে বর্তমানে সরকার পোষিত ঋষি অরবিন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শ্রী অরবিন্দ এডুকেশন সেণ্টার নামে অরবিন্দ সোসাইটির প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে।

কয়েক বছর মূল অফিসটি চালানোর পর সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভাবনার পরিবর্তন ঘটল। সে সময়ের কর্মী সংগঠকরা জেলার খেলাধূলার মানকে উচ্চে তুলে ধরতে আর একধাপ এগোলেন। মূল অফিসের ভাবনা মাঠের পাশে ভাবা হল। পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডের চারদিক স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা করা হয়। শুরু হল বৃহত্তম কর্মযঞ্জের ব্যাপক প্রস্তুতি। সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, যাত্রা উৎসব ওজেলার ক্রীড়ামোদী জনগনের দু হাতের প্রানভরা দানে শুরু হল মূল অফিস সংলগ্ন উত্তর দিকের গ্যালারি। সালটা ১৯৭৫। দশ হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট আজকের স্টেডিয়াম। ডঃ সুকুমার রায় সাধারণ সম্পাদক থাকাকালিন উত্তরের গ্যালারি তৈরি হয় দুদিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গ্যালারি হয়েছে বা মাঠের পশ্চিম দিকে নির্ম্মিয়মান গ্যালারি। মাঠের তিন দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আরও চারটি ব্লক। উত্তর-পূর্ব দিকের গ্যালারি ও দোকানঘরগুলি তৈরি হয়েছে নটবর বাগদি সাধারণ সম্পাদক থাকাকালিন। মাঠের উত্তর-পশ্চিম দিকের গ্যালারি নির্মিত হয় শান্ত মুখার্জী সাধারণ সম্পাদক পদে আসিন সময়ে। শোভন শূর রায় (লিটন) সম্পাদক হিসেবে মাঠের চারদিকে ফেন্সিং-এর কাজ তদারকি করে মাঠের সৌজন্য বৃদ্ধি করান। বর্তমানে মাঠের পশ্চিম দিকের দক্ষিণ অংশে গ্যালারির কাজ চলছে। এখন এম. এস. এ-র সাধারণ সম্পাদক মহঃ মিসবাউদ্দীন। এই তিনটি ব্লকের মধ্যে যাদের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণ করা যায় তা হল " এই ব্লকগুলির একটি নির্মিত হয়েছে জেলা সভাধিপতি শ্রী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে এবং তদানীন্তন পুব প্রধান শ্রী কৃষ্ণপদ বিশ্বাসের নির্বাচিত প্রতিনিধির প্রযুক্তিগত পরামর্শে ও এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে। তৃতীয় ব্লকটি নির্মিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে। চতুর্থ ব্লকটি নির্ম্মিয়মান স্থানীয় সাংসদ শ্রী বীর সিং মাহাত মহাশয়ের মঞ্জুরীকৃত অর্থে......।" (জন্মলগ্ন থেকে আজ ২০০১, শান্ত মুখার্জী, স্মরণিকা ২০০১)।

সবচেয়ে আনন্দের খবর জেলায় ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার কর্ণধার পুরুলিয়া বিধানসভার মাননীয় বিধানসভার সদস্য শ্রী নিখিল মুখার্জী মহাশয় ও এম.এস.এ-র বর্তমান কার্যকরী কমিটি। ইনডোর স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জনপ্রিয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়, প.বঃ সরকার। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সমকালের জেলা সমাহর্তা শ্রী দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়। প্রস্তাবিত ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি হবে মাঠের পূর্ব প্রান্তের শেষ দিকে। স্টেডিয়ামটি ২ কোটি ব্যয়ে নির্মিত হবে। প্রস্তাবিত স্টেডিয়ামে থাকবে ৩,৫০০ দর্শক আসন। এর মধ্যে সম্ভাব্য খেলাগুলির আয়োজন করা যাবে তা হল টিটি, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, ক্রিকেট পিচ। এর বাস্তবায়ন হলে তা হবে একুশ শতকের নবতম সংযোজন।

বর্তমানে জেলা ক্রীড়া সংস্থাটি আর পুরোনো অবস্থানে নেই। সদস্যসংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ২০০২ সালে লাইফমেম্বার ৫৩৫ জন ও অ্যাসোসিয়েট মেম্বার ২৫৪ , মোট ৭৮৯ জন। যার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত ক্লাবের সংখ্যা ৯২টি। আর জেলায় রেজেস্ট্রিকৃত বা রেজেস্ট্রিকৃত নয়, এমন সংখ্যা বর্তমানে দু-হাজারের বেশি। ব্লক যুবকল্যাণের তথ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু ২০০-র বেশি ক্লাব সক্রিয় নয়। বিভিন্ন ক্রীড়াচর্চার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করতে এই সত্যে পৌঁছানো যাবে। জেলার ক্রীড়াচর্চার মান দিন দিন বাড়ছে বলেই জেলা ক্রীড়ার সর্বোচ্চ সংস্থাটি রঘুনাথপুর মহকুমায় Subdivision Sports Association তৈরি করেছে। আবার সদর মহকুমার বিস্তৃত এলাকার ক্রীড়াচেতনা ও চর্চার শ্রীবৃদ্ধির জন্য বলরামপুর জোন ও ঝালদা জোন তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান দিনের খেলাধূলার চর্চা বেড়েছে বলেই মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কার্যকরী কমিটি ও সাব কমিটিগুলি তৈরি করেছে। ১৯৩২ সালের কার্যকারী কমিটির ছাঁচে এর বিস্তার ঘটানো হয়েছে।

Present Committee

(1) President--District Magistrate,Purulia .
(2) Working President--Krishnapada Biswas.
(3) Vice President--Supdt.of Police, Purulia.
(4) Vice President--Santa Mukherjee.
(5) General Secretary--Md.Misbah Uddin.
(6) A.General Secretary--Ashish Ranjan Dasgupta.
(7) Treasurer--Sabyasachi Ghosh.
(8) Asst. Treasurer--Anirban Banerjee.
(9) Football--Praloy Dasgupta.
(10) Cricket--Sabyasachi Dutta.
(11) Athletic--Sekhar Nath Ghosh.
(12) Volleyball--Argha Chowdhury.
(13) Table Tennis--Sabil Alam.
(14) Yogasan/Indoor--Gour Sarkar.
(15) Life Member–Samir Sinha

মূল স্টেডিয়ামের অফিস সংলগ্ন একটি জিম করা হয়েছে। এম.এস.এ পরিচালিত ফুটবল লীগ দুটি পর্যায়ে চলছে এ-ডিভিশন ও বি-ডিভিশন। জেলা প্রশাসনসহ বহু মানুষের ভালোবাসার এম. এস.এ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

মানভূম পুরুলিয়া কেন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ফুটবল প্রানপ্রিয় জনপ্রিয় খেলা। "The greatest show on earth" হল ফুটবল। এর যাদু মহিমা পৃথিবার মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে পারে। ক্রিকেট, ভলিবল, হকি, টি টি, ব্যাডমিন্টন, রাগবি প্রভৃতি কিছুদেশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ফুটবল বিশ্বের প্রতিটি কোনে। সুদূরতম কোনে তার আলোচনা আলোড়ন স্পন্দন। যদিও ভারতে ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রুডেনশিয়াল কাপ জয়ের ফলে ক্রিকেট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কিন্তু ফুটবল আমাদের অন্যতম প্রিয় খেলা। মানভূম তার ব্যতিক্রম নয়। টাউন ক্লাব ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠা তার প্রমান দেয়, কিংবা বি.এফ.সি ক্লাব সেই সত্যের প্রমান দেয়। পুরুলিয়া জেলা জন্মের অনেক আগেই ফুটবল প্রচলিত ছিল। ১৯৫৬-র ভাষা আন্দোলন জনিত কারণে পুরুলিয়ার জেলা হিসেবে সৃষ্টি। এর পূর্বে মানভূম জেলায় ফুটবল খেলার উন্মাদনা ছিল ব্যাপক। ধানবাদ, রাঁচি, জামসেদপুর, ঝরিয়া থেকে প্রচুর ফুটবল খেলোয়াড় পুরুলিয়া শহরের মাঠে আসতেন। কিছু ক্রিকেটার টাটা, রাচি, পাটনা থেকে এসে মানভূম জেলায় খেলে গেছেন। মাঠ বলতে দুটি। মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের মাঠে চট বা চিন দিয়ে ঘেরা করে ফুটবল খেলা হত। ১৯৫০ সালে এই মাঠে বি.এফ.সি ও বিহার মিলিটারি পুলিশের (বি.এম.সি) খেলা তিনদিন ড্র হয়েছিল। ভয়ংকরতম•উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে দর্শক সমাগম সেদিনের ফুটবল জগতের দিকচিহ্ন স্বরূপ। অপর মাঠটি হল জেলা গ্রাউন্ড যার উপর এম.এস.এ দাড়িয়ে।

মানভূমের ক্রীড়া চর্চা বিশেষ করে ব্যায়াম চর্চা, শরীর গঠন, লাঠি খেলা, ব্রতচারী, ভলিবল, হকি ও সামান্য ভাবে ক্রিকেটের মাঝে ফুটবলই শেষ কথা। প্রাক পুরুলিয়া পর্বের মানভূম জেলায় ফুটবলের জগতে দুজন ফুটবলারের নাম স্মরনীয়- (১) শানু ওঁরা, মিনি টাউন ক্লাবের খেলোয়াড় বিহার রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। (২) তারুয়া মাহাত, বি.এ.সি. ক্লাবে খেলতেন। যিনি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল একাদশে পরে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছিলেন। ৫০ এর দশকে মাঠে পাশ করা রেফারীর বড়ই

অভাব ছিল। স্থানীয় দু চারজন খেলা পরিচালনা করতেন। দর্শকরা শান্তভাবেই মেনে নিতেন সিদ্ধান্ত। না হলে খেলা বন্ধ হয়ে যেত। মাঠের গন্ডগোল ১০ থেকে ১৫ মিনিট থেমে যেত। এম. এস. এ পরিচালিত লীগ, কমলা স্মৃতি শীল্ড, মায়ারানী কাপের খেলা এবং রাধিকা রঞ্জন কাপের খেলায় দর্শক সমাগম, উদ্দীপনা মনে রাখার মত। সমকালের খেলোয়াড়দের মুখে তারই স্মৃতি আজও শোনা যায়। পুরুলিয়া শহর ছাড়া আদ্রা সবসময়ই মানভূমের ক্রীড়াঙ্গনে উজ্জ্বল একটি নাম। আদ্রা রেল ফুটবল সময়ের সেরা বলে অনেকে দাবি করেন। তাছাড়া আদ্রা রেল থেকে খেলোয়াড়দের চাকুরিতে নিয়োগ করত বলেই অনেকেই ফুটবলকে জীবিকা সহায়ক বলে মনে করে এর উপর প্রাণ মন দিয়ে অংশগ্রহণ করত। যেমন তারুয়া মাহাত, খুরসীদ আহমেদ ও মনা চাটার্জীরা খেলার শর্তে চাকুরিতে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্তমানে তার সুযোগ কমলেও অনেকেই খেলোয়াড় বিভাগে চাকুরি করছেন। আদ্রা কেন্দ্রিক ক্রীড়াচর্চা একটা বাড়তি উৎসাহ সৃষ্টি করে। আদ্রা ফুটবল আকাদেমি চালু হয়েছে। ঘোষ কাপের খেলা আজও অম্লান। আদ্রার বি. এন. দাস, বুল্লি, সি. এইচ. ভেঙ্কটরাও, পুরুলিয়ার গৌরীশঙ্কর হাজরা, কমল বিশ্বাস, বিমল বিশ্বাস ও পীর মহম্মদ এরা স্মরণীয় ফুটবল প্রদর্শন করেছেন। যদিও জেলার ফুটবলারের সংখ্যা অগনিত। তালিকাবদ্ধ করা দুষ্কর। প্রতিটি পর্বের বহু ফুটবলার তাদের ক্রীড় নৈপুন্যে দর্শক মন জয় করেছেন তাদের এ প্রবন্ধে নথিভূক্ত করা সম্ভব নয় বলেই দু চার জনের নাম উল্লেখ করেছি মাত্র।

এম. এস. এ পরিচালিত লীগ মানভূম জেলায় আলোড়ন ফেলে দিত পুরুলিয়া শহরে। বিশেষ করে আমলাপাড়া মিত্র পরিবারের কমলা স্মৃতি শীল্ড প্রাক স্বাধীনতা পূর্বে এমনকি মানভূম ফুটবলের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বি. এফ. সি, টাউন ক্লাব, শেরসা ক্লাব, ইষ্টার্ন রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাব মানভূমের ফুটবলের সাড়া জাগানো নাম।

মানভূম জেলায় ফুটবল চর্চা তিনটি মূল অঞ্চলে সংগঠিত হয়েছে।

(ক) পুরুলিয়া অঞ্চল

(খ) বরাভূম অঞ্চল

(গ) আদ্রা রঘুনাথ অঞ্চল

জেলার মাঝখানে পুরুলিয়া ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মানবাজার পুঞ্চা হুড়া, জয়পুর ঝালদা এলাকার ছেলেরা পুরুলিয়া শহরে আসত, ফুটবলের মূল কেন্দ্রে বিরাজ করত। বরাভূম অঞ্চলের সঙ্গে বাঘমুন্ডীল, বলরামপুর, বরাবাজার ও বান্দোয়ান, ইচাগড়, চান্ডিল, পটমদা অঞ্চলের ছেলেদের যোগসূত্র বলেই একটা অদৃশ্য স্বতন্ত্র ফুটবল অঞ্চলে পরিনত হয়েছিল। আর আদ্রা রেলওয়ে কলোনি সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের বাসভূমি। চাকুরির সূত্রে একস্থানে থাকার ফলেই আদ্রা ক্রীড়ামগুলে খেলাধূলার চর্চা বেশি। ভালো খেলোয়াড়ের যোগান দিয়েছে। তাছাড়া জেলার প্রাণকেন্দ্র পুরুলিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা, এম. এস.এ মাঠ এসব মিলিয়ে ফুটবলের মর্মকেন্দ্রে পরিণত। বলরামপুর আদ্রা পুরুলিয়ার রেল যোগাযোগে মাঝখানে অবস্থিত বলেই পুরুলিয়া শহর বিশেষ করে এম.এস.এ কে কেন্দ্র করে একটা মিশ্র ক্রীড়া অঞ্চল রূপে দেখা দিয়েছে।

জেলা হিসেবে পুরুলিয়ার জন্মের পরই ১৯৫৮ সালে District Physical education এ বেণীমাধব আধিকারিকরূপে থাকাকালীন জেলা স্কুলে একমাস ধরে শারিরীক প্রশিক্ষণ শিবির চালান। এই শিবিরে ৩০ জন শিক্ষানবিশ হিসেবে ট্রেনিং নেন। সময়টা ১৯৫৭ সাল। ফুটবলে পুরুলিয়া জেলা বাংলার মানচিত্র জায়গা করে নেয়। সিনিয়র বিভাগে রাজ্যে রানার্স হয়েছে। ১৯৬১ সালে মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন রেজিস্ট্রিশন করে নম্বর এস/4802/61 জেলায় ফুটবল কোচিং-এ আসেন

ল্যাংচা মিত্র। তাঁর অধীনে ফুটবল প্রশিক্ষণ নিয়ে পরবর্তীক্ষেত্রে ফুটবলে জেলার নাম উপরে তুলেছেন এমন নামের সংখ্যা অনেক। কঠোর অনুশীলন আর নিয়মানুবর্তিতায় জানুয়ারি মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত তিনমাস ষাট জন ফুটবলারকে তিনি প্রশিক্ষণ দেন। সুকু অর্থাৎ শেখরনাথ ঘোষ কানু অর্থাৎ মহ: কামালউদ্দীন তাঁরই সময়ের উপহার। ততদিনে তারক ঘোষ, সুনীল চ্যাটার্জী মেনাক দত্ত ফুটবলে অনেক নাম করেছেন। কলকাতার মাঠে খেলার যোগ্যতা পেয়েছেন পুরুলিয়ার অনেক ফুটবলার তার মধ্যে ষাটের দশকে শেখরনাথ ঘোষ, আশির দশকে সুবীর সরকার, নব্বই-এর দশকে নগেন সিং প্রভৃতি।

কিন্তু পুরুলিয়ার ফুটবল জীবনে ১৯৭৫ সালটি স্মরণীয়। সিনিয়র ফুটবল বিভাগে আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপে যুগ্মভাবে পুরুলিয়া চব্বিশ পরগনার সাথে একাসনে বসে। বাঁকুড়া শহরে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা মানভূম বনাম চব্বিশ পরগনার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার হল চব্বিশ পরগনার হয়ে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ফাইনালে খেলেছিলেন বাংলা তথা পরবর্তীকালে ভারতের দিক্‌পাল ফুটবলার। যেমন শিবাজী ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। তখন নিয়ম ছিল জেলা দল আই.এফ. এ পরিচালিত প্রথম ডিভিশন লীগ থেকে পাঁচ জন ফুটবলার খেলতে পারে। কিন্তু মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের যে সুযোগ ছিল না। সেকারনেও একটা ফুটবলে সাধারন পর্যায়ের অবস্থিত জেলা যুগ্মভাবে বিজয়ী হওয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের। খেলার ফল হয়েছিল ২-২।

আমাদের জেলার অনেক কোচ এসেছেন যেমন, মিঃ লোধ, অধীর ঘোষ, এঁরা জেলার ফুটবলকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে অধীর ঘোষ নেহেরু যুবকেন্দ্র এবং রাজ্যযুবকরণের নিয়ন্ত্রনাধীনে পুরুলিয়া জেলা যুবকরণের উদ্যোগে সারা জেলায় বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। যাঁরা ৮০ র দশকে ফুটবলে নাম কুড়িয়েছেন তারা সকলেই অধীর ঘোষের ছাত্র। এছাড়া প্রদীপনাথ ও অশোক নাগ Sports council coach হিসেবে পুরুলিয়া এসে কোচিং করান। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ ১৯৯৯ সালে জেলা যুবকরণের কোচ হিসেবে আসেন উত্তম ঘোষ। তিনি রাঙ্গাডি শ্রীভজনাশ্রম হাইস্কুলের প্রশিক্ষক রূপে কাজ করেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে রাঙ্গাডি শ্রীভজনাশ্রম হাইস্কুলে ২০০০ সালে সুব্রত মুখার্জী কাপ ফুটবলে ভারতসেরার শিরোপা পায়। প্রবন্ধকার তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

ফুটবল আমাদের গর্বের খেলা। ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল-এর মাঠ তার নীরব সাক্ষী। জাতীয় ক্লাব মোহনবাগান ভিক্টোরিয়া মাঠে টাটা টেলকো দলের সাথে খেলে গেছে। আবার ১০।৩।১৯৯৬ সালে হুটমুড়া আঞ্চলিক পরিষদের পরিচালনায় মোহনবাগান বনাম বার্ণপুর ইউনাইটেড ক্লাবের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ফুটবলে জেলার সংগঠন অনেকবার যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে। ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের মাঠে মহিলা ফুটবল খেলা হয়। দর্শক সমাগম হয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত। মাঠের বাইরে বহুলোক খেলা দেখতে পারেননি। তাছাড়া রাজ্য ও জাতীয় স্তরের মহিলা ফুটবলের আসর বসেছে জেলার নানাপ্রান্তে কান্টাডি। বলরামপুর হুড়া বেলিয়ামা অঞ্চলে দর্শক সমাগম অভূতপূর্ব। কান্টাডি মাঠে দর্শক সামলাতে হিমসিম কর্মকর্তারা। বলরামপুর ফুলচাঁদ হাইস্কুল মাঠে দর্শক সমাগম ১২-১৩ হাজার। এছাড়া পুরুলিয়ার এম. এস. এ ময়দানে সর্বভারতীয় মহিলা ফুটবলের আয়োজন করা হয়েছিল।

জেলায় বহু ফুটবলারের জন্ম হয়েছে। বহুপ্রতিভা হারিয়ে গেছে। দু-একটি নাম আজও বেদনা দেয়। যাদের প্রতিভা ছিল সুযোগ সুবিধা না পেয়েও জেলার বাইরে যেতে পারেনি । সকলেই বাজার মাঝি হতে পারেনি। প্রচারে আলো থেকে দূরে ছিটকে গেছে। সুবীর সরকার, কৃষ্ণটুডু জেলার গর্ব।

সুবীর কলকাতা ময়দানের সুপরিচিত নাম। কৃষ্ণটুডু রাঙ্গাডি শ্রীভজনাশ্রম হাইস্কুলের ছাত্র বর্তমানে বেঙ্গল মুম্বাইক্লাবের খেলোয়াড়। হারিয়ে যাওয়া সম্ভাবনাকে তুলে আনতে হবে পাদপ্রদীপে। তার জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ। আবাসিক শিবির উপযুক্ত পরিকাঠামো, আধুনিক শারীরশিক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম উপযুক্ত প্রশিক্ষক স্কুলপর্যায়ে ফুটবলার নির্বাচন আর উপযুক্ত সবুজ মাঠ। তাহলেই পুরুলিয়ার বুকে বহু উজ্জ্বল ফুটবলার মাথা তুলে দাঁড়াবে। জীবিকা সহায়ক নয় বলেই ফুটবল থেকে ছেলেরা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। তাছাড়া মা-বাবা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ছেলেদের ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার করতে চাইছেন। স্কুল পর্যায়ে কোচিং এর ব্যবস্থা চালু করলে ফুটবলার উঠে আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফুট[illegible] হয়ে উঠছে গ্রামমুখী আর শহর হচ্ছে ক্রিকেটমুখী। সর্বোপরি জেলার অধিকাংশ ফুটবল দলে আদিবাসী [illegible] জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ ফুটবলকে গুডবাই জানাচ্ছে এটাই দুঃখের। তাই বেশির ভাগ ক্লাবে ফুটবলার নেই ফুটবল আছে।

ফুটবলবাদে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য জেলা ক্রীড়া সংগঠন ক্রিকেট আকাদেমী চালু করে ১৯৯৬ সালে।Manbhum Sports Association Cricket Academyর প্রশিক্ষক জয়ন্ত মিত্র। শারীরশিক্ষক গৌতম গরাই। অনূর্ধ ১৪ করে ক্রিকেট আকাদেমী চালু করা হলেও ১৯৯৮ সালে দুটি বিভাগে চলছে--(ক) অনূর্ধ ১২ বছর (খ) অনূর্ধ ১৪ বছর। পুরুলিয়া জেলায় ক্রিকেটের চর্চা অনেক আগে থেকেই আদ্রা আনাড়া পুরুলিয়া শহরে এর প্রচলন বহুদিনের। এক সময় সুহৃদ মিত্র রামকৃষ্ণ মিশনে কোচ হিসেবে আসেন। জেলা সদরের কিছু ছেলে তাঁর কাছে পলিটেকনিক মাঠে ক্রিকেটের কোচিং নেন। জেলায় ব্যাকরণসম্মত ক্রিকেট খেলা হয় জেলায় লীগ। আন্তজেলা টুর্নামেন্ট সি.এ.বি পরিচালিত স্কুল টুর্নামেন্ট। বাকি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চলছে টেনিস বল আর একটা ব্যাট, একটা উইকেট কিংবা ইটের উইকেটে ক্রিকেট যুদ্ধ। এর ভবিষ্যৎ কি বলতে পারে ভবিষ্যৎই। না আছে শরীরচর্চা না আছে পোশাক শুধু মাঠেঘাটে খেতে-খামারে ক্রিকেট।

কিন্তু ক্রিকেটে সাবজুনিয়র বা স্কুল পর্যায়ে আমাদের জেলার খানিকটা কৃতিত্ব রয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে স্থানীয় হিলভিউ মাঠে অনুষ্ঠিত সাবজুনিয়ারের রাজ্য পর্যায়ের পুরুলিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। তবে তার আগে ১৯৮৭-৮৮ সালে জুনিয়র বিভাগে পুরুলিয়া রার্নাস হয়। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি মাঠে। West Bengal School Sports Association পরিচালিত আন্তঃ স্কুল জেলা প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া জেলা স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েসন বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। খেলাটি ১৯৯৯ সালের ১৪-১৬ ই ডিসেম্বর হিলভিউ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যদলের তিনজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় পুরুলিয়া থেকে (১) সুদীপ কর্মকার (২) বিশ্বজিৎ দে ও (৩) অনুপ ভার্মা। তাছাড়া ২০০০ সালে বিশ্বজিৎ দে রাজ্যদলের প্রতিনিধিত্ব করে। এবং ২০০১ সালে বিশ্বজিৎ চ্যাট্টাজী রাজ্য পর্যায়ে খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়। ক্রিকেটের সম্ভাবনা জেলাতে থাকলেও পরিকাঠামো গত সমস্যা এর প্রধান বাধা। M.S.A পরিচালিত লীগ বা C.A.B পরিচালিত স্কুল ক্রিকেট চালু থাকলেও মাঠের অভাব। সাজ সরঞ্জামের অভাবই উপযুক্ত যোগ্যতামানে ক্রিকেটে আমরা পিছিয়ে। তাছাড়া কলকাতায় গিয়ে ক্রিকেট কোচিং করিয়ে ক্রিকেটার তৈরি করা ব্যয়সাধ্য যেমন, তেমনি অসম্ভবও বটে।

যোগাসন ও অ্যাথলেটিক্‌সে পুরুলিয়া জেলা রাজ্যস্তর কিংবা সর্বভারতীয় বিভিন্ন সময়ে উন্নতমানে পৌঁছুতে পেরেছে। গত ২০, ২১, ২২ ডিসেম্বর 2002 Purulia District Physical Culture Associtionএবং হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা পুরুলিয়া শহরে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভলিবল শীতকালীন খেলা। শীতের আমেজে বহুস্থানেই ভলিবল খেলা হয়। কিন্তু এর বিস্তার বড়ই কম। ভলিবলে পুরুলিয়ার মাড়োয়ারীক্লাব, কাশীপুর, এম,ভি,আই মাঠে প্রায়শঃই হত। স্কুল পর্যায়ের Intensive খেলায় ভলিবলের জগতে উন্মাদনা দেখা যায়। রাজ্য বা জাতীয় স্তরে এর সম্ভাবনা তৈরি করা যায়নি।

হকি দলগত খেলা। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ এই সময়কালে হকি খেলা হত। Inter-District Hockey Tournament পুরুলিয়া মাঠে হয়েছে। দার্জিলিং বনাম বর্ধমানের খেলা এখানে হলেও জেলায় কোনো পর্যায়েই তার কোনো প্রভাব পড়েনি।

টেবিল টেনিস খেলা হত ইউনিয়ন ক্লাবে, মাড়োয়ারি ক্লাবে আর বিশেষতঃ আদ্রা রেলে। জেলায় ক্রীড়া সংগঠনটি রয়েছে। ১৯৭৫ সালে World Table Tennis Campionship-এর বড়ো আসর বসেছিল কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। তার একটা প্রভাব পড়ে আমাদের জেলায় তখন শর্তসাপেক্ষে পুরুলিয়ায় টি টি সংগঠন গড়ে তোলার অনুমতি মেলে। ৩০টাকার বিনিময়ে অনুমোদন মেলে। আমলা পাড়ার বাসিন্দা স্বপন রায় হলেন সম্পাদক সদস্য সংখ্যা ৭জন।পুরুলিয়া শহরের রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীমুলক টি টি খেলা হয়। এই খেলায় অংশগ্রহন করেন রাজ্য ও জাতীয় স্তরের র‍্যাঙ্কিং খেলোয়াড়রা যেমন-(ক) ভি,ভিসু (খ) নাচ্চু মুখার্জী (গ) সাধন দত্ত (ঘ) দিলীপ সিন্‌হা (ঙ) জালভানিয়া (চ) মাইকেল মল্লিকসহ আটজন খেলোয়াড়। তারও প্রভাব পড়ে জেলার টি.টি. খেলায়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার টিটি সাবকমিটি কাজ করে চলেছে। চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে মাঝে মধ্যেই টি টির প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। টিটিতে আমাদের জেলার একটা সুনাম আছে।

তাছাড়া কাবাডি, খোখোতে আমাদের খেলা হলেও ধারাবাহিকভাবে এর অনুশীলন নেই বলেই বিশেষ কিছু কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে জেলায় সাঁতার প্রতিযোগিতা হয় না বললেই চলে। কিংবা তীরন্দাজী আমাদের জেলার গর্বের বিষয়। এর প্রশিক্ষন পরিচালনা সুযোগ থাকলে সর্বভারতীয় স্তরে একটা জায়গা পাওয়া যেত বলেই মনে হয়।

'পুরুলিয়া জেলার ক্রীড়াচর্চা' বলতে গ্রামীণ লোকক্রীড়া ছাড়া জেলায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা খেলাধূলার একটা রূপরেখা। জেলা মানভূমের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা পুরুলিয়া জেলার ক্রীড়ার ধারাবাহিক চর্চা সাফল্য আর ব্যর্থতার দিকের আলোচনায় একটা সত্য প্রতিভাত হয় যে পুরুলিয়া জেলা হিসেবে পরিচিতির পূর্বেই রাজ্যক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল একটা বড় জায়গা দখল করেছে। জেলার সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য ধারাবাহিক কর্মসূচি প্রয়োজন। ফুটবলে আমাদের জাতীয় আবেগের প্রতিফলন ঘটায় ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব। কিন্তু জটিল যন্ত্রণাক্ষুদ্ধ জীবনযাত্রা আজকের প্রজন্ম তা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ফুটবলকে বাঁচাতে হবে জাতির স্বার্থে, জীবনের স্বার্থে।

জেলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রীড়ানৈপুন্যের সম্ভাবনার অনন্ত আধার রয়েছে। তাকে মেলে ধরার দায়িত্ব সংগঠনগুলিকে নিতে হবে। গোপালনন্দী প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু মাঠে দেখেছি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে এরূপ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। মান উন্নয়ন করতে হবে বললেই হবে না এর জন্য সক্রিয় উদ্যোগ চেতনার মান বাড়াতে হবে। আর চাই উদার স্নেহশীল দৃষ্টিভঙ্গী। স্কুল পর্যায়ের খেলাধূলার মান বাড়ানোর উদ্যোগ চাই। প্রতিটি স্কুলে খেলার মাঠ চাই, জেলায় চিত্তরঞ্জন স্কুল সুব্রত মুখার্জী কাপে ১৯৮৯ সালে রাজ্য চ্যাম্পিয়ান পরবর্তীস্তরে রাঙ্গাডি শ্রীভজনাশ্রম হাইস্কুল রাজ্যস্তরে ও সর্বভারতীয় স্তরের সাফল্যের পিছনে রয়েছে সক্রিয় উদ্যোগ,

আন্তরিকতা আর খেলাধূলার প্রতি একনিষ্ঠ আবেগ। প্রতিটি খেলায় সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের প্রতিটি স্পন্দন ধ্বনিত হোক কিছু করে দেখানোর মানসিকতায়।

এম. এস. এ. (ডি. এস. এ) পরিচালিত ক্রীড়াচর্চায় পুরুলিয়া জেলাররাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে সাফল্যের পরিসংখ্যান (দলগত ও ব্যক্তিগত) ১৯৭৯ থেকে ২০০২ সাল

সাল		
১৯৭৯	ফুটবল	আন্তঃজেলা সাবজুনিয়ার রানার্সঃ চন্দন চ্যাটার্জী সারা বাংলা গ্রামীণ ফুটবলে বাংলার প্রতিনিধি।
১৯৮০	টি.টি.	৪৬তম রাজ্য প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া বালক বিভাগে রানার্স।
	বক্সিং	Light melter বিভাগে নির্মল মাহাত রানার্স।
১৯৮১	যোগাসন	ডি.ডি. ফ্রান্সিস দ্বিতীয়
	শৈলজাকাশ্যপ	উচ্চলম্ফন তৃতীয়
	অ্যাথলেটিক্স	৪০০ মি. তৃতীয় আর. ডি. লোবো। ট্রিপল জাম্পে চন্দন ঘোষ প্রথম। রিলে রেসে জেলা দ্বিতীয়। ২০০মি: সাজদা বেগম দ্বিতীয়,১০০ মি: তৃতীয়। সর্টপাট- কবিতা মজুমদার তৃতীয়। জ্যাভেলিন ও সর্টপার্ট বিভাগে প্রথম। রমা সয়েন মহিলা বিভাগের সটপার্টে তৃতীয়।
	টি. টি.	সৌমিত্র পাল রানার্স।
১৯৮৪	অ্যাথলেটিক্স	ভবানী মাহাত - ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান মিটে ৫০০মি: দ্বিতীয়।
১৯৮৫	অ্যাথলেটিক্স	সুমন্ত চ্যাটার্জী - ট্রিপল জ্যাম্প প্রথম কবিতা মজুমদার - সর্টপার্ট ও ডিসকাসথ্রো- তৃতীয়
১৯৮৯	যোগাসন	অর্চনা কুন্ডু প্রথম, বর্ণালী চৌধুরী তৃতীয় সর্বভারতীয়স্তরে একই ফল করে।
১৯৯০	ফুটবল	আন্তঃজেলা জুনিয়ার ফুটবল চ্যাম্পিয়ন।
১৯৯১	অ্যাথলেটিক্স	জেভলিন (বালিকা) সাবিনুর খাতুন তৃতীয়। ট্রিপল জ্যাম্প(পুরুষ) সুমন্ত চ্যাটার্জী তৃতীয়।

১৯৯৩	যোগাসন	ইন্দ্রনীল বিশ্বাস (প্রথম)
	অ্যাথলেটিক্স	উচ্চলম্ফন (১৭ বছর) এন. জগমোহন রাও-- তৃতীয়
		উচ্চলম্ফন (১৪ বছর) লাল্টু বাউরী- তৃতীয়।
১৯৯৪	ফুটবল	জুনিয়র বিভাগে আন্ত:জেলা চ্যাম্পিয়ন।
	অ্যাথলেটিক্স	সাদিনূর খাতুন (অপূর্ব ২০ বছর) বর্শা নিক্ষেপ --- প্রথম ---৬.৮০মি:
		সঞ্চিতা ধবল (অপূর্ব ১৭ বছর) ৪০০ মি: তৃতীয়।
১৯৯৬	অ্যাথলেটিক্স	সাদিনূর খাতুন (মহিলা বিভাগে) বর্শা নিক্ষেপ -- তৃতীয়
		অতনু দাস (পুরুষ বিভাগে) দীর্ঘলম্ফন --- তৃতীয়
১৯৯৭	যোগাসন	সর্বভারতীয় স্তরে - সেন্টু বড়াল (বালক বিভাগে) দ্বিতীয়
		সর্বভারতীয় স্তরে - মৌপালি চৌধুরী (বালিকা বিভাগে) চতুর্থ
	অ্যাথলেটিক্স	বর্শা নিক্ষেপ (বালক বিভাগে) প্রথম- অজয় লামা।
১৯৯৮	যোগাসন	রাজ্য-- সেন্টু বড়াল প্রথম, কৃষ্ণা দত্ত তৃতীয়
		সর্বভারতীয় সেন্টু বড়াল তৃতীয়।
		টি টি -- রানার্স। অ্যাথলেটিক্স-- বর্শা নিক্ষেপ -- (বালক) প্রথম
		ফুটবল-আন্তঃজেলা সাবজুনিয়র রানার্স
২০০০	যোগাসন	রাজ্য পূজা চক্রবর্তী তৃতীয় (৬-৯ বছর) অতসী ভটাচার্য(১৫-১৮) দ্বিতীয়।
		জাতীয় পূজা চক্রবর্তী চতুর্থ (৬-৯ বছর) অতসী ভটাচার্য (১৫-১৮) দ্বিতীয়।
		সেন্টু বড়াল-- রাজ্য দ্বিতীয় ও জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় (১৫-১৮)।
	অ্যাথলেটিক্স	কালিপদ রজক সাইকেল রেস-১০০০ মি: ৩০ কিমি---দ্বিতীয়।

২০০১	যোগাসন	তনয় দত্ত প্রথম (৬-৯ বছর), পূজা চক্রবর্তী (৯-১২) প্রথম।
	অ্যাথলেটিক্স	৫১তম রাজ্য ক্রীড়া গুরুচরণ মাহাত প্রথম।
২০০২	ফুটবল	আন্তঃজেলা সাবজুনিয়ার রানার্স
	অ্যাথলেটিক্স	পিঙ্কি পরামানিক -- ১০০ মিঃ ২০০ মিঃ ৪০০মিঃ রেকর্ড করে প্রথম।
		সন্দীপ দাস--(পুরুষ বিভাগ)১০০০০ মিঃ প্রথম।
		গোপাল শবর--All India meet- তিরন্দাজী দ্বিতীয় (সাবজুনিয়র)
২০০৩		এখনো প্রতিযোগিতাগুলি হয়নি।

বিঃদ্রঃ—গোপাল শবর Sports Authority of India র কলকাতা থেকে প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে মানবাজার এলাকার গোপাল শবর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

মানভূমের খেলার ছড়া

জগদীশ সরখেল

বিশ্বের জনজীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ছড়ার রাজত্ব। এই ছড়ার আবার বিভিন্ন শ্রেণী ভেদ রয়েছে। যেমন ঘুম পাড়ানো ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, ব্রত ছড়া ইত্যাদি। বাংলা দেশের প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে এ ধরনের বিভিন্ন ছড়ার ছড়াছড়ি। অনেক সময় একটা অঞ্চলের ছড়ার সাথে অন্য অঞ্চলের ছড়ার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্যও দেখা যায়। ছড়া রচনায় মানভূমও পিছপা ছিল না। প্রচুর ছড়ায় সমৃদ্ধ মানভূমের লোকসংস্কৃতিতে খেলার ছড়ারও একটা গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিকতার ঘূর্ণিঝড়ে যদিও এসব ছড়ার একটা বড় অংশ ঢাকা পড়ে গেছে, তবুও সন্ধানী চোখের দৃষ্টিতে এখনও এ ধরনের প্রচুর ছড়ার হদিশ হাওয়া যেতে পারে। আমার সংগৃহীত কয়েকটি খেলার ছড়ার উল্লেখ করছি।

মানভূমের 'খেলার ছড়া'র খেলাগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন করে 'হাঁড়ি' থাকতে হয়। সমাজ জীবনে ' হাঁড়ি' হচ্ছে অস্পৃশ্য জাত। এদের দিয়ে সাধারণত নীচ ও পরিশ্রমের কাজ করানো হয়। এক কথায় খাটিয়ে নেওয়া হয়। খেলার 'হাঁড়ি'কেও খাটানো হয়। তবে বিভিন্ন খেলায় হাঁড়িদের খাটানোর ধরনও বিভিন্ন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 'হাঁড়ি' হবে কে? তারও সহজ পথ আছে। এই হাঁড়ি বানাবারও ছড়া আছে। খেলুড়িরা গোল হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মধ্যে একজন সকলের গায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছড়া বলে যাবে। এবং ছড়ার শেষের 'হাঁড়ি' শব্দটির সাথে যার গায়ে হাত পড়বে সে-ই হাঁড়ি হবে।

হাঁড়ি বানানোর ছড়াটি হচ্ছে—

"ঝিম ঝিমাল ঝিমাল,
মাড়ে ভাতে খায় ল,
গুড়ুম পুটি সুড়ুম হাঁড়ি।"

এখন খেলার প্রসঙ্গে আসা যাক ঃ—

লুকলুকানি—এই খেলা অনেকগুলি ছেলেমেয়ে একসাথে খেলতে পারে। হাঁড়ি চোখ বন্ধ করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাকি খেলুড়িয়া তার উদ্দেশ্যে ছড়া বলবে—

"লুকলুকানি লুকানি
কানা সাজ হাঁড়িনি
আমরা যখন 'টু' দিব
খুইজে বুইলবি মরনি।"

ছড়াটি বলেই সকলে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে পড়বে। একটু পরে কেউ একজন 'টু' করে শব্দ করবে। তখন হাঁড়িনি তাদের খুঁজে বেড়াবে। এবং সকলকে খুঁজে পাবার পর প্রথমে যাকে খুঁজে পাওয়া গেছিল পরবর্তী খেলায় সে হাঁড়ি হবে। এভাবে খেলা এগিয়ে চলে।

চাঁদা চক্কড় - এই খেলায় হাঁড়িকে ঘিরে অন্যসব ছেলে মেয়েরা হয় কাটে—

"চাঁদা চক্কড় ভাইরে
আমরা ছুইটে যাইরে,
দেইখে চইখে ফটফটাইবি
হুড়ুক জাগুড় ছেঁচকি খাবি।"

ছড়াটি বলে হাঁড়ি বাদ দিয়ে বাকি সব খেলুড়িয়া 'চু' শব্দ করে দম নিয়ে একে একে একই দিকে ছুটে যাবে, এবং যার যেখানে দম শেষ হবে সেখানে একটা করে দাগ দেবে। তারপর বেশি দূরত্বের দাগ পর্যন্ত হাঁড়ির মাথায় চাঁটি মারতে মারতে নিয়ে যাবে। এবং সবচেয়ে কম দূরত্বের দাগের মালিক পরবর্তী খেলায় হাঁড়ি হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

বোম বোম শালুক ডাঁটা—এই খেলায় প্রথম থেকে হাঁড়ি থামে না। ছড়ার শেষে হাঁড়ি নির্ধারিত হয়। ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ডান পা সামনে রেখে গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাটিকে ডানে বামে নড়াবে আর ছড়া বলবে—

"বোম বোম শালুক ডাঁটা,
এতদিন ছিলে কুথা,
সেই সেই সিধার বনে।
সিধার বনের রানি মইরেছে
আমাকে যাইতে বইলেছে
তুমি লাও ঘি কলসি
আমি লিই বেজবাসী
যে না ঘুইরে লাচে
তার মা মুড়কি ভাজে।"

ছড়ার শেষে সকলে মিলে এক পা মুড়ে রেখে এক পায়ে নাচতে থাকবে (স্থানীয় ভাষায় হেট্টেহেটেং)। নাচতে নাচতে প্রথম যে মুড়ে রাধা পাটি মাটিতে নামিয়ে ফেলবে সে-ই হাঁড়ি হবে। এরপর হাঁড়ি বাদ দিয়ে বাকি সব খেলুড়িরা হাত মেলে সরলরেখায় দাঁড়াবে। (একজনের আঙ্গুলের ডগায় আরেকজনের আঙ্গুলের ডগা রেখে) আর হাঁড়িকে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

কানাঘুংরী—হাঁড়ি চোখে রুমাল অথবা কাপড়ের টুকরো বেঁধে কানাঘুংরী সাজে। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে ছড়া বলতে থাকে -

"অ কানা ঘুংরী
তর ভাতার গেইছে চাকরী
আইনে ধিবেক মাকড়ী
মন্ডা মনহরা
জেলাপী রস করা
খাবি দাবি গাল ফুলাবি
শ্বাশুড়ির গদায় (গোদে) তেল লাগাবি।"

ছড়া বলতে বলতে সকলেই কানা ঘুংরীর মাথায় ঠোকর মারবে এবং কানা ঘুংরী তাদের ধরার চেষ্টা করবে। এবং যে ধরা পড়বে পরের বারের খেলায় তাকে কানা ঘুঙরী সাজতে হবে।

রাজা সিনান-এ খেলায় কিন্তু হাঁড়ি থাকে না। এক এক জন ছেলে বা মেয়ে পর পর রাজা সেজে যোবে। রাজা বাদ দিয়ে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত সংকুচিত করে ছোট বাঁধ তৈরি করে রাখবে এবং ছড়া বলবে —

"এতটুকুন জলে
মাছ ন্সিলবিল করে
রাজার বেটা পাথর কাটা
মাছ ধইরতে লারে।"

ছড়া বলা শেষ হলে রাজা স্নান করতে যাবে। তাকে দেখে বাঁধ (অর্থাৎ বাঁধ তৈরি করে আছে যে ছেলেমেয়েরা) বলবে, "রাজা মশাই, রাজা মশাই কথায় চইলেছ্যান ?" রাজা উত্তর দেবে চান করতে। বাঁধ আবার বলবে—" এই বাঁধটয় চান করুন"। রাজা বলবে "এতটুকু ন জলে চান কইরব কি?" বাঁধ বলবে—"জলে একটা টাকা ফেইলে দ্যান, বাঁধট বড় হইয়ে যাবেক।" রাজা গামছায় বাঁধা টাকা খুলে বাঁধে ফেলার ভঙ্গি করবে। আর সাথে সাথে সঙ্কুচিত হাতগুলি প্রসারিত হয়ে বড় আকারের বাঁধ হয়ে যাবে। রাজা স্নান করে কিন্তু আর বাঁধ থেকে বেরোবার রাস্তা পাবে না। তখন রাজা দু'হাত দিয়ে পথ কাটার ভঙ্গি করে দুটি ছেলে বা মেয়ের ধরা হাতের মাঝখানে আঘাত করবে ও চারপাশে ঘুরবে। রাজা আঘাত করার আগে বলবে, "এই পথট কাইটব? এবং প্রতিবার বাঁধ উত্তর দেবে, শীল জাকন দিব," "নোড়া জাঁকা দিব", "যাঁতার পাট দিব", ইত্যাদি। তারপর এক সময় রাজা রাস্তা করে ছুটে পালাবে। বাঁধ ভেঙ্গে খেলুড়িরাও দৌড়ে গিয়ে রাজাকে ধরবে। এবং যেখানে ধরবে সেখান থেকে রাজাকে বাঁধের জায়গা পর্যন্ত চ্যাং দোলা করে নিয়ে আসতে হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

এল্লা ঘিসির—এ খেলাটিতে ছেলেমেয়েরা ছড়া বলতে বলতে একবার ডান পা ও একবার বাঁ পা সামনে ছড়িয়ে সমান তালে নাচতে থাকবে। এ খেলার ছড়া—

"এল্লা ঘিসির ঘিসির তা,
তর মা আমার সাদেয় জা।
রাঙা লাঠি কদো গা,
হে সুয্যি ভাতার খা।
ভাতার খাইতে লারলি
কয়া ধানে হারলি।
আঁক বাড়িতে কে রে?
আমাদের বৌ এর বাপ রে ;
হুঁকা খাইতে ডাক রে।
হুঁকা করে ফুড়ুক ফুড়ুক।
কইলকা করে চাঁই
দিদির আর ত তামুক নাই।"

আপাতত এখানে শেষ করছি। আরো কিছু এ ধরনের ছড়া পাঠকদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করব। গবেষকদের সন্ধানী দৃষ্টিতে, অতীত মানভূমের কালের তমসাচ্ছন্ন গুহাগর্ভে হারিয়ে যাওয়া

মণিমানিক্যের বহুমূল্য রত্নহার উদ্ধার করবার আহ্বান জানাচ্ছি।

ভেলেগুড়—এটি সাধারণত ছেলেদের খেলা। অনেক ছেলে একসাথে খেলতে পারে। সমান সমানভাবে দুভাগে ভাগ হয়ে দুটি দল হয়। অনেক সময় ছেলে বাড়তি হয়ে গেলে, তাকে 'কুড়াভাটু' হিসেবে নেওয়া হয়। 'কুড়াভাটু' পালা করে একবার এ দলে একবার ও দলে খেলতে থাকে। দু'পক্ষের খেড়ি (খেলোয়াড়) দুপাশে দাঁড়ায়। সমান দূরত্বে মাঝখানে একটা সীমারেখা থাকে। পালা করে এক একপক্ষের একজন করে খেড়ি ছড়া বলে দম নিয়ে অপর পক্ষের ঘরে যায় এবং দম নেওয়া অবস্থাতে বিপক্ষ দলের খেড়িদের ছুঁতে চেষ্টা করে। ঐ অবস্থায় বিপক্ষ দলের এক বা একাধিক ছেলেকে ছুঁয়ে যদি দম থাকা অবস্থাতে মাঝের সীমারেখা পার হয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারে, তাহলে ঐ ছুয়ে আসা খেড়ি বা খেড়িয়া মরে যায়—অর্থাৎ out হয়ে যায়। কিন্তু যদি সীমারেখা পার হওয়ার আগেই তার দম ফুরিয়ে যায়, অথবা বিপক্ষ দলের খেড়ি বা খেড়িরা তাকে ধরে দম শেষ হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখে তাহলে ঐ খেলাতে যাওয়া খেড়িই মরে যায়, খেলাতে সে পক্ষের হার হয়।

এ খেলার ছড়াটি হল—
"ভেলেগুড়া খেলিয়া
বাঘ মারি ছেলিয়া
বাঘের তেলে পদ্দিম জ্বলে
জ্বলুক পদ্দিম উঁচুক ধুঁয়া
খেইলতে আয়রে ছুঁচামুহা।"

থুকুথুকু দাঁড়ি—এটি দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ের খেলা। একটি ছেলে ও একটি মেয়েও একসাথে খেলে থাকে। দুপাশে দু'জন বসে মাঝখানে লম্বালম্বি বালির ছোট্ট একটা আল তৈরী করে তার ভেতর একটা ছোট্ট কাঠি লুকিয়ে খেলতে থাকে। কাঠি লুকিয়ে রাখার সময় ছড়া বলতে হয় —

"থুকু থুকু দাঁড়ি
এক পাই চাল কাঁড়ি
চাল কাঁইড়তে হইল বেলা
ভাত খাঁইয়ে লে জামাই শালা।"

ছড়াটি বলে সন্তর্পণে কাঠিটি বালির ভিতর এক জায়গায় রেখে দিয়ে অপর পক্ষকে হাত দাবতে বলা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দুটি হাত একসাথে লাগিয়ে একটা মুদ্রা তৈরি করে আড়াআড়িভাবে ঐ বালির আলের উপর কোন এক জায়গায় রাখবে। (কাঠিটি যেখানে আছে মনে করবে দ্বিতীয় পক্ষ সেখানেই হাত রাখবে।) তারপর প্রথম খেড়ি হাত দাবানো অংশ বাদ দিয়ে বাকি বালির মধ্য থেকে কাঠিটি খুঁজে দেখবে। পেয়ে গেলে তার একটি 'ফুলকা'* হবে। আর যদি কাঠিটি দ্বিতীয় খেড়ির হাতের মধ্যে অর্থাৎ ঐ দাবানো বালির মধ্যে থাকে তাহলে ঐ দ্বিতীয় খেড়ির একটি 'ফুলকা' হবে এবং সাথে সাথে দে 'পাইড়' পেয়ে যাবে। অর্থাৎ কাঠি লুকানোর পালা তার হবে। এভাবে খেলতে খেলতে দশটি 'ফুলকা' যার আগে হবে সে রাজা হবে এবং অপর খেড়ি এরপর রাজা হাঁড়িকে চোখ বন্ধ করে বসতে বলে তার আঁজলায় বালি ভরে দেবে। ঐ বালির মধ্যে 'মুলকাঠি' অর্থাৎ যে কাঠিটি দিয়ে খেলা হয় তার সাথে অন্য ৫/৭টা কাঠি গুঁজে দেবে। তারপর রাজা হাঁড়িকে নিজের হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে তাকে কিছুদুর নিয়ে গিয়ে তার

---

*'ফুলকা'কে অনেক জায়গায় 'ফুড়ুঙ্গা'ও বলা হয়। খেলার হিসেব রাখার জন্য মিহি বালি দিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় ছোট ছোট স্তূপ করে শলা হিসেবে রাখা হয়।

হাতের বালিগুলো ফেলতে বলবে। রাজার আদেশ না হলে কিন্তু হাঁড়ি চোখ খুলতে পারবে না। বালিগুলো ফেলে দেওয়ার পর রাজা সেই বালির সাথে আরো কিছু বালি মিশিয়ে একটা ঢেঁকি তৈরি করবে। ঢেঁকির পা রাখার জায়গায় রাজা পেচ্ছাব, থুথু, গোবর যা খুশি, রেখে আবার হাঁড়িকে নিজের হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিয়ে এসে সেই ঢেঁকিতে 'পাহার' দেওয়া করাকে অর্থাৎ ঢেঁকির পা রাখার জায়গায় পেচ্ছাব, থুথু বা গোবরের উপর পা রাখিয়ে ঢেঁকি উঠানামা করার ভঙ্গি করাবে। সেই অবসরে রাজা মূল কাঠিটি নিয়ে কোন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে তার চারপাশে একটা দাগ দিয়ে বৃত্ত এঁকে হাঁড়িকে কাঠিটি খুঁজতে বলবে। কাঠিটি হাঁড়ি খুজে বের করতে পারলে ভাল আর যদি না পারে তাহলে পিঁপড়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করানো হবে। অর্থাৎ রাজা একটা পিঁপড়ে ধরে এনে তার সিঁথির উপর ছেড়ে দেবে।

বুড়ির বিরাল—যে খেড়ি হাঁড়ি হয় তাকেই বুঢ়ি (বুড়ি) সাজতে হয়। (প্রথমাবস্থায় অবশ্য সে রূপসী)। অন্য একজন ছেলে বা মেয়ে রাজপুত্র সেজে তার পাশে বসে গল্প করবে। সেই সময় অন্য একজন খেড়ি বিড়াল হয়ে 'মিউ' করে শব্দ করে উঠবে । রূপসী বিড়ালকে লাথি মারার অভিনয় করবে। লাথি খেয়ে বিড়াল রূপসীকে অভিশাপ দেবে। সেই অভিশাপে রূপসী জরাজীর্ণ বুড়ি হয়ে যাবে। তখন রাজপুত্র সব ব্যাপারখানা বুঝে তাকে ঠকানোর জন্য বুড়ির শাস্তির ব্যবস্থা করবে। বুড়িকে কান ধরে সাত, দশ বা পনের বার রাজপুত্রের কথামতো উঠা-বসা করতে হবে। এই শাস্তির সময় বুড়ি বাদ দিয়ে বাকি সব খেড়িরা তারস্বরে ছড়া কাটবে—

"বুঢ়ি বিরাল পুইষেছে।
বিরালের দৌলতে বুঢ়ি
ঘর পাঁইয়েছে,
ধন পাঁইয়েছে,
রূপ পাঁইয়েছে।
বুঢ়ির রূপে রাজপুত্তুর বর সাইজেছে
খাইট পালঙ্গে দুজনাতে গফফে মাইতেছে।
বিরাল মিউ কইরেছে,
বুঢ়ি গঢ়ারি মাইরেছে,
বুঢ়ি বুঢ়ি হঁইয়েছে ;
রাজপুত্তুর বুঢ়িকে কানে ধরাঁই লাচা করাঁইছে।"

ইচিং মিচিং—এ খেলাটি তিন চারজন ছেলে বা মেয়ের ঘরোয়া খেলা। এ খেলায় হাঁড়ির কোন বালাই নেই। খেলুড়িরা আসনপিঁড়ি (স্থানীয় ভাষায় চাকমাডুলি) হয়ে গোল হয়ে বসবে। একজন খেড়ি সকলের হাঁটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছড়া বলে যাবে। বাকি খেড়িরাও তার সাথে সুর মেলাবে—

"ইচিং মিচিং জামাই কিচিং
তাখে পইড়ল মাকড় বিচিং
ওল গাছ বেল গাছ
রাজা গুঁসাই জগন্নাথ
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
দুয়ারে বইসে চাল কাঁড়ি
চাল কাঁইড়তে হইল বেলা
ভাত হইল ডেলা ডেলা

দুয়ারে আছে নিম গাছটি নিম ঝুর ঝুর করে
সদাই বিরালীর বিটি লিত্যি লিয়াই করে।"

অরাই মরাই—এটিও একটি ঘরোয়া খেলা। এ খেলাতেও হাঁড়ি থাকে না। চার পাঁচজন ছেলে বা মেয়ে একসাথে খেলতে পারে। প্রথমে একজন খেড়ি ঘরের মেঝেতে মুষ্টিবদ্ধ হাত এমনভাবে রাখবে যাতে বুড়ো আঙ্গুলটি উপরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। পরের খেড়ি তার বুড়ো আঙ্গুলটি ধরে মুষ্টিবদ্ধ করে তার নিজের বুড়ো আঙ্গুলটি অনুরূপ উঁচু করে রাখবে। এমনি ভাবে পর পর হাত রেখে যাবে। শেষের খেড়ি কিন্তু বুড়ো আঙ্গুলটি গুটিয়ে রাখবে। তারপরে সাজানো হাতগুলোকে এমনভাবে ঘোরানো হবে যাতে প্রথম হাতটি মেঝে থেকে উপরে না উঠে — ঠিক যেন ভাঁড়ের চুনকে ডান্ডা দিয়ে পেষাই করা হচ্ছে। হাত ঘোরানোর সাথে সাথে ছড়া বলে যেতে হবে—

"অরাই মরাই চুণের চরাই
চুন ভড় ভড় করে
শাঁক মাদল পিতল কাঠি
ভাই গুড় গুড় দলায় চাপি
সূয্যি বরণ বরণ
কান ধরন ধরন।"

"কান ধরন ধরন" বলার সাথে সাথে সকলেই হাত ছেড়ে আপন আপন কান ধরবে। পুনরায় ঐভাবে হাত রেখে আবার ছড়া বলবে, কান ধরবে। এভাবে যতক্ষণ খুশি খেলে যাবে।

কাঁঠাল চোর—এ খেলায় একটা লম্বা লাঠিকে কাঁঠাল গাছ হিসেবে মাটিতে পুতে রাখা হয়। কতকগুলি ছেলে-মেয়ে লাঠির চারপাশে বসে লাঠিটাকে ধরে মাথা নীচু করে কাঁঠাল সেঝে থাকবে। কাঁঠাল গাছের মালিক (আগেই নির্দিষ্ট হয়) গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার ভঙ্গি করে ছড়া কাটবে—

"কাঁঠাল গাছে জল দিই হাপুর হুপুর
বেইন্যা বৌ-এর ছেইল্যা হইল তিনটা কুকুর!
একটা কুকুর রাঁধে বাড়ে, একটা কুকুর খায়
একটা কুকুর রাগ কইরে কাঁদিয়া বেড়ায়।"

জল দেওয়ার পর রাত্রি নামে। চোর অতিথিরূপে গাছের মালিকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। শোবার সময় অতিথি মালিককে জিজ্ঞেস করে, ঘরটায় যে কাঠালের গন্ধ উঠছে?" মালিক অতিথিকে বোকা বানাবার জন্য উত্তর দেয় "উট উয়াদের ঘরের গন্ধ বটে'৩। তারপর দু'জনেই শুয়ে পড়ে। মালিক ঘুমিয়ে পড়লে অতিথিরূপী চোর আস্তে আস্তে কাঁঠাল গাছের গোড়ায় গিয়ে কাঁঠালরূপী ছেলে বা মেয়েদের মাথা টিপে পরখ করতে থাকে কোন্ কাঁঠালটা পেকেছে। চোর ঐ পাকা কাঁঠালটি নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মালিকের ঘুম ভেঙ্গে যাবে এবং ঐ চোরকে তাড়া করবে। আগে থেকেই একটা নির্দিষ্ট দাগ কাটা থাকে। মালিক ঐ দাগের মধ্যে চোরকে ধরে ফেলতে পারলে চোরের শাস্তি হিসেবে একটা নির্দিষ্ট স্থানের আঁজলা ভর্তি বালি এনে তাকে গাছের গোড়ায় জল হিসেবে ঢালতে হবে দশবার বা পনেরো বার। আর ঐ দাগের মধ্যে চোর ধরা না পড়লে মালিকের একটা কাঁঠাল কমে যাবে। এভাবে কমতে কমতে কাঁঠাল নিঃশেষ হয়ে গেলে খেলার পালা বদল হবে। অর্থাৎ মালিক ও চোর পরিবর্তিত হয়ে আবার খেলা চলতে থাকবে।

সৃজক পরিচিতি

সুনীল মাহাত—পুরুলিয়া জেলার কালুহার গ্রামে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৪ সালে জন্ম। কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। মূলত লোকসংস্কৃতির উপর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখক। অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের গ্রন্থ 'ঝাড়খণ্ডের যীশু', 'সাতুল' (গল্প), 'করমকথা' (কুড়মালিকাব্য)—রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কলেন্দ্রনাথ মান্ডি— জন্ম ১৯৫৩ পুরুলিয়ার শিরীষগোড়া গ্রামে। সাঁওতালি ভাষার পত্রিকা "সিলি"র সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ—আরসি, মিৎ থপে অনড়হেঁ, সমাজ অকাম ইদিএগ্রা। ১৯৯২ সালে ভারতীয় দলিত সাহিত্য আকাদেমি ও ডঃ বি আর আম্বেদকর ফেলোসিপ পেয়েছেন।

ওমপ্রকাশ রাঠি—জন্ম ১৯৫৩ সালে পুরুলিয়া শহরে, পিতা—গোকুল চন্দ্র রাঠি, মাতা—কমলা রাঠি। একশো বছরের উপর এঁদের পরিবার পুরুলিয়া শহরে বসবাস করছেন।

বংশীধর কাটারুকা—জন্ম ১৯৪২ সালে পুরুলিয়া শহরে। পুরুলিয়ার জেলা স্কুলে পড়াশোনা। পরিবারটি একশো বছরের উপর পুরুলিয়া শহরে বসবাস করছেন।

বিজয় পাণ্ডা—জন্ম ১৯৪০ সালের ৬ই জুলাই বাঁকুড়া জেলা খাতড়া থানার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রান্তিক গ্রাম গুণিয়াড়ায়। দুবড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩৮ বৎসর শিক্ষকতা করে অবসর নিয়েছেন। পুরুলিয়া ও কলকাতার অসংখ্য পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। কিছুদিন ছত্রাক পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। 'মানভূম লোক সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ (১ খণ্ড) নামক পুস্তকের রচয়িতা।

ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়—পুঞ্চা থানার বাগদা গ্রামে। ৮.৯.১৯৩৮ সালে জন্ম। প্রথম শ্রেণী পেয়ে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পি.এইচ.ডি ও ডি.লিট ডিগ্রি পান। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার ইতিহাস রচনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন।

জলধর কর্মকার—১.১.১৯৬৭ সালে বলরামপুর থানার নন্দুড়ি পো: নামশোল, জেলা পুরুলিয়া জন্ম। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে বলরামপুর ফুলচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের সাঁওতালী অনুবাদ ও "স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী" এই দুটি গ্রন্থরচনায় নিয়োজিত আছেন।

দিলীপকুমার গোস্বামী—পুরুলিয়া জেলা কাশীপুর থানার সুতাবই গ্রামে ১৯৫৩ সালে ৩১শে ডিসেম্বর জন্ম। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গড়জয়পুর

আর বি.বি. উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। ১৯৯৭ সাল থেকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের 'জেল সংগ্রহশালা'র দায়িত্ব পালন করছেন। 'পুরুলিয়ার মন্দির' ১৯৯৯ পুরুলিয়া বইমেলা গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদিত গ্রন্থ রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'পঞ্চকোট ইতিহাস' ২০০৩ পুরুলিয়া বইমেলা।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বসু—মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে ১৯৩৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ও রিসার্চ স্কলার। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি.। বিষয়—মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থার কিছু দিক। খড়্গপুর কলেজ ও পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজের প্রাক্তন রীডার। বাংলার ইতিহাস বিষয়ক বহু প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা।

ডঃ শান্তি সিংহ—জন্ম ১৯৪৫ সালের বাঁকুড়ায়। বিশিষ্ট কবি ও গবেষক। রাঢ়-বঙ্গের লোকসংস্কৃতির ওপর পি এইচ. ডি.। 'লাল মাটি নীল অরণ্য', 'মাটিতে পা রেখে', 'নিরন্তর আলোকিত আশা', 'মানুষ', 'ম্রিয়মান দিন ঃ প্রিয়-বর্ণমালা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। রাজ্যসংগীত আকাদেমি প্রকাশিত 'লোকসংগীত সংগ্রহ ঃ ঝুমুর', কলকাতা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রকাশিত 'টুসু', বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত বসন্ত রঞ্জন রায়ের জীবনী গ্রন্থের লেখক। 'রূপরসছন্দে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকায়ত জীবন' তাঁর বর্ণময় সংকলন। সারা বাংলা-সাহিত্য সম্মেলন কবি-পুরস্কার, প্রতিশ্রুতি-সাহিত্য পুরস্কার, মণিকৌস্তভ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক।

শ্যামাচাঁদ ব্যানার্জী—পুরুলিয়া শহরের মুনসেফ ডাঙায় জন্ম। সমবায় ব্যাঙ্ক আন্দোলনের একজন কর্মী।

হারাধন ব্যানার্জী— ১৯৫৬ সালের ২৪শে জুলাই পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার অন্তর্গত নালদা গ্রামে জন্ম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়ার সভাপতি।

কল্যাণ ঘোষ—রাজ্যবিদ্যুৎ পর্যদের অধীক্ষক বাস্তুকার। বর্তমানে সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার।

রমেন্দ্রনাথ কর—রাজ্যবিদ্যুৎ পর্যদের অধীক্ষক বাস্তুকার। বর্তমানে পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রোজেক্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অতনু কুমার মণ্ডল—জন্ম মেদিনীপুরে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম. এ. (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগদান ১৯৮০ সালে। বি.ডি.ও. বাগমুণ্ডি, প্রোজেক্ট অফিসার ডানিডা (আর. এল. ও.)। প্রশাসনিক আধিকারিক ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদ ;প্রশাসক, দীঘা ;পুরুলিয়ার সদর মহকুমা শাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক। বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর একান্ত সচিব রূপে নিযুক্ত আছেন।

সঞ্জিত কর্মকার—রাজ্য সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগের আধিকারিক। বর্তমানে পুরুলিয়ার জেনারেল ম্যানেজার, ডিস্ট্রিক্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ সেণ্টার।

অজিত মাণ্ডি—রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের আধিকারিক। বর্তমানে পুরুলিয়াতে সহ অধিকর্তা, সেরিকালচার পদে নিযুক্ত।

আবদুল আজিজ মণ্ডল—পুরুলিয়ার জেলা হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার পদে নিযুক্ত।

পিনাকীরঞ্জন রক্ষিত—পুরুলিয়া জেলার ঝালদা শহরে বসবাস, পেশায় উকিল।

সুবোধ বসু রায়—১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া শহরে জন্ম। শিক্ষালাভ কলকাতার স্কটিশচার্চ, সেন্টপল্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৮-এ। পুরুলিয়ার নবপ্রতিষ্ঠিত জে.কে কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। কর্মজীবন কাটে প্রিয় কলেজটিতে অধ্যাপনা করে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মানভূম লোকসংস্কৃতি মুখপত্র 'ছত্রাকের' সম্পাদনা। ছত্রাকের সম্পাদক সুবোধ বসুরায় নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির গভীর গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

মলয় চৌধুরী—পুরুলিয়া জেলাব একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃতি জগৎ তথা জেলার নাটক, সঙ্গীত, সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় রত আছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ—রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে ছৌ নৃত্যের প্রয়োগ।

শ্যামল কিশোর তেওয়ারী—জন্ম পুরুলিয়া শহর ১৯৪৪। কর্মজীবন—প্রথমে শিক্ষকতা, পরবর্তীকালে দুর্গাপুর ইস্পাতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে পুরুলিয়া শহর থেকে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সংবাদপত্র নিয়ামত প্রকাশ করেন। লেখকের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—ফিরে এসো, রোহিত বাড়ি ফেরে, এসো শপথ নিই, আমি কি চরিত্রহীন।

ডঃ কিরীটীভূষণ সিনহা—জন্ম ৩ জুলাই, ১৯৪১। বিশিষ্ট চিকিৎসক। জেলার প্রাক্তন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। জেলা ও রাজ্যস্তরের বিশিষ্ট সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

সুধাকর বন্দোপাধ্যায়—পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার অন্তর্গত জালিকা গ্রামে জন্ম। ১৯৭৭ সাল থেকে কুষ্ঠ নিবারণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত। গান্ধি মেমোরিয়াল লেপ্রোসী ফাইন্ডেশনের প্রকল্প আধিকারিক ছিলেন। বর্তমানে জার্মান লেপ্রোসি রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনের রিজিওনাল সেক্রেটারি।

শ্যামল গোস্বামী—জন্ম ১৯৫৮ সালের পুরুলিয়া জেলার সড়বড়ি গ্রামে। সম্পাদিত পত্রিকা "সীমানা ছাড়িয়ে"।

ধ্রুব দাস— পুরুলিয়ার রুক্ষ মাটিতে জন্ম ১৯৪৪। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পীর অসংখ্য ভাস্কর্য সৃষ্টি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। শিল্পীর নিজস্ব প্রচেষ্টায় "কলা-নিকেতন শীর্ষক' ভ্রাম্যমান শিল্প প্রদর্শনীর একমাত্র প্রবর্তক। ভারতবর্ষে যার প্রদর্শনীর সংখ্যা প্রায় ৩০০শ এর উপর। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য চারুকলা পর্যদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

দিলীপ কুমার সিংহ— জন্ম ১৯৩৬ সাল, পুরুলিয়া শহর। প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী। সংগীত জীবনের শুরু ১২ বছর বয়স থেকে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী শিষ্য নীলমণি সিংহ প্রথম ও তাপসন দৌহিত্র ও বংশীয় উস্তাদ দবীর খাঁ শেষ সংগীত শুরু। ১৯৬৫ সাল থেকে পুরুলিয়ার সূরতীর্থ সংগীত সংস্থার অধ্যক্ষ।

দয়াময় রায়— জন্ম ১৯৬৩ সালের ১০ই জুলাই, পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার অন্তর্গত বাতিকরা গ্রামে। পেশা—শিক্ষকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ—গম্ভীর সিং মুড়ার জীবন ও শিল্প।

জগদীশ সরখেল— প্রথম প্রকাশিত কবিতা "পত্রক"-এ। মূলত গল্প লেখেন। জন্ম—পুরুলিয়া জেলার পাবড়া গ্রামে। পেশায় একজন রেল কর্মচারী। বর্তমান ঠিকানা— আদ্রা রেল আবাসন, পুরুলিয়া। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ "ভারতের রং লাল"।